বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং
১১৪, মতিঝিল বা.এ.
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

© ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক

ISBN 984 05 0152 6

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং ১১৪ মতিঝিল বা.এ. ঢাকা ১০০০। কম্পিউটার টাইপসেটিং : ডেস্কটপ কম্পিউটিং লিমিটেড, ১৩৮ শান্তিনগর, ঢাকা ১২১৭, মুদ্রণ : দি লেমিনেটরস, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

BANGLADESHER RAJNITI O SARKARER CHALCHITRA (Politics and Government in Bangladesh) by M. A. Wazed Miah, published in February 1995, by The University Press Limited, 114 Motijheel C.A., Dhaka 1000.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পিতা মরহুম আব্দুল কাদের মিয়া,
যিনি সারা জীবন সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস করেছেন,
তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হলো।
পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার
মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

১। স্বাধীন বাংলাদেশ তথা এ ভূখণ্ডের স্বাধীন বাঙ্গালী জাতিকে তার সুদীর্ঘকালের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যে অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার কিছু বিবরণ এই গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেসব আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতি অনেক সাফল্য অর্জন করলেও তার স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছু অপূর্ণ রয়ে গেছে। জাতির সেসব ব্যর্থতা ও হতাশার কারণ কি এবং তার জন্য কে বা কারা দায়ী, জাতির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে ঘটে যাওয়া অনেক উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের প্রয়াস করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড সংগঠনে এবং জনমত গড়ায় যাদের সার্থক ভূমিকা পালন ও আবদান রাখার অবকাশ রয়েছে, সেসব নেতা-কর্মী জাতির স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতটুকু দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কেও এই গ্রন্থে কিছুটা তার আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

২। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপিত হলে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষ তার নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসের অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েও পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন এই আশায় যে, নতুন রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে থেকেও তাঁরা অধিকতর স্বাধীনভাবে নিজেদের ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি-ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সর্বোপরি আদর্শ, বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাবেন। কিন্তু, পাকিস্তানের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী ও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণকারী উর্দুভাষী, বিশেষ করে পাঞ্জাবী সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠী এ ভূখণ্ডের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করে এবং এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে প্রশাসনিক ও সামরিক আধিপত্য বিস্তার এবং অন্যান্য শোষণ-বঞ্চনার মাধ্যমে এ ভূখণ্ডকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কলোনীতে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। এ ভূখণ্ডেরই অনেক নেতা-কর্মী তাদের নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সে চক্রান্তে সহায়তাও করেছিল।

৩। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সেসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ ভূখণ্ডের মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্নভাবে অনেক প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছেন এবং প্রাণও বিসর্জন দিয়েছেন। অবশেষে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ ভূখণ্ডের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালীর মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬-দফার ভিত্তিতে এ ভূখণ্ডের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হন। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও কতিপয় চক্রান্তকারী রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সে দাবি মেনে না নিলে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে এ ভূখণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য উজ্জীবিত ও সুসংগঠিত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠী এবং কতিপয় রাজনৈতিক কুচক্রী মহল এ ভূখণ্ডের মানুষকে চিরতরে দাবিয়ে রাখতে গণহত্যা শুরু করলে এদেশের কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী দালাল ছাড়া ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের নিগড় থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধে লিপ্ত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ করে এবং লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাঙ্গালী জাতি তার স্বাধীনতা ও স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পাকিস্তানী সেই একই সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠী ও কতিপয় রাজনৈতিক কুচক্রী মহল তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে নতুন করে ষড়যন্ত্র আঁটে। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে পাকিস্তানের সে ষড়যন্ত্রের সহায়তা ও অংশ গ্রহণ করে এদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মুষ্টিমেয় পাকিস্তানী এজেন্ট, কতিপয় বিভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং সেই একই স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক কুচক্রী মহল। সেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেই একই শাসকগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক কুচক্রী মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে সপরিবারে হত্যা করে। বাংলাদেশে সংঘটিত সেসব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেসব ঘটানোর মূল উদ্দেশ্যও এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

৪। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনার পর বাংলাদেশে জারি করা হয় সামরিক শাসন। ঐ সুযোগে বাংলাদেশের কতিপয় মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সেনা বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল (পরবর্তীকালে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দেশে গণতন্ত্র রক্ষার নামে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের ক্ষমতাবলে প্রথমে তাঁর ওপর জনগণের আস্থা আছে কি-না সে সম্পর্কে হ্যাঁ বা না-এর প্রহসনমূলক গণভোটের ব্যবস্থা করেন এবং তারপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদের অপচয়ের মাধ্যমে দেশের 'রাজনীতিকে রাজনীতিকদের জন্য কঠিন' করে তোলেন। সামরিক আইনের সুযোগে ও ক্ষমতা বলে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনা ও আদর্শকে ধূলিসাৎ করে দেশে সেই পাকিস্তানী মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণার পুনঃপ্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের শাসন আমলে রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচন, জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রভৃতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সেসব ছিল অনেকাংশে প্রহসনমূলক এবং সেসবে ঘটেছে ব্যাপক নিয়মনীতি লংঘন, বিপুল কারচুপি ও অজস্র অর্থের ছড়াছড়ি। সেসবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কলুষিত করেন দারুণভাবে। জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ঘটা সেসব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৫। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণার সমর্থক বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অপর একটি ক্ষুদ্র গ্রুপের নেতৃত্বে তৎকালীন বাংলাদেশ সেনা বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল (পরবর্তীতে লে. জেনারেল) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং একই সঙ্গে দেশে পুনরায় সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রথমে সামরিক আইন বলে এবং পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর একাংশকে ব্যবহার, নানান ছল-চাতুরি, অপকৌশল, ভাওতাবাজি, বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদের অপব্যবহার ও ব্যাপক দুর্নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে এরশাদ স্বৈরাচারী স্টাইলে সুদীর্ঘ পৌনে নয় বছর দেশ শাসন করেন। ঐ সময়ে তিনিও পূর্বসূরী জিয়াউর রহমানের মতো প্রথমে তাঁর ওপর জনগণের আস্থা আছে কি-না সে ব্যাপারে হ্যাঁ বা না-এর গণভোট অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে দুর্নীতিবাজ ও আদর্শবিবর্জিত দলছুট রাজনীতিবিদ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও আমলাদের নিয়ে জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তারপর, তিনিও জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতির পদে প্রহসনমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। সেসব ক্রিয়াকাণ্ডে এরশাদ বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করেন, বিশেষ করে তাঁর শাসন আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন গুলোয় ঘটে সামরিক বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনসহ প্রশাসনের চরম অপব্যবহার, সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের দ্বারা ভোটকেন্দ্র দখল করে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তিকরণ, ব্যাপক ভোট কারচুপি, নির্বাচনের রেজাল্টশীটে ভোটের ফলাফল পাল্টে দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণপ্রচার মাধ্যমে নির্বাচনে পরাজিত জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা ইত্যাদি ন্যক্কারজনক ঘটনা। সেসব ন্যক্কারজনক, বিবেকবিবর্জিত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শুধু দেশের রাজনীতিই নয়, নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন। অবশেষে, ১৯৯০ সালের নভেম্বরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮-দলীয় জোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭-দলীয় জোট ও বামফ্রন্টের ৫-দলীয় জোটের যৌথ আন্দোলনে সৃষ্ট গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে উল্লিখিত তিন জোটের প্রস্তাব অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত মোটামুটি অবাধ, সুষ্ঠু ও দল-নিরপেক্ষ নির্বাচনে দেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সে সময়পর্বে সংঘটিত অনেক রাজনৈতিক ঘটনা এবং সর্বোপরি, এরশাদের স্বৈরাচারী ও বেপরোয়া ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বিবরণও এই গ্রন্থে বিবৃত করা হয়েছে।

৬। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে অংশ নিয়ে এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও দল-নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী রূপ দানে কোন বিশেষ উদ্যোগ নেয়নি। এমন কি ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বরে ঘোষিত তিন জোটের রূপরেখায় উল্লিখিত অংগীকারসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নেও কোন আন্তরিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাছাড়াও ১৯৯১ সালে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলেও সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচারী এরশাদের স্টাইলেই দেশ পরিচালনা করেন। তিনিও দলীয় স্বার্থে ও কাজে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র, অফিস ভবন, যানবাহন, অর্থ-সম্পদ, সুযোগ-সুবিধাদি ও গণপ্রচার মাধ্যম, বিশেষ করে রেডিও ও টেলিভিশনের অপব্যবহার করেন দ্বিধালেশহীন ও নির্বিকারভাবে। জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনগুলোয়, বিশেষ করে, ঢাকা-১১ (মিরপুর) ও মাগুরা-২ আসন দুটোর উপনির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর সমর্থকদের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন, সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখল করে বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তিকরণ, বোমাবাজি, কালো টাকার ছড়াছড়ি, নির্বাচন কমিশনসহ প্রশাসনের অপব্যবহার ইত্যাকার ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়। সেসব ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপ জাতীয় সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়। সে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই দলগুলো সুদীর্ঘ নয় মাস ধরে সংসদের অধিবেশন বর্জনসহ আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ সরকারী দল বিএনপি-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে কয়েক দফা বৈঠকও করেন। কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে বিএনপি সরকারের সঙ্গে কোন সমঝোতা না হওয়ায় জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দুটি বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর সকল সাংসদ ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখে একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমলের ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়পর্বে ঘটা সেসব ঘটনার প্রেক্ষিতসহ বিস্তারিত বিবরণও এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭। এই গ্রন্থে উপস্থাপিত লেখার প্রায় পুরোটাই দৈনিক 'আজকের কাগজে' ১০ই আগস্ট (১৯৯৪) থেকে ৩০শে নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একদিন পর পর প্রকাশিত হয়। সে প্রকাশনায় সম্মতি প্রদানের জন্য 'আজকের কাগজের' সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কাজী শাহেদ আহমদকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই লেখাটি 'আজকের কাগজে' প্রকাশনার সময় ঐ পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক জনাব সালাম সালেহ্ উদ্দিন অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই প্রকাশনার ব্যাপারে দেখাশোনা ও তদারকি করেছেন। সেজন্য জনাব সালাম সালেহ্ উদ্দিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থটি প্রবন্ধাকারে লেখার সময় দৈনিক 'বাংলার বাণী'র কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের বেশ কিছু পুরনো সংখ্যার কপি সরবরাহ করেছেন। তার জন্য 'বাংলার বাণী'র সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং সার্কুলেশন ম্যানেজার সরদার রউফুল আমিন রউফকে সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই লেখাটি পুস্তকারে প্রকাশনায় সম্মত হওয়ায় ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে এবং এ ব্যাপারে সার্বিক তদারকির জন্য ইউপিএল-এর সম্পাদক জনাব আবদার রহমানকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পুস্তকাকারে প্রকাশনার পর্যায়ে লেখাটির সম্পাদনা ও পরিমার্জন করে জনাব বদিউদ্দিন নাজির অনেক উপকার করেছেন। তার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই লেখাটির হস্তলিপি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের স্টেনোগ্রাফার জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির অত্যন্ত যত্ন নিয়ে এককভাবে টাইপ করেছেন। এজন্য তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'আজকের কাগজে' প্রকাশিত লেখাটির কিছুটা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। এই গ্রন্থটির প্রকাশনার সময় অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে এর প্রুফ দেখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের কোন রকমের ভ্রম বা তথ্যগত ক্রটি কিংবা ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির নাম ভুলভাবে ছাপা হয়েছে এমন কোন ক্রটি যদি কোন পাঠকের নজরে আসে, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক সে সম্পর্কে লেখককে অবহিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। এ জাতীয় ভ্রম বা ক্রটি গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া
পরমাণু বিজ্ঞানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১। জবাবদিহিমূলক বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রের জনগণের মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য যে কোন ধরনের এক দলীয় ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলে অধিকতর স্বীকৃত। এই সরকার ব্যবস্থা হতে পারে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শাসন কিংবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্বভৌম সংসদের নিকট সর্বব্যাপারে জবাবদিহিকারী মন্ত্রী পরিষদ পদ্ধতির শাসন। যদিও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট রাষ্ট্রীয় অনেক ব্যাপারে জবাবদিহিতা থাকে, তবু সংসদীয় মন্ত্রী পরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাকেই তুলনামূলকভাবে অধিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে বিবেচনা করা হয়। এর, সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থায় সরকার-প্রধান, প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সকল মন্ত্রী জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বভৌম সংসদের কাছে রাষ্ট্রীয় সর্বব্যাপারে যে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন তাই নয়, এ পদ্ধতিতে সকল রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিশ্চয়তা বিধানের সুযোগ থাকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

২। বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির) সরকার ব্যবস্থার চেয়ে আরো অনেক দিক দিয়ে অধিকতর সুবিধাজনক ও গণমুখী। এক, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনকালে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীকে নির্বাচনী অংগীকার, কর্মসূচী, প্রচারণা, ব্যয়ভার, ইত্যাদির দায়দায়িত্ব প্রায়শই এককভাবে বহন করতে হয়। রাষ্ট্রপতি প্রার্থী যদি Incumbency of office-এর সুযোগ প্রাপ্ত হন, তবে তাঁর সঙ্গে বিরোধী দলীয় প্রার্থীর এঁটে ওঠা প্রায়ই অসম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় এসবের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনেক প্রার্থীর ওপর সক্রিয়ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তায়। ফলে, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেশী নিশ্চিত করা যায়। দুই, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনাকালে সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব বহন করতে হয় একক ও সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতিকে। পক্ষান্তরে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে, বিশেষ করে, নীতি সম্পর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়দায়িত্ব বহন করতে হয় সম্মিলিতভাবে মন্ত্রীপরিষদ তথা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে। সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ সুবিধাজনক দিক হচ্ছে এই যে, সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পরিষদ, কমিটি, উপকমিটি ইত্যাদিতে নানানভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার অথবা অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। ফলে, রাষ্ট্র পরিচালনাকালে তাঁদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়, সমস্যা, ইস্যু ইত্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলীয় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের অনেক সুযোগ থাকে। অপর দিকে, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনাকালে রাষ্ট্রপতি এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন দারুণভাবে। এ সব ব্যাপারে তিনি নির্ভরশীল থাকেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গণপ্রচার মাধ্যম ও বিভিন্ন সরকারী এজেন্সীর ওপর। এ সব ব্যাপার ছাড়াও, সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা-কালে মন্ত্রীপরিষদ যে কোন জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকা-বেলায় সারা দেশের সর্বস্তরের ও এলাকার তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের তথা জনসাধারণকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে ও সহজেই সংগঠিত করতে পারেন। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনাকালে রাষ্ট্রপতির কাছে এরূপ জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবেলায় দলীয় নেতা-কর্মীদের তথা জনসাধারণকে সংগঠিত করা, অসম্ভব না হলেও প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ সব কিছু বিবেচনা করে বলা যায় যে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনাকালে সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সব সময় দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ রাখার সুযোগ থাকে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

৩। বৃটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও শিক্ষিত জনগণ সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থার সংগে প্রথম পরিচিত হন। অতঃপর, উপরোল্লিখিত সুবিধাদি ও গণমুখী বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায়, কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, এ অঞ্চলের অধিকাংশ রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও শিক্ষিত নেতা-কর্মী এবং জনসাধারণ সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ সরকার ব্যবস্থার প্রতি ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসী ও আস্থাবান হয়ে পড়েন। গণতন্ত্রে, বিশেষ করে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এ সমস্ত নেতা-কর্মী, ব্যাপক অর্থে সচেতন জনগণের মধ্যে আরো অনেক গুণ ও প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষ ঘটে। মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, মতপার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সহাবস্থান, অসাম্প্রদায়িকতা, গোত্র ও জাতগত ভেদাভেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বর্ণ বৈষম্যের বিরোধিতা, কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা এসবের অন্তর্ভূক্ত।

৪। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত উপমহাদেশ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে আলাদা করে পাকিস্তান নামে স্বাধীন সার্বভৌম পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালে লাহোর সম্মেলনে উত্থাপিত শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ঐতিহাসিক প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি পৃথক অঞ্চল এবং উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা সমন্বয়ে গঠিত হবে আর একটি অঞ্চল। এই দুটো ভূখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও পৃথক রাষ্ট্র। লাহোর প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিল যে, এ দুটো ভূখন্ডের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হলেও এ দুটো অঞ্চল হবে, স্বল্প সংখ্যক কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া, সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অর্থাৎ প্রস্তাবিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে কনফেডারেট পদ্ধতির এবং এর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাসহ উল্লিখিত পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিটি প্রদেশের ও পূর্বাঞ্চলের ভূখণ্ডের সরকার ব্যবস্থা হবে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত সার্বভৌম সংসদের নিকট সর্বব্যাপারে জবাবদিহিতামূলক মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির।

৫। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত উপমহাদেশের বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার রাষ্ট্রীয় ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসংগিক কারণেই প্রয়োজন। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, এই চারটি প্রদেশের সমন্বিত ভূখণ্ডের নামকরণ করা হয় 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং পূর্বাঞ্চলকে একটি প্রশাসনিক প্রদেশ হিসেবে নামকরণ করা হ'ল 'পূর্ববঙ্গ' (পরবর্তীতে 'পূর্ব পাকিস্তান')। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাসহ প্রতিটি প্রদেশের সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির করা হলেও পূর্ণাংগ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার শাসন সংক্রান্ত বিধি-বিধান এককেন্দ্রীক (ইউনিট্যারি) পদ্ধতির করা হয় অর্থাৎ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে পূর্বাঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসনের যে কথা হয়েছিল তা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

৬। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই তৎকালীন পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্পর্কে এ অঞ্চলের জনগণকে চিরতরে বিস্মৃত করা, এ অঞ্চলের সম্পদের ব্যবহারে পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করা এবং সর্বোপরি, এ অঞ্চলকে সর্বব্যাপারে পশ্চিমাঞ্চলের ওপর চিরকাল নির্ভরশীল রাখার লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জন্মগত বা বিভিন্ন স্বার্থগত দিক দিয়ে, পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি অনুগত্য ও পক্ষপাতী আমলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য জাতীয় বিষয়ে সম্পর্কিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পারস্পরিক যোগশাজসে এক সুগভীর ও সুবিস্তৃত পরিকল্পনা মাফিক চক্রান্তে লিপ্ত থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বাঞ্চলের কোন স্বায়ত্তশাসনসচেতন ব্যক্তিত্ব যাতে পাকিস্তানের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে. কেন্দ্রীয় প্রশাসনে এবং মন্ত্রীসভার কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হতে না পারেন তার জন্যও তারা বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন ও চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। এ সব কলা-কৌশল ও চক্রান্তের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের রাজধানী. কেন্দ্রীয় সরকারের দফতর. সুপ্রীম কোর্ট. বিমান বাহিনী. নৌ-বাহিনী. সেনাবাহিনীর সদর দফতর. ব্যাংকিং বীমা ও উন্নয়ন সংস্থাদি এবং অন্যান্য সকল প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণী সংস্থার প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে চলতে থাকে এ অঞ্চলের জনগণের ভাষা. সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সুগভীর ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এর অংশ হিসেবে সর্বপ্রথমে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা না দিয়ে বিদেশী উর্দু ভাষাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনে সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হলে বাংলা ভাষাকে উর্দু. আরবী ও ল্যাটিন হরফে ব্যবহার করার চক্রান্ত চালানো হয়। পরিশেষে. সে চক্রান্তও এ অঞ্চলের মৌলিক অধিকারসচেতন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী তথা জনগণের সোচ্চার তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতার মুখে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৭। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসক বৃটিশদের কাছ থেকে বহুদলভিত্তিক সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পেলেও. তৎকালীন পাকিস্তানী আমলে গণতন্ত্র. গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি. আচার-আচরণ ইত্যাদির প্রতি কোনও মূল্য-মর্যাদা কিংবা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এক কথায়. তৎকালীন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা ও মূল্য-বোধকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া হয়নি। এসবের জন্য দায়ী ছিল পূর্বোক্ত গোষ্ঠী. কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল ও শক্তির নানান চক্রান্তমূলক ভূমিকা। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাসেমব্লীতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারকে হয়রানি. অপদস্ত ও বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়. গণতান্ত্রিক সকল নিয়মনীতি লংঘন করে বর্ষীয়ান মহান নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সরকারকে বরখাস্ত করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আধা সামরিক শাসনও জারি করা হয়েছে। সেসব নিন্দনীয় ঘটনা ঘটানোর পেছনেও পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লিখিত সেই একই গোষ্ঠী. কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল ও শক্তির অশুভ চক্রান্ত ন্যক্কারজনকভাবে সক্রিয় ছিল।

৮। তৎকালীন পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়ার পেছনে অব্যাহত ও সক্রিয়ভাবে নানান ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত গোষ্ঠীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী। সেসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরিষ্ঠতার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানে বহুদলীয় ও সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়। কিন্তু তাকে পদদলিত করে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সেই একই চক্রান্তকারী গোষ্ঠী পারস্পরিক যোগসাজশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন জারি করে। অতঃপর, জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে এক সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক আধা সামরিক তথাকথিত 'বুনিয়াদি গণতন্ত্রে'র লেবাসে দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার ঘোষণা দেন। সে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সার্বজনীন গণতন্ত্র ও কল্যাণমুখী সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সমাজ ও সরকার ব্যবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাসী রাজনীতিক মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতা-কর্মীকে সামরিক জান্তার রোষানলে দীর্ঘকাল হয়রানি, নির্যাতন ও কারাবরণ ভোগ করতে হয়। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা দেশে বহাল থাকে সুদীর্ঘ আট বছর।

৯। এর মধ্যে ১৯৬৬ সালে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে শেখ মুজিব আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বজনীন গণতান্ত্রিক সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা-সম্বলিত ঐতিহাসিক ছয় দফাভিত্তিক দাবির ঘোষণা দেন। উক্ত ঘোষণার পর ছয় দফা দাবির প্রতি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জনসমর্থন যতো বেশী বাড়তে থাকে ততো বেশী হয়রানি ও জেলজুলুমের শিকার হতে হয় শেখ মুজিব এবং তাঁর ছয় দফা দাবির সমর্থক অগণিত রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্র নেতা-কর্মীদের। ছয় দফা দাবির গণআন্দোলন স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবকে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এক গভীর রাতে রাষ্ট্রীয় বিশেষ নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ঢাকাস্থ সামরিক ক্যান্টনমেন্টের এক অজ্ঞাত স্থানে বন্দী করে রাখেন। অতঃপর, শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসি দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রধান আসামী করে সামরিক আইনের আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে চালানো হয় তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা। আইয়ুব খানের শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবির আন্দোলনকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার সে ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র নামে ৬-দফা ও ১১দফার দাবি ঘোষণা দিয়ে তার মোকাবেলায় আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের পতনের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে ১৯৬৯ সালে জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে। ফেব্রুয়ারী মাসে সে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এর ফলে আইয়ুব সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহার করে শেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুবিজসহ ও অন্যান্য সকল আসামীর নিঃশর্তে মুক্তি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত এক বিশল গণসংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সেসব ঘটনা এখন ইতিহাস।

১০। তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহূত এবং ১০ই মার্চ (১৯৬৯) তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত দেশের সকল রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও অরাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও আইয়ুব খানের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সার্বজনীন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনার লক্ষ্যে জাতীয় গণপরিষদ ও প্রদেশগুলোর এ্যাসেমব্লীর নির্বাচন দাবি করেন। বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার দাবি আইয়ুব খান মেনে না নিলেও তিনি দেশে সার্বজনীন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রদেশগুলোর ও জাতীয় গণপরিষদের জন্য নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সেই একই কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও গণতন্ত্র বিরোধী চক্র ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ২৫শে মার্চ (১৯৬৯) তারিখে আইয়ুব খানকে অপসারণ করে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্তির পর সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন জারি করে। একই সঙ্গে সারাদেশে সর্বপ্রকার সভা, মিছিল, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, হরতাল এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে দেশে সার্বজনীন গণতন্ত্র ও সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা আবারও অনির্দিষ্টকালের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১১। ২৮ শে নভেম্বর (১৯৬৯) তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, "১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জাতীয় গণপরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচনের আয়োজন করা হবে এবং সে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় গণপরিষদ পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।" এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রভিত্তিক সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ববঙ্গ নয়, আর পূর্ব পাকিস্তান নয়। শেরে বাংলা ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে বাঙ্গালী জাতির এই আবাসভূমির নাম হবে 'বাংলাদেশ'।"

১২। অনেক টালবাহানার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার সামরিক আইন বহাল রেখেই বিশেষ আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order)-এর আওতায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ-গুলোর নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সালের যথাক্রমে ৭ই ডিসেম্বর ও ১৭ই ডিসেম্বর তারিখ নির্ধারণ করে। সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তনের জন্য নির্দিষ্ট ১৬২ আসনের ১৬০ টি আসনে জয়লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে, জাতীয় পরিষদে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তনের জন্য নির্দিষ্ট ১৩৮ আসনের মধ্যে ৮৩ টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP) বিজয়ী হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেমব্লীর ৩০০ টি আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসনে জয় লাভ করে।

১৩। উক্ত নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়, বিশেষ করে, জাতীয় পরিষদে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারপর, উক্ত নির্বাচনের ফলাফলকে ব্যর্থ করে দেশে সামরিক শাসন, বিশেষ করে, সামরিক বাহিনী প্রভাবিত শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার অভিসন্ধিতে চক্রান্ত শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ কতিপয় গণপ্রত্যাখ্যাত রাজনীতিক, আমলা ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তাবৃন্দ। যাহোক, অনেক টালবাহানার পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঢাকায় ৩রা মার্চ (১৯৭১) তারিখে জাতীয় গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার ঘোষণা দেন। ইতিমধ্যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের নিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা ও তাঁর পূর্বঘোষিত ৬-দফার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তার বিধিবিধান সন্নিবেশিত করে দেশের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে ব্যাপৃত হন। কিন্তু ১লা মার্চ (১৯৭১) তারিখে এক আকস্মিক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বাতিল করে দেন।

১৪। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উক্ত ঘোষণার প্রতিবাদে সেদিন হাজার হাজার লোক ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ও সভা করে। তারপর, ঢাকাসহ সারাদেশে চলতে থাকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন। সে সমস্ত ঘটনায় ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর, বন্দর, এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক জান্তার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার সংঘর্ষ হলে বহু লোক হতাহত হয়। ৭ই মার্চ (১৯৭১) তারিখে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)-এ আয়োজিত লাখ লাখ লোকের এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন এবং কার্যত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ শাসনভার গ্রহণের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন ঃ (১) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে; (২) ১লা মার্চ (১৯৭১) হতে সংঘটিত আন্দোলনে যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে, সে ব্যাপারে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে; (৩) সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং (৪) অবিলম্বে জনগণের নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। পরিশেষে আন্দোলনরত নেতা-কর্মী, কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি প্রধান মন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকেই এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ... এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলঃ প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। ... আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়াবো, ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

১৫। ৮ই মার্চ (১৯৭১) থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাসহ সকল শহর-গঞ্জে, সরকারী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করে দেয়। কেবল অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, পানি-বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিক্যাল ক্লিনিক খোলা রাখা হয়। সে সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, মেডিক্যাল ডাক্তার, আইনজীবী, পেশাজীবী ও সংস্কৃতিসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকজন, কৃষক-শ্রমিক এবং ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীবৃন্দ দলে দলে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে গিয়ে 'জয় বাংলা' ধ্বনির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ, দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করেন।

১৬। ১৫ই মার্চ (১৯৭১) প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর উপদেষ্টা ও উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সংগে নিয়ে ঢাকায় আসেন। তারপর, ১৬ই থেকে ২৪শে মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও উপদেষ্টাদের সংগে আলাপ-আলোচনায় কালক্ষেপণ করেন। সে সময়ে সামরিক সরকার তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমান ও নৌবাহিনীর জাহাজে হাজার হাজার সৈন্য এবং ভারী ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসে। এ সব লক্ষ্য করে তখন বাঙ্গালীদের জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তার আসল উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি বুঝতে বেশী অসুবিধা হয়নি। তাই, বাঙ্গালী জনগণ সামরিক জান্তার, বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আরও বেশী বিক্ষুব্ধ হয়ে সর্বস্তর ও সকল স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে।

১৭। ২৫শে মার্চ (১৯৭১) তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান হঠাৎ (পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই) অতি গোপনে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেদিন রাত সাড়ে এগারটার দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনী মেশিনগান, কামান, ট্যাংক ও অন্যান্য ভারী ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে যুদ্ধাবস্থার মতো সজ্জিত হয়ে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করতে করতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করে এবং যাদেরকে সম্মুখে পায় তাদেরকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হল ছাত্রাবাস দুটোয় আক্রমণ চালিয়ে সারা রাতভর শত শত ছাত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। একই সংগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোকজন ট্যাংক নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ ও পিলখানায় ইপিআর হেড কোয়াটার্স দুটোয় আক্রমণ চালিয়ে সে দুটোর ব্যারাকগুলো অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে এবং শত শত বাঙ্গালী কর্মকর্তা ও জোয়ানদের হত্যা করে। শহরের অন্যান্য স্থানেও তারা হাজার হাজার বাঙ্গালীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং যাদেরকে সামনে পায় তাদেরকে তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা করে। সেদিন রাত বারোটার দিকে পাকিস্তানী সশস্ত্র সেনাবাহিনীর লোকজনেরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টের এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। গ্রেফতার হবার স্বল্প মুহূর্ত আগে রাত বারোটার দিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ইপিআর-এর একটি গোপন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বাঙ্গালী জনগণের প্রতি আকুল ও উদাত্ত আহ্বান জানান।

১৮। ২৫শে মার্চ (১৯৭১) মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ (১৯৭১) তারিখের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন শহরের পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলোয় আক্রমণ চালিয়ে শত শত পাকিস্তনী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করে এবং তাদের কাছ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। ১৭ই এপ্রিল (১৯৭১) তারিখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের নিকটবর্তী ভবেরপাড়ার এক আম্রকাননে (যে স্থানের নাম রাখা হয় 'মুজিব নগর') পাকিস্তানের জাতীয় গণপরিষদ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেমব্লীর আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মাচ (১৯৭১)-এর ঘোষণা মোতাবেক সে ঘোষণাকে ২৬শে মার্চ (১৯৭১) তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। একই সঙ্গে তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের 'বিপ্লবী সরকার' গঠন করেন। আওয়ামী লীগের তাজউদ্দিন আহমদ নিযুক্ত হন বিপ্লবী সরকারের প্রধান মন্ত্রী।

১৯। অপরদিকে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও হাজার হাজার সৈন্যসহ ভারী ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে এনে ছিন্ন ভিন্ন সেনা-বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করে সুপরিকল্পিতভাবে সারা বাংলাদেশের শহর-বন্দর ও গ্রামগঞ্জে লাখ লাখ বাড়িঘর অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত, বালক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, লাখ লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা এবং অগণিত যুবতী নারীদের অবর্ণনীয় ও অমানবিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে শ্লীলতাহানি করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সে পাশবিক গণহত্যার অভিযান থেকে প্রাণ রক্ষায় লাখ লাখ বাঙ্গালী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ পরিস্থিতিতে হাজার হাজার আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পী, সাংবাদিক, বিভিন্ন পেশাজীবী, ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং আনসার, পুলিশ, ইপিআর, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যবৃন্দ মুজিব নগর বিপ্লবী সরকার গঠিত 'মুক্তিবাহিনীতে' যোগ দিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন।

২০। প্রায় নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সদস্যরা পাকিস্তানপন্থী ধর্ম ব্যবসায়ী ও ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ ইত্যাদির নেতৃবৃন্দ এবং তাদের গঠিত তথাকথিত শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ বাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় সুপরিকল্পিতভাবে লাখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাখ বাঙ্গালীর বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত, বালক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা এবং অগণিত যুবতীর শ্লীলতাহানির পর হত্যার মাধ্যমে সারাদেশে এক ত্রাসের ও নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। অবশেষে, নভেম্বর (১৯৭১)-এর শেষের দিকে মুজিব নগর বিপ্লবী সরকার গঠিত মুক্তিবাহিনী সমস্ত শক্তি নিয়ে পাকিস্তানী সেনা-বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করে। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বিমান ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলার মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। অতঃপর, ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় সশস্ত্র বাহিনী ও মুজিব নগর বিপ্লবী সরকারের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ মৈত্রী বাহিনী'। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ মৈত্রী বাহিনীর' কাছে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। ২২শে ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে মুজিব নগর বিপ্লবী সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যপৃত হন।

২১। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটক রেখে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গোপনে সামরিক আদালতে বিচার করে নভেম্বরের শেষের দিকে ফাঁসির দণ্ডাদেশে দণ্ডিত করে। কিন্তু ডিসেম্বরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পরাস্ত এবং প্রায় ৯২০০০ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সদস্য ও আরও কয়েক শত পাকিস্তানী বেসামরিক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ মৈত্রী বাহিনী'র অধীনে বন্দী হওয়ায় তারা সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করার সাহস পায়নি। ইত্যবসরে, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে পিপিপি-এর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করে। এর পরও, প্রায় আড়াই সপ্তাহ নানান টালবাহানায় কালক্ষেপণ করে ভুট্টো সরকার ৭ই জানুয়ারী (১৯৭২) দিবাগত রাতে বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। ১০ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে বঙ্গবন্ধু বৃটিশ সরকারের একটি বিশেষ বিমানে ঢাকায় পৌছান। তেজগাঁও বিমন বন্দর থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত সারা রাস্তায় দণ্ডায়মান লাখ লাখ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতালি ও 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে এবং ফুলের পাপড়ি ছিঁটিয়ে তাঁকে আন্তরিক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। পরিশেষে, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক অভূতপূর্ব বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুকে বীরোচিত গণসংবর্ধনা জানানো হয়।

২২। ১১ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে বঙ্গবন্ধু এক সংবাদ সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেন যে, জাতীয়তাবাদ হবে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূল নীতিসমূহের প্রধান স্তম্ভ, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে এর রাজনৈতিক ভিত্তি, সরকার ব্যবস্থা হবে সংসদীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির, জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ হবে সার্বভৌম এবং সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্য সর্বব্যাপারে জবাবদিহি থাকবেন সংসদের কাছে।এ ঘোষণায় যে বাংলাদেশের সুদীর্ঘকারের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম, বিশেষ করে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালীর অন্তরে লালিত স্বপ্ন ও আশা-আকাংক্ষার অনেকাংশে প্রতিফলন ঘটে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১১ই জানুয়ারীর রাতে জারি করা হয় দেশে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করার লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ। পরদিন অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়ে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর, মন্ত্রীপরিষদের সম্প্রসারণ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত দ্রুততার ও দৃঢ়তার সাথে আত্মনিয়োগ করেন।

২৩। বাঙ্গালীর সুদীর্ঘকালের আশা-আকাংক্ষা, চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা, ধর্ম, বর্ণ, জাত-গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সকলের সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি, সংসদীয় মন্ত্রীপরিযদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিধিবিধান সন্নিবেশিত করে ১৯৭২ সালেই অতি স্বল্প সময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় ৪ঠা নভেম্বর (১৯৭২) তারিখে এবং তা ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, যে কোন আদর্শ চর্চার ও ধর্মকর্ম পালনের স্বাধীনতা, কর্ম সংস্থান ও জীবিকার নিশ্চয়তা, দেশের প্রতিটি অঞ্চল ও এলাকার সুষম উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয় সংবিধানে। এ ছাড়াও, গ্রাম-ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসন, উন্নয়ন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও রাখা হয়। ১৯৭২-এর সংবিধানের বিধিবিধানসমূহের যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল তা হল, সরকারী শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য, প্রধান মন্ত্রীসহ সরকারীদলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে কোন অসদাচরণ অথবা দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে মতামত ও রায় দেয়ার জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক স্থায়ী 'ন্যায়পাল' (Ombudsman) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল এক অনন্যসাধারণ দলিল। সমসাময়িককালের চাহিদা পূরণের এক মূর্ত প্রতীক ছিল ১৯৭২ সালে প্রণীত ও কার্যকরকৃত বাংলাদেশের সংবিধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪। ১৯৭১-এর নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে সবদিক দিয়ে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করা ছিল এক অপরিসীম কঠিন কাজ। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সারা দেশের রাস্তাঘাট, বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা, কয়েক কোটি পরিবারের বাড়িঘর, বাসট্রাক, সড়ক ও রেলপথের সেতু-কালভার্ট, রেলপথ প্রভৃতি পাকিস্তানী সেনা বাহিনী ও তাদের দোসর-দালাল রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, ইত্যাদি বাহিনীর অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের তাণ্ডবলীলায় বহুলাংশে বিধ্বস্ত হয়। সরকারী গাড়ী-বাসট্রাক, ট্রেনের ইঞ্জিন-বগী, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার, বেসামরিক বিমান, স্টীমার, সামুদ্রিক ও নদী পারাপারের জাহাজ, প্রভৃতির সবকিছুই বিধ্বস্ত করেছিল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এবং তাদের দোসর-দালাল বাহিনী। ব্যাংকে গচ্ছিত প্রায় সম্পূর্ণ নগদ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ী বণিকেরা ৩রা ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই। ব্যাংকে রক্ষিত অবশিষ্ট টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকেরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে। তাছাড়াও, বাংলাদেশের বিভিন্ন গোডাউন থেকে প্রায় ত্রিশ লাখ টন বিভিন্ন খাদ্যশস্য পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করেছিল পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারকৃত টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদ ছাড়াও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-কালে বিভিন্নভাবে অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ন্যূনতম তৎকালীন মুদ্রামানে কয়েক হাজার কোটি ডলার।

২৫। সে সময়ে বাংলাদেশের এহেন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্ব হয় বিভিন্ন কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেঃ (১) প্রায় তিন কোটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসিত করা; (২) পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় পাঁচ লাখ সামরিক-বেসামরিক বাঙ্গালীকে স্বদেশে ফেরত এনে পুনর্বাসিত করা; (৩) ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বিধ্বস্ত সেতু-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, সড়ক-রেলপথ, কলকারখানা, আইন-শৃংখলা ও সামরিক বাহিনীর ব্যারাক-দফতর, প্রভৃতির ক্ষেত্রভেদে মেরামত কিংবা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সে সবের কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা সুসংগঠিত করা; (৪) বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে সেসবের কর্মকাণ্ডে দেশপ্রেমিক, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা; (৫) দেশের আইন-শৃংখলা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক ও অন্যান্য আধা সামরিক আইনসিদ্ধ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা; (৬) দেশে সাংবিধানিক শাসন ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও বলবৎ করা; (৭) দেশের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করা; (৮) গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; (৯) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও তাদের মদদে গঠিত দোসর-দালাল তথাকথিত শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস ও অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদের যারা মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দায়ী তাদেরকে বিচারের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা; (১০) স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করা; (১১) পাকিস্তানের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং স্বাধীনতাপূর্ব সময়পর্বের বাংলাদেশের প্রাপ্য পরিসম্পদ আদায় করা ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিশেষ করে, তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি, মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সে সময়ের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় সহযোগিতা ও দেশের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থের অনেক কিছু ত্যাগের মনমানসিকতার জন্য উপরোক্ত দুঃসাধ্য কার্যক্রম ও লক্ষ্যসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের সময়পর্বে।

২৬। ৭ই মার্চ (১৯৭৩) তারিখ নির্ধারিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে প্রথম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু জনসংযোগ সফরে বের হন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর নির্বাচনী জনসভায় যে বিপুল জনসমাবেশ হয়, তাঁর সফর ও জনসভাকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রাণোচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়, তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সরকারবিরোধী মহলগুলোর অপ-প্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। জনসংযোগ সফরের বিভিন্ন পর্যায়ের সভা-সমাবেশে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সত্তরের নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে ভোট চেয়েছিলাম। আপনারা ভোট দিয়েছিলেন আমার নৌকায়। পাকিস্তানীরা ৬-দফা মানেনি। আমিও আপোস করিনি। আপনাদের সঙ্গে বেঈমানী করিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশকে গড়ে তুলতে হবে। ষড়যন্ত্র চলছে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে হবে। মানুষের খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নাই। আমার এই দুঃখী মানুষের বাঁচাতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এই চারটি মূল রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে সোনার বাংলা কায়েম করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়, স্বাধীন, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকারমাত্র। জনগণের শত্রুরা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত আর গুপ্তহত্যার দ্বারা এরা দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে চাইছে। রাতে মানুষ ঘুমাতে পারে না। এদের অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করতে হবে। বন্দুকের নল নয়, বরং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। শোষকের দিন শেষ হয়ে গেছে। শোষিত মানুষের মুক্তির জন্যই আমি সারা জীবন সংগ্রাম করেছি। আজ আমার একমাত্র কামনা, বাংলার দুঃখী মানুষ, বাংলার গরীব চাষী, শ্রমিক-মজুর ও অন্যান্য ছিন্নমূল মানুষ যেন মাথা গুঁজবার ঠাঁই পায়, পেট ভরে খেতে পায়, পরনের কাপড় পায়, রোগের চিকিৎসা পায়, সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করতে পারে। যদি আমার ওপর আস্থা থাকে, আমাকে ভোট দেবেন, আমার মার্কা নৌকা।"

২৭। প্রথম জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ১৪টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ৯৫৯ জন ও ১২১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে মোট ১০৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৭ই মাচ (১৯৭৩) তারিখে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন। সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয় লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, সোহরাব হোসেন, এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও তোফায়েল আহমদ ঐ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অপর ৮টি আসনে জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাসদের আবদুস সাত্তার এবং ৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয় লাভ করেন। আওয়ামী লীগের সেই বিপুল বিজয়ে বিরোধী দলগুলোর অনেক নেতা অভিযোগ করেছিলেন যে, নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক প্রার্থী হয়তো বা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্বাচনের রায়কে নিজেদের পক্ষে নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের অপব্যবহার করে কিংবা রেডিও-টেলিভিশনে ঘোষণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থীকে ঐ নির্বাচনে জেতানো হয়েছে, এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২৮। ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সরকারকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিশেষ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। সে সময়ের ভয়াবহ বন্যায় সারাদেশের, বিশেষ করে, দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সমস্ত ফসল এবং জনগণের বাড়িঘর ও সম্পদ-সম্পত্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছিল মরার ওপর খাড়ার ঘার সামিল। দেশে খাদ্যশস্যের মজুদের অভাব, সকল যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের অভাবের কারণে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয়ে নাজুক অবস্থা, সমৃদ্ধ পশ্চিমা দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে সময়মত পর্যাপ্ত সাহায্য ও আনুকূল্য না পাওয়া ইত্যাদি কারণে দেশে মহামারি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের ব্যাপক ও নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে মহামারি ও দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক লোক প্রাণ হারায়। এ ছাড়াও, সে সময় দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিরও চরম অবনতি ঘটে। কতিপয় স্বাধীনতাবিরোধী ও বিপ্লবের নামে বিভ্রান্ত গুপ্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সন্ত্রাসী, সহিংস, ধ্বংসাত্মক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, গুপ্তহত্যা, রাহাজানি, ইত্যাকার ঘটনায় জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। একই সংগে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের দুর্মূল্য, দুর্নীতিবাজদের মুনাফাখোরি, অর্থলিপ্সু কার্যকলাপ, ইত্যাদির কারণে জনজীবন দুর্বিষহ অবস্থায় নিপতিত হয়। এহেন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশপ্রেমী রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন তথা জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। এরপর, ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৭৪) তারিখে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে অরাজকতা-জনিত সংকট মোকাবেলার জন্য সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

২৯। ২৫ শে জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের কতিপয় উপদল এবং মুক্তিযুদ্ধকালে সহযোগী কতিপয় রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পরামর্শে সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ সরকার পদ্ধতির ব্যবস্থার পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধিবিধান করা হয়। এর পর ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)-গুলোকে একীভূত করে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামে জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত আদেশ বলে অন্যসব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পদক্ষেপকে দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে প্রচার করা হলেও এটা যে বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের আদর্শ, বিশ্বাস, কর্মকাণ্ড ও অঙ্গীকারের সাথে অসংগতিপূর্ণ ছিল এবং বাংলাদেশের রাজনীতিসচেতন জনসাধারণের চিন্তা-চেতনাবিরোধী ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর ফলে রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে তা যে তিরোহিত হয় শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায়েই দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অনেক অগ্রহণযোগ্য অযৌক্তিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুবিধা-সম্পদাদির অপব্যবহারের ঘটনা সংঘটিত হয়।

৩০। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) তারিখে ভোরের দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী ও পাকিস্তানী এজেন্ট মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান, মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ ও মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম মুষ্টিমেয় পাকিস্তানপন্থী রক্ষণশীল জোয়ান ও জুনিয়র কর্মকর্তার সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীনতার সুযোগে তাঁকে সপরিবার হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। পাকিস্তানের তৎকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো, পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার যোগসাজশে ও বাংলাদেশের কতিপয় স্বাধীনতাবিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী গুপ্ত রাজনৈতিক দল ও আওয়ামী লীগের কতিপয় রক্ষণশীল উপদলের নেতাদের সহযোগিতায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও কতিপয় আরব মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থনে যে উক্ত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ধারণা ছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চিহ্ন করলেই বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে উক্ত কলংকজনক ঘটনার পর দেশে শুরু হয় ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রবলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা। ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে খ্যাত বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপর একটি অংশ রক্তপাতহীন ক্যুর মাধ্যমে খুনী মেজর চক্রকে উৎখাত করে এবং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। তারপর, ৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপর একটি পাকিস্তানপন্থী রক্ষণশীল অংশ কতিপয় তথাকথিত সমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক দলের নেতাদের যোগসাজশে এক রক্তাক্ত ক্যুর মাধ্যমে বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফসহ বহু মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথমে অন্যতম উপসামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এবং পরবর্তীতে ২৯শে নভেম্বর (১৯৭৬) তারিখে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও ২১শে এপ্রিল (১৯৭৭) তারিখে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হন। তারপর, তিনি সামরিক আইনবলে বিভিন্ন ফরমান জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আরও এককেন্দ্রীকভাবে শক্তিশালী করেন।

৩১। ৩০শে মে (১৯৭৭) তারিখে দেশে সামরিক আইনের শাসন বলবৎ থাকা অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্যে 'হ্যাঁ' ও 'না'-এর গণভোট। সরকারী ভাষ্য ও তথ্য অনুযায়ী সে গণভোটে ৮৮.৫ শতাংশ ভোটার অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রদত্ত ভোটের ৯৮.৮৮ ভাগ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি আস্থাসূচক 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে বলে দাবি করা হয়। এ ধরনের গণভোট অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক কিংবা জনগণের নির্বাচিত প্রতি-নিধিদের ভোটে প্রদত্ত কোন অধিকার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছিল না। সুতরাং, সে ব্যাপারটি ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সম্পদ ও নির্বাচন কমিশনসহ প্রশাসন যন্ত্রকে ন্যক্কার-জনকভাবে অপব্যবহারের একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। উপরন্তু, তা ছিল শুধু প্রহসনমূলক ব্যাপারই নয়, সকল নৈতিকতা, রীতিনীতিবিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক কাজও বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৭৭) তারিখে এক বেতার ও টেলিভিশনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান 'জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল' (জাগদল) গঠনের ঘোষণা দেন। উক্ত দল গঠনে তিনি রাষ্ট্রীয় সুযোগ, সুবিধা ও সম্পদাদিসহ সামরিক ও আধাসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করেন। সে ব্যাপারটিও ছিল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাদি ও সম্পদাদি অপব্যবহারের আর একটি দৃষ্টান্ত। ২১শে এপ্রিল (১৯৭৮) জিয়াউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ৩রা জুন (১৯৭৮) দেশে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করে। ২৮শে এপ্রিল (১৯৭৮) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার পূর্ব জারিকৃত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের সংশোধনী জারি করে। ঐ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় পদে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে কেবল সেনাবাহিনী প্রধান রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়াসহ রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তারপর, ১লা মে (১৯৭৮) তারিখে তাঁর জাগদল, ভাসানী ন্যাপের মশিয়ুর রহমান গ্রুপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কাজী জাফর-হালিম গ্রুপ, মুসলিম লীগ, জাগমুই ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির সমন্বয়ে একটি ছয় দলীয় 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠন করা হয় এবং সে সময়ে সরকারী চাকুরীতে কর্মরত সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জিয়াউর রহমান সাহেবের এসব কর্মকাণ্ড যে পেশী শক্তির জোরে সংবিধান, আইন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের সামিল এবং স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ছিল শুধু তাই নয়, তা ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদির অপব্যবহারের আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩৩। উপরোল্লিখিত 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' জিয়াউর রহমান সাহেবকে ৩রা জুন (১৯৭৮) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান করে। সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আরও ১০ জন প্রার্থীর অন্যতম ছিলেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী। নির্বাচনী প্রচারকালে জিয়াউর রহমানসহ তাঁর 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে'র নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদি ন্যক্কারজনক ও যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার করেন। সে সব কর্মকাণ্ড ছিল জিয়াউর রহমান সাহেবের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদির অপব্যবহারের আরও একটি উদাহারণ। সামরিক আইন ও প্রশাসন বলবৎ অবস্থায়ই ৩রা জুন (১৯৭৮) তারিখে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে পেশীবলে ভোটকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি, সন্ত্রাস, বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থকদের প্রকাশ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শন, সামরিক বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা ও সদস্যদের ব্যবহার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশাসনের সকল অঙ্গসহ নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার, ইত্যাদির মাধ্যমে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৬.৭ ভাগ ভোটে নির্বাচিত হন বলে দাবি করা হয়। এ সমস্ত কারণে ৩রা জুন (১৯৭৮)-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে একটি কলংকজনক ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

৩৪। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) তারিখে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বাজাদল, BNP) গঠন করে তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তারপর, সামরিক সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) তারিখ দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের জন্য ধার্য করে। সে নির্বাচনের প্রচারকালে নিজের ও দলের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য জিয়াউর রহমান সাহেব সামরিক বাহিনীর সদস্য ও সুযোগ-সুবিধাদিসহ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম রেডিও ও টেলিভিশন, প্রশাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদি যথেচ্ছা ও ন্যক্কারজনক-ভাবে ব্যবহার করেন। সামরিক আইন ও প্রশাসন বলবৎ অবস্থায়ই ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) তারিখে অনুষ্ঠিত ঐ সংসদের সাধারণ নির্বাচনে পেশীবলে ভোটকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি, বিরোধী দল, বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের প্রকাশ্যে প্রাণ নাশের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন, সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের সকল অঙ্গের সদস্য ও নির্বাচন কমিশনকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করা হয় এবং ব্যাপক সন্ত্রাস ও বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। সে নির্বাচনে জিয়াউর রহমান সাহেবের রাজনৈতিক দল, বিএনপি এককভাবে জাতীয় সংসদে ৩০০ টি আসনের ২০৭ টি দখল করে। পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে মাত্র ৩৯ টি আসনে।

৩৫। ৫ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে জাতীয় সংসদে সংবিধান পঞ্চম সংশোধন বিল (১৯৭৯) পাশ এবং তা ৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে বলবৎ করার মাধ্যমে ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) তারিখ থেকে ৯ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখ পর্যন্ত সময়পর্বে জারিকৃত সকল সামরিক আইন, আদেশ-অধ্যাদেশ, ফরমান ও ঘোষণা এবং গৃহীত ও সম্পাদিত সকল কাজকর্ম ও ব্যবস্থা বৈধ করে নেয়া হয়। ৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলেও ৯ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে একটি অস্বাভাবিক গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন নং ৭/৮/১৭৫-১৬০ অনুযায়ী তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজেকে মেজর জেনারেলের পদ থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করেন। ৯ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখের গেজেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোটিফিকেশন নং৭/৮/১৭৫/২৭০ অনুযায়ী পূর্বে প্রকাশিত নোটিফিকেশন বাতিলের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান সাহেব পুনরায় নতুনভাবে নিজেকে মেজর জেনারেলের পদ থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করেন, যা ২৮শে এপ্রিল (১৯৭৮) তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়। সর্বশেষে ৯ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখের অপর একটি গেজেট নোটিফিকেশন নং ৭/৮/১৭৫-২৭০ অনুযায়ী জিয়াউর রহমান সাহেব লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যা ১৯৭৮ সালের ২৯শে এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয়। সেসব নোটিফিকেশনে এটা সুস্পষ্ট যে, জিয়াউর রহমান সাহেব ৯ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখ পর্যন্ত সামরিক অফিসার অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। 'ব্যাক ডেটে' নিজেকে পদোন্নতি দিয়ে জিয়াউর রহমান এটাই প্রমাণিত করেছিলেন যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তিনি যা খুশী তাই করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে 'ব্যাক ডেটে' নিজের আইনগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা যে নৈতিকতাবিরোধী ছিল শুধু তাই নয়, তা ছিল বেআইনী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার।

৩৬। ৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হবার পর থেকে জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁর নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদি', বিশেষ করে, গণসম্প্রচার মাধ্যম রেডিও ও টেলিভিশন যথেচ্ছা ও ন্যক্কার-জনকভবে অপব্যবহার করেন। পরবর্তীতে, ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) তারিখে নিজের রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠন করার পর তিনি রাষ্ট্রীয় পরিবহন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ সফর করে শুধু নিজের নয়, নিজের দলের প্রচার ও ভিত্তি শক্ত করতে বেপরোয়া হয়ে পড়েন। সে লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রচুর অর্থ-সম্পদ নজিরবিহীনভাবে বিতরণ করেন। তাঁর দলের নেতা-কর্মীরাও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থ-সম্পদাদির চরম অপব্যবহার করেন। দলীয় কাজে ও স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থ-সম্পদাদির এমন যথেচ্ছ ও ন্যক্কারজনক অপব্যবহার বাংলাদেশে, এমনকি পাকিস্তান আমলেও হয়নি। তবে, জিয়াউর রহমান সাহেব কখনও তাঁর নিকটতম আত্মীয়স্বজন, এমন কি আপন ভাইকেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদি ব্যবহার করতে দেননি। তা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রশংসনীয় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

৩৭। ৩০শে মে (১৯৮১) তারিখ সকালে চট্টগ্রামস্থ সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর কতিপয় মুষ্টিমেয় হঠকারি অফিসার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর তাঁর সরকারের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন ১৫ই নভেম্বর (১৯৮১) তারিখ রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের জন্য ধার্য করে। ২২শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুন (১৯৮১) তারিখে বিএনপি উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের ঘোষণা দিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে আইনগত আপত্তি উত্থাপিত হয়। ৮ই জুলাই (১৯৮১) তারিখে সরকারী দল বিএনপি জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহারে সংসদে সংবিধান ষষ্ঠ সংশোধনী (১৯৮১) পাশের মাধ্যমে সে আইনগত বাধা ও প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটায়। ১৫ই নভেম্বর (১৯৮১)-এর রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী হিসেবে আরও ৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের ডক্টর কামাল হোসেন। সে নির্বাচনেও বিএনপি রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, অর্থ-সম্পদাদি ও প্রশাসনের সকল অঙ্গের সদস্যদেরসহ নির্বাচন কমিশনের ব্যবহার, পেশীবলে ভোটকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি, সন্ত্রাস ও মাস্তানদের ব্যবহার, বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের, বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য কারচুপি অবলম্বন করে তাদের প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে তাঁর নিকটতম প্রার্থী ডক্টর কামাল হোসেনের চেয়ে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত করে।

৩৮। ২৪শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সক্রিয় সহায়তা ও সহযোগিতায় তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং একই সঙ্গে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ২৭শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে সামরিক আইন প্রশাসনকে আইনগত গ্রহণযোগ্যতা দেখানোর উদ্দেশ্যে সামরিক আইনের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা হয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিকটতম আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৩) তারিখে সেই বেআইনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ মিছিল করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে। সামরিক সরকারের নির্দেশে সেই ছাত্র-মিছিলে পুলিশ মারধর, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি বর্ষণ করলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু ছাত্র হতাহত হয়। সে ঘটনার পর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৩) তারিখে সামরিক সরকার আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ তাঁর দলের অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে বন্দী করে রাখে। ১লা মার্চ (১৯৮৩) তারিখে সামরিক সরকার তাঁদের নিঃশর্তে মুক্তি প্রদান করে।

৩৯। ১লা এপ্রিল (১৯৮৩) তারিখ থেকে সামরিক সরকার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিলে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় ঐক্যজোট। সে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট এক ৯-দফা কর্মসূচী ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বেকার ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন এবং সে অনুযায়ী অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন দাবি করে। অপরদিকে বংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭-দলীয় ঐক্যজোট। সে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ এবং রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখেই জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন।

৪০। ১৪ই নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে সামরিক সরকার প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে পূর্বারোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ২৭শে নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে সামরিক সরকারের ছত্রছায়ায় এবং প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে ও মদদে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও এ. আর. শামসুদ্দোহাকে মহাসচিব করে ২০৮ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে গঠিত হয় সরকারী দল 'জনদল'। সেই সরকারী দল 'জনদল'কে সুসংগঠিত করার জন্য এরশাদের পূর্বসূরী জিয়াউর রহমানের মতো প্রচুর রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, অর্থ-সম্পদাদি যথেচ্ছ ও ন্যক্কারজনকভাবে অপব্যবহার করা হয়।

৪১। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট এবং বি এন পি–এর নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট সামরিক শাসনের অবসানের দাবিতে যৌথভাবে ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে বাংলাদেশ সরকারের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালনের ঘোষণা করে। ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও জনগণের সঙ্গে সচিবালয়ের দু'পাশে অবস্থান নেন যথাক্রমে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। উক্ত অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সেদিন ঢাকায় সংঘটিত হয় ব্যাপক উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও গুলি বর্ষণের ঘটনা। অতঃপর সে রাতে এক রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণে সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সারা দেশে পুনরায় সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ই ডিসেম্বর (১৯৮৩) তারিখে সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৪২। ৭ই জানুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার পুনরায় দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়। ২৪শে মার্চ (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ৯ই এপ্রিল (১৯৮৪) বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ২০ জন সদস্য সে উদ্দেশ্যে বঙ্গভবনে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক সরকারের নেতৃবৃন্দের সংলাপ বৈঠক। ১১ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের ৩৮ জন নেতা বঙ্গভবনে যান এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের উদ্দেশ্যে। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে সরকার পক্ষ ও ১৫ দলীয় জোটের নেতাদের বাকবিতণ্ডা। তারপর আলোচনা মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ১২ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বিএনপি'র চেয়ারপারসন ও ৭ দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গভবনে গিয়ে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। ১৪ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় নেতাদের সঙ্গে এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের দ্বিতীয় দফা সংলাপ বৈঠক। ২০শে এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের নেতাদের তৃতীয় দফা সংলাপ বৈঠক। ১লা মে (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে এরশাদ সাহেব 'জনদলে'র নেতাদের সংগে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন।

৪৩। ২৭শে অক্টোবর (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতায় পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ২৫শে নভেম্বর (১৯৮৪) তারিখে এরশাদ সাহেব সেনাবাহিনী চীফ হিসেবে তাঁর চাকুরীর মেয়াদ আরও এক বছরের জন্যে বৃদ্ধি করেন। ১৫ই জানুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে এক সরকারী ঘোষণায় সরকারের মন্ত্রী পরিষদ ও দেশে বিশেষ সামরিক আইন আদালতের বিলুপ্তি এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহ পুনর্বহালের ঘোষণা করা হয়। একই দিনে ৬ই এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখ সংসদ নির্বাচনের জন্যে ধার্য করা হয়। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে এক সরকারী ঘোষণায় দেশের সকল আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হয়। ১লা মার্চ (১৯৮৫) তারিখে এরশাদ সাহেব এক রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতার অজুহাতে প্রস্তাবিত ৬ই এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখের সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন। সে ভাষণে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি-না তা যাচাইয়ের জন্য তিনি ২১শে মার্চ (১৯৮৫) তারিখে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। একই ভাষণে এরশাদ সাহেব দেশে পুনরায় আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর এবং বিশেষ করে, সামরিক আইন আদালতসমূহ পুনর্বহালের ঘোষণা দেন। তা ছাড়াও, দেশে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২১শে মার্চ (১৯৮৫) তারিখে দেশে 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও (স্বঘোষিত) রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ওপর জনগণের আস্থা আছে কি-না তা যাচাইয়ের জন্য। সে গণভোটে এরশাদ সাহেব বিপুল আস্থাভোট পেয়েছিলেন বলে নির্বাচন কমিশন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

৪৪। ১৬ই আগস্ট (১৯৮৫) তারিখে 'জনদল' ভেঙ্গে দিয়ে এরশাদ সাহেব গঠন করেন পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় ফ্রন্ট'। ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৫) তারিখে সামরিক সরকার দেশে ১লা অক্টোবর (১৯৮৫) তারিখ থেকে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৮৫) তারিখে এক রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণে এরশাদ সাহেব দেশে ১লা জানুয়ারী (১৯৮৬) তারিখ থেকে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১লা জানুয়ারী (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব 'জাতীয় পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের এবং তার চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব নিজেকেই অর্পণের ঘোষণা দেন। ২রা মার্চ (১৯৮৬) তারিখে এক রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণে এরশাদ সাহেব ২৬শে এপ্রিল (১৯৮৬) তারিখে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সে ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট দুটোর পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয় প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে তাঁদের প্রত্যেককে সংসদের ১৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য।তার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক সরকার ১৫ই মার্চ (১৯৮৬) তারিখে সংসদ নির্বাচনে কোন ব্যক্তির এক সঙ্গে ৫টির বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সীমাবদ্ধতার শর্তসম্বলিত একটি অধ্যাদেশ জারি করে।

৪৫। ২১শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখ সন্ধ্যায় ১৫ ও ৭ দলীয় জোট দুটোর নেতৃবৃন্দ পৃথকভাবে স্ব স্ব জোটের আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। ঐদিনই রাত সাড়ে আটটায় এরশাদ সাহেব রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান। অন্যথায়, সামরিক আইনের আওতায় চরম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশংকার ব্যাপারে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের হুঁশিয়ার করে দেন। ২২শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখ সকালে রেডিওতে কেবল ১৫ দলীয় জোটের সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করা হয়। ১৫ দলীয় জোটের নামে গৃহীত ও ঘোষিত সে সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোট দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৫ দলীয় জোটের নির্মল সেন, রাশেদ খান মেনন ও দিলীপ বড়ুয়ার তিনটি দলসহ মাওবাদী পাঁচটি দল এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট সে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ইত্যবসরে, সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২৬শে এপ্রিল (১৯৮৬)-এর পরিবর্তে ৭ই মে (১৯৮৬) তারিখ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৬। ৭ই মে (১৯৮৬) তারিখে দেশে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত নানান প্রকারের হিংসাত্মক ঘটনায় বহু লোক আহত এবং ১৯ জন নিহত হয়। ১০ই মে (১৯৮৬) তারিখ পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট বিপুল সংখ্যক আসনে অনেক ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। তারপর, তিন-চার দিন অজ্ঞাত কারণে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রাখা হয়। অতঃপর, পুনরায় নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু করা হয় এবং তা শেষ হয় ১৯শে মে (১৯৮৬) তারিখে। ঐ দিনের রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদে বলা হয় যে, সরকারী দল 'জাতীয় পার্টি' সে নির্বাচনে ১৫৮টি আসনে জয় লাভের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। সে সমস্ত সংবাদ বুলেটিনে আরও বলা হয় যে, তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট ৯৬টি আসনে, জামাতে ইসলামী ১০টি আসনে, আ. স. ম. আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৪টি আসনে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দল ১০টি আসনে এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা ২২টি আসনে জয় লাভ করে। ঐদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৮ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে, এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান, বল প্রয়োগে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পেশীবলে ভোট কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে সরকারী দলের প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি, জাল ভোট প্রদান এবং সর্বোপরি, প্রশাসনের সকল অঙ্গের সদস্যদের ও নির্বাচন কমিশনকে ভয়ভীতি প্রদর্শনে সরকারের পক্ষে ব্যবহার করে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ৮ দলীয় জোটের প্রকৃত বিজয়কে নস্যাৎ করা হয়েছে।

৪৭। ১৫ই জুন (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব একটি অধ্যাদেশে গঠন করেন "রাষ্ট্রপতির বিশেষ দেহরক্ষী (নিরাপত্তা) বাহিনী"। ৭ই জুলাই (১৯৮৬) তারিখে জাতীয় পার্টির ৩০ জন মহিলাকে সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ১০ই জুলাই (১৯৮৬) তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেন। আ.স.ম. আব্দুর রবের জাসদ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ব্যতীত সকল বিরোধী দলের সদস্যরা সে অধিবেশন বর্জন করেন। ২৬শে আগস্ট (১৯৮৬) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় সংসদের ৮টি আসনের উপনির্বাচন। সে নির্বাচনেও প্রকাশ্যে বল প্রয়োগ, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, পেশীবলে ভোটকেন্দ্র দখল করে সরকারী দলের প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় প্রার্থীদের সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান, জাল ভোট প্রদান এবং ভোট গণনায় প্রকাশ্য ও ন্যক্কারজনক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ৮টি আসনেই জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা হয়। ২৮শে আগস্ট (১৮৮৬) তারিখে তৎকালীন মেজর জেনারেল আতিকুর রহমানকে সেনাবাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) তারিখে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করে নিজেকেই তার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পণের ঘোষণা দেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব নিজেকে লেঃ জেনারেলের পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে, এক সরকারী ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারণ করা হয় ১৫ই অক্টোবর (১৯৮৬) তারিখ।

৪৮। ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) তরিখে এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, মাওবাদী ৫ দলীয় জোট এবং জামাতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন বর্জন এবং তা প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এরশাদসহ খুনী লেঃ কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র ও নামসর্বস্ব দলের প্রার্থী এবং রাজনীতিতে অপরিচিত কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে মোট ১৬ জন রাষ্ট্রপতি পদের সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৫ই অক্টোবর (১৯৮৬) তারিখে পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন। ঐ দিনেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটসমূহ জামাতে ইসলামীর আহ্বানে সেদিন ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সাধারণ হরতাল পালিত হয়। ২৩শে অক্টোবর (১৯৮৬) তারিখে লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

৪৯। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় সংসদে স্বতন্ত্র সদস্যদের সামরিক সরকার প্রধান এরশাদের রাজনৈতিক দল, জাতীয় পার্টিতে সদস্যভুক্ত করার লীলাখেলা। তাই দেখা যায় যে, মন্ত্রীত্ব, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন পদ ও অর্থের লোভে সংসদের ২২ জন সদস্যের প্রায় সবাই ত্বরিত গতিতে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। তার ফলে এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার ১০ই নভেম্বর (১৯৮৬) তারিখে আ. স. ম. আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), হাতে গোণা কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র দলের কয়েকজন সদস্য এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের সমর্থনে সংসদে পাশ করিয়ে নেয় সংবিধান সপ্তম সংশোধনী। সংবিধানের সে সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ২৪শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে নির্বাচিত সরকারকে অসাংবিধানিক ও বেআইনীভাবে উৎখাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণসহ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইনের আওতায় ও ক্ষমতাবলে জারিকৃত সকল আদেশ-অধ্যাদেশ এবং গৃহীত ও কৃত সকল দণ্ডাদেশ, পদক্ষেপ, ক্রিয়াকলাপ, কার্যক্রম, ইত্যাদিকে বৈধ করে নেয়া হয়। ঐদিনই সারা দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১০ই নভেম্বর (১৯৮৬) তারিখের সংসদের ভোটাভুটিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট জামাতে ইসলামীর সদস্যরা সংবিধান সপ্তম সংশোধনীর বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন।

৫০। ১২ই আগস্ট (১৯৮৭) তারিখ সারা দেশে পালিত হয় শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) আহূত বিরতিহীন ২৪ ঘন্টা হরতাল। ১৬ই আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো ঘোষণা করে ৭ই অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' পালনের কর্মসূচী। ২৮শে আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সাহেব এক ঘোষণায় আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) তারিখে বঙ্গভবনে আলাপ-আলোচনা বৈঠকের আহ্বান জানান। ২৯শে আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট এরশাদ সাহেবের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) তারিখে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটও এরশাদ সাহেবের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো দেশে ভয়াবহ বন্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী ৭ই অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখের পরিবর্তে ১০ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯ ও ২০শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে সারা দেশে পালিত হয় শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) আহূত বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টার হরতাল। ইতোপূর্বে, ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো ঘোষণা করে ২৬শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে উপজেলা সরকারী দফতরসমূহ এবং ১লা নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে জেলা সদর দপ্তরসমূহ ঘেরাও কর্মসূচী।

৫১। ২৮শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকার মহাখালীস্থ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের গেস্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সংগে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক আকস্মিক বৈঠক। সুদীর্ঘ দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনা শেষে দুই নেত্রীর নামে এক যৌথ ঘোষণা দেয়া হয়। ঐ যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, "স্বৈরাচারী (এরশাদ) সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমরা ১লা ও ১০ই নভেম্বরসহ আন্দোলনের সকল কর্মসূচীর সাফল্যের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৯৭১-এর চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের লক্ষ্য। এরশাদের (স্বৈরাচারী) সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে দলমত-নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা (জনগণের প্রতি) আহ্বান জানাই।"

৫২। ১০ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আহূত 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী। সরকার-ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাজার হাজার লোক ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে নেতা-কর্মী ও ছাত্র-জনতার সংগে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। কয়েক স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মিছিলকারীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপসহ গুলি বর্ষণ করে। তাতে চারজন নিহত এবং অনেক লোক আহত হয়। নিহতদের অন্যতম ছিল নূর হোসেন নামে এক বলিষ্ঠ সুঠামদেহী যুবক। নূর হোসেন তাঁর জামাবিহীন শরীরের বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' এবং পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখিয়ে নিয়ে একটি ছাত্র-জনতার মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। মিছিলটি ঢাকার গুলিস্তানস্থ 'গোলাপ শাহ মাজার' হয়ে জিপিও-এর সম্মুখস্থ জিরো পয়েন্টে পৌঁছানোর পূর্বেই ঘাতকের বুলেট নূর হোসেনের বুক ভেদ করে বের হয়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে নূর হোসেনের দেহ। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নূর হোসেনের বস্ত্রহীন শরীরের বুকে ও পিঠে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' ও 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' সম্বলিত ছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫৩। ১১ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার ৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা এবং ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে তাঁদের স্ব স্ব বাড়িতে অন্তরীণ রাখে। ১২ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সরকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে 'দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ' দেয়। তা সত্ত্বেও ১২ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সারা দেশে পূর্ণ হরতাল পালনের সময় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত থাকে। সে সময় শত শত রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২১ ও ২২শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটত্রয়ের আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল। ২৭শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সরকার সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণাসহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা শহরগুলোয় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করে। ২৯ ও ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারা দেশে বিরতিহীন ৭২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৫ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে জামাতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য সংসদপদ থেকে ইস্তফা দেন। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সাহেব তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১০ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

৫৪। চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ছিল ৩রা মার্চ (১৯৮৮) তারিখ। সে নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশ গ্রহণ দেখানোর জন্য এরশাদ সাহেব নিজেই বিপুল অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে আ. স. ম. আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর নেতৃত্বে গঠন করান সম্মিলিত বিরোধী দল, COP (Combined Oppositin Party)। অপরদিকে, সে নির্বাচন বর্জন করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো ৩রা মার্চ সকাল ৬টা থেকে ৪ঠা মার্চ (১৯৮৮) সন্ধ্যা ৬টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত বিরতিহীন ৩৬ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে। সে হরতালের কর্মসূচী পালিত হয় যথাযথভাবেই যার ফলে নির্বাচনের দিনে জাতীয় পার্টি ও (COP)-এর লোকেরা ছাড়া সারা দেশের ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। তা সত্য হলেও সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোয় ঘোষণা করা হয় যে, শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি ভোটার সে নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছিল। প্রহসনমূলক সে নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি সংসদের ৩০০টি আসনের ২৫১টি এবং সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) ১৯টি, নামসর্বস্ব ক্ষুদ্র দলগুলো ৫টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫টি আসনে জয় লাভ করে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

৫৫। ৩রা মার্চ (১৯৮৮) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের তথাকথিত নির্বাচনের পর এরশাদ সাহেব দেশের বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত জনসভায় এবং বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, যেহেতু বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি লোক মুসলমান, সেহেতু 'ইসলাম ধর্ম'কে জাতীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। ২১শে এপ্রিল (১৯৮৮) তারিখে আ. স. ম. আব্দুর রব সংসদের ২৫ জন স্বতন্ত্র সদস্যের কিছু সংখ্যক সদস্যকে সম্মিলিত বিরোধী দলে অন্তর্ভুক্ত করে চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১১ই মে (১৯৮৮) তারিখে এরশাদ সরকার 'ইসলাম ধর্ম'কে জাতীয় ধর্মের মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে পেশ করে একটি সংবিধান অষ্টম সংশোধন (১৯৮৮) বিল। ৭ই জুন (১৯৮৮) তারিখে সংসদে সংবিধান অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮) অনুমোদিত হয়। সংবিধানে সেই অষ্টম সংশোধনীতে আরও কয়েকটি বিষয়সহ 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে তাতে বলা হয়, "ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম, তবে প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্মও শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে।" সংবিধান অষ্টম সংশোধনীর সেই বিষয় সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা, অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলি।" অপরদিকে, বিএনপি নেত্রী ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংবিধান অষ্টম সংশোধনীতে 'ইসলাম ধর্ম'কে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার বিষয় সম্পর্কে বলেন, "এরশাদবিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করাই এর উদ্দেশ্য।" ঐ সময়ে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেন্যারেল সি. আর. দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় "রাষ্ট্রীয় ধর্ম" সংক্রান্ত সংশোধনী বাতিলের দাবিতে গঠিত হয় 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ'। ১৩ই জুন (১৯৮৮) তারিখে দেশের বিভিন্ন মহল, সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও এরশাদ সরকারের 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' বিল সংসদে পাশ করিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৬। ১৯৮৮ সালের ১৩ই জুন থেকে ১৯৯০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী কোন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন যৌথভাবে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়। সে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ দেশের দুটো বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-এর মধ্যে আদর্শগত এবং রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ। তা ছাড়াও, এই দল দুটোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে পার্থক্যও অনেকাংশে দায়ী ছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিককাল অধিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে এরশাদ সাহেব সেসব বিষয়ের শুধু ব্যবহারই করেন নি, তিনি এই দুটো দলের নেতৃদ্বয়ের বিরোধকে আরও প্রকট করে তুলতে সক্ষম হন সুচতুর কূটকৌশলে। তার ফলে ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর থেকে এই দুটো দলের নেতৃদ্বয় যতোটা না সময় ব্যয় করেন এরশাদ ও তাঁর সরকারের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরোধিতায়, তার চেয়েও বেশি সময় ব্যয় করেন ও ব্যস্ত থাকেন পারস্পরিক সমালোচনায়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে চলে বক্তৃতা-বিবৃতির লড়াই। ১৯৮৯ সালেই শেখ হাসিনা বক্তৃতা-বিবৃতি দেন প্রায় ৩৫০টি এবং বেগম খালেদা জিয়া দেন প্রায় ৪০০টি। সেগুলোর প্রায় সবগুলোয়েই করা হয় পারস্পরিক সমালোচনা। সে সবের ফলে ঐ সময়ে এরশাদ ও তাঁর সরকারের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন সুসংগঠিত যৌথ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। দেশের এই দুটো বৃহৎ দলের নেতৃদ্বয়ের সেসব পারস্পরিক সমালোচনামূলক বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদানে দেশের জনগণ তখন শুধু হতাশাগ্রস্তই হননি, বিভ্রান্তও হন দারুণভাবে। সে সবের ফলশ্রুতিতে এরশাদ ও তাঁর সরকার শুধু লাভবানই হননি, তাঁরা নির্বিঘ্নে ও নির্ঝঞ্ঝাটে অতিবাহিত করেন সে সুদীর্ঘ সময়।

৫৭। ১২ই জুলাই (১৯৯০) তারিখে এরশাদ সাহেব দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সংগে আলাপ-আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব করেন। ১৩ই জুলাই (১৯৯০) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১লা আগস্ট (১৯৯০) তারিখে সরকার মেজর জেনারেল নূরুদ্দিনকে সেনাবাহিনীর এবং কমোডর মোস্তফাকে নৌবাহিনীর নতুন প্রধান নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৩১শে আগস্ট (১৯৯০) তারিখে মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে, দেশের বিভিন্ন মহল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি পরামর্শ দেয়া হয় এক ও অভিন্ন মঞ্চ থেকে যৌথভাবে এরশাদের স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য। ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও মঞ্চের ঐক্যের কথা বললেও ৮ দলীয় জোটনেত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ হাসিনা সে সমস্ত পরামর্শ ও প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বলেন, "মঞ্চের ঐক্যের প্রয়োজন নেই, রাজপথের ঐক্যই স্বৈরাচারের পতন ঘটাবে।"

৫৮। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে বিএনপি-এর অংগ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন 'ডাকসু'র উদ্যোগে আয়োজিত ও ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সারা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা দেয়া হলে সারা দেশে সরকারবিরোধী মনোভাব চাঙা হয়ে ওঠে। একই সংগে গণতন্ত্রমনা সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারবিরোধী মনোভাব সম্প্রসারিত হয়। ঐ পরিস্থিতিতে বিএনপি-এর অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের অন্যতম নেতা ও 'ডাকসু'র তৎকালীন সহ-সভাপতি আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সকল গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

৫৯। ১০ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো আহূত বাংলাদেশ সরকারের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচি। সে ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে সচিবালয় ও মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকাসমূহে পুলিশ ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি বর্ষণ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপসহ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকাস্থ বেশ কয়েকটি বিদেশী মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিস ভাঙচুর এবং অফিসের অনেক গাড়ি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। কয়েক ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ও পুলিশের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ। সে সমস্ত সংঘর্ষে উল্লাপাড়া কলেজের জেহাদসহ ৫ জন নিহত এবং ৪০ জন পুলিশসহ তিন শতকেরও বেশি ছাত্র-জনতা আহত হয়। ঐ দিনই গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহের কেন্দ্রীয় নেতারা 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদে'র ব্যানারে সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ঘোষণা দেয়।

৬০। ১১ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে সারা দেশে পালিত হয় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটসমূহ আহূত সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল। ১১ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে হরতাল পালনকালে পুলিশের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৩ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানায়। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মনিরুজ্জামান মনিরসহ ২ জন ছাত্র নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। ঐদিন দুপুরে মনিরুজ্জামান মনিরের লাশ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে নিয়ে আসে। তারপর, সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে। ছাত্রদের সে সমাবেশ সমাপ্ত হবার পর সরকারের কতিপয় সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেল আড়াইটার দিকে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-এর মাঝখানে অবস্থিত পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রের চত্বরে ঢুকে ৮টি গাড়ি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। তারপর, তারা প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয় ভবন এবং পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ল্যাবরেটরী ও অন্যান্য ভবনের সমস্ত সিঁড়ি, দরজা ও জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে। পরমাণু শক্তি কমিশন প্রধান কার্যালয় এবং এর গবেষণাগারের ভবনাদিসহ ঢাকার অন্যান্য স্থানে সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডা-মাস্তান কর্তৃক সেদিনের সে সমস্ত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযেগের ঘটনার জন্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোকে দায়ী করে স্বৈরাচারী এরশাদের সরকার এক অধ্যাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

৬১। ১৬ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে স্বৈরাচারী এরশাদ সাহেবকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল। ঐদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে রেল লাইন উৎপাটন, রেল স্টেশনে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙচুর, রেল ও সড়ক পথে ব্যারিকেড স্থাপন, ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐদিন বিকেলে ঢাকায় আয়োজিত ৮ দলীয় জোট এক বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা ঐক্য ভাঙ্গার সাধ্য কারও নেই।" অপরদিকে, ঢাকায় ৭ দলীয় জোট আয়োজিত অপর একটি পৃথক সমাবেশে বিএনপি নেত্রী ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম জিয়া সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, এরশাদ সরকারের উৎখাতের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

৬২। ১৯শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর অনেক নেতা-কর্মী স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ঢাকার জিরো পয়েন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে কালো পতাকা উত্তোলন করে। ২২শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি গুরুত্বপূণ সমাবেশ। সে সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ব্যক্ত করে বলা হয়, "ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতভাবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই খুলে দেবে।" ২৭শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারা দেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। ৩০শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক বিশেষ সভায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান হয়।

৬৩। ঐ সময়পর্বে সরকারবিরোধী আন্দোলন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য এরশাদ সাহেব, তাঁর দল ও সরকার এবং কতিপয় কায়েমী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থান্বেষী মহল এক কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে সময় ভারতের 'বাবরী মসজিদ' ইস্যুকে কেন্দ্র করে সে দেশের কয়েকটি এলাকায় ও শহরে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কিত ঘটনার সুযোগে এরশাদ সাহেব সুকৌশলে লেলিয়ে দেয় তাঁর গুণ্ডা-মাস্তান বাহিনীকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের আক্রমণ, বাড়িঘর, দোকানপাট, উপাসনালয়, প্রভৃতি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করার মাধ্যমে দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করে। সেসব ঘটনায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোকের প্রাণহানিসহ তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও উপাসনালয়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেসবের অজুহাতে এরশাদের সরকার ৩১শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর দুটোয় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে। এরশাদ সরকারের এই হীন চক্রান্ত বুঝতে পেরে সে সময় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো সরকারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করে অভিন্ন কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করে জনসমাবেশ ও শান্তি মিছিল। প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র-সমাজ, জনসাধারণ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও পেশার প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সময়োচিত ও সক্রিয় হস্তক্ষেপে এরশাদের দল ও সরকারের সে হীন চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৬৪। ৯ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' তৃতীয় ও শেষবারের মতো আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১০ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ১১ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে সরকারী আদেশ-অধ্যাদেশ উপেক্ষা করে ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। ছাত্র-শিক্ষকদের সেই যৌথ উদ্যোগ ও পদক্ষেপ চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সে ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের অসহযোগ কার্যক্রম।

৬৫। ১৩ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকার তেজগাঁওস্থ শিল্প এলাকায় 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' আয়োজিত এক সমাবেশে ঘোষণা করা হয়, "যে কোন মূল্যে সরকারবিরোধী আন্দোলন সফল করতে হবে।" ১৫ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকার টংগীস্থ শিল্প এলাকায় 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' আয়োজিত এক সমাবেশে এরশাদ সরকারের উৎখাতের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে আরও তীব্র ও বেগবান করার শপথ নেয়া হয়। ১৬ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে নরসিংদী শহরে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' নেতৃবৃন্দ বলেন, "রক্ত দিয়ে হলেও ১৯৯০ সালের মধ্যেই স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটানো হবে।" ঐদিনই নারায়ণগঞ্জ শহরস্থ শিল্প এলাকার আদমজী জুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলস চত্বরে 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' আয়োজিত এক জনসভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আমানুল্লাহ আমান এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিবকে এক সঙ্গে সভামঞ্চে উপস্থিত দেখে ছাত্র-জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে সমাবেশে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' নেতৃবৃন্দ বলেন, "জেহাদ-মনিরের লাশ ছুঁয়ে আমরা শপথ নিয়েছি। তাই স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবো না।"

৬৬। ১৭ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিল 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' ঘোষিত সারা দেশে 'গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস' পালনের আওতায় ঢাকায় 'মন্ত্রীপাড়া' (মন্ত্রীদের জন্য রাষ্ট্রীয় বাসস্থানসমূহের এলাকা) ঘেরাও কর্মসূচী। সেদিন সরকারের ভাড়া করা কিছু লোক কাকরাইল মসজিদ এলাকাসহ 'মন্ত্রীপাড়া'র চারদিকে ১৩টি স্থানে সভার আয়োজন করলেও ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে সেসব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ছাত্র-জনতা শেরাটন হোটেল মোড়ে এরশাদ সমর্থকদের স্থাপিত একটি সভামঞ্চ সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেয়। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের আহ্বানে সারাদেশে অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক জনসমাবেশে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার উৎখাত আন্দোলনকে আরও জোরদার, তীব্র ও বেগবান করার জন্য অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের রূপরেখা ঘোষণা করে।

৬৭। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের অভিন্ন দাবির ঘোষণায় বলা হয়, "(১) হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তাঁর সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ঃ (ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের ক (৩) ধারা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের ক (১) ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তাঁর সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করতঃ রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। (খ) এই পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। (২), (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সংসদ পদের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। (খ) অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার শুধু প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন। (গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (ঘ) গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার-প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। (৪). (ক) জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরংকুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধানবহির্ভূত কোন পন্থায়, কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। (খ) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে এবং (গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।"

৬৮। ২০শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারাদেশে পালিত হয় সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ২৩শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে আন্দোলনপরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে বিএনপি-এর অঙ্গ ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অন্যতম নেতা সানাউল হক নীরুসহ ৬ জনকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ২৫শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে আন্দোলনপরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অন্যতম নেতা গোলাম ফারুক অভিসহ ৭ জনকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ২৬শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে অভি-নীরুর যৌথ নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান ফিল্মী কায়দায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সহিংস সন্ত্রাস-হামলা চালায়। তাদের গুলিতে নিমাই নামক এক যুবক পান দোকানদার নিহত হন। তারপর অভি-নীরুর নেতৃত্বাধীন গুণ্ডা-মাস্তানরা বাংলা একাডেমীর সামনে একটি মাইক্রোবাস থেকে ঢাকার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর জনসমাবেশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের দিকে আগমনরত একটি ছাত্র মিছিলে গুলি চালালে ৭ জন ছাত্র নেতা-কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। সে ঘটনার পর ঐদিন 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচি ঘোষণা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৯। ২৭শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিল 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' আহূত সারা ঢাকা শহরে লাঠি-মিছিল প্রদর্শন করার কর্মসূচি। সেদিন অভি-নীরুর যৌথ নেতৃত্বাধীন সরকারের ভাড়াকরা একদল সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নেয়। এক সময় 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর একটি মিছিল শহীদুল্লাহ হলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে অভি-নীরুর যৌথ নেতৃত্বাধীন গুন্ডা-মাস্তানরা সে মিছিলে গুলি চালায়। সে ঘটনায় ৩ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বুয়েটের ছাত্রদের একটি মিছিল রোকেয়া হলের সামনের রাস্তা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অভিমুখে যাওয়ার সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানরা সে মিছিলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ঐ সময় আওয়ামী লীগের অন্যতম যুবনেতা ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির তৎকালীন মহাসচিব ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও যুগ্ম-সচিব ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তরুণ শিক্ষক ডাঃ শামছুল আলম খান মিলন একত্রে একটি রিকসায় টিএসসি-এর মোড় অতিক্রম করছিলেন। রিকসাটি টিএসসি-এর মোড় অতিক্রম করে শাহবাগের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানদের বুলেট ডাঃ মিলনের পিঠে বিদ্ধ হয়। মরণ যন্ত্রণায় রিকসা থেকে ছিটকে পড়ে যান ডাঃ মিলন। হাসপাতালে নেয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডাঃ মিলনের মৃত্যুর সংবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঐ মর্মান্তিক ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্র-শিক্ষক-ডাক্তারসহ সকল পেশাজীবীর লোক ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় বিক্ষোভে নেমে পড়েন। ঐদিনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল শিক্ষক ও ডাক্তার একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

৭০। ২৭শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখ রাত সাড়ে আটটায় এরশাদ সাহেব এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘেষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ২৭শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখের রাতে সরকার কর্তৃক সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা এবং সারা ঢাকা শহরে কার্ফ্যু জারি করা সত্ত্বেও ছাত্র-জনতার জংগী বিক্ষোভ মিছিল ও সভা-সমাবেশ থামেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পদত্যাগ এবং ঢাকার আইনজীবীরা কোর্ট বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৮শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। জরুরী অবস্থা আইন ও কার্ফ্যু ভংগ করে ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক-জনতা, বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা নামলেন বিক্ষোভ মিছিলে। ঐদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার একটি অংশ সরকারী দল জাতীয় পার্টির ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ে হামলা চালালে সেখানে ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়। সারা ঢাকা শহর, ডেমরা, ঘোড়াশাল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনা, রাজশাহী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশোর, ফরিদপুর ও বরিশালসহ দেশের প্রায় সব শহরেই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সঙ্গে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহিংস সংঘর্ষ ঘটে। সেদিন সেসব ঘটনায় ৪ জন প্রাণ হারান। বাংলাদেশের সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান এরশাদ সরকারের দেশে জরুরী অবস্থা ও আইন জারির ব্যাপারে কঠোর নিন্দা ও বিরূপ মন্তব্য করে।

৭১। ২৯শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর আহ্বানে সারাদেশে পালিত হয় সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ঐদিন ঢাকা শহরের শাহজাহানপুর ও খিলগাঁওয়ে সরকারের ভাড়াটে মাস্তান ও পুলিশসহ অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। ৩০শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে রামপুরায় সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডা-মাস্তান ও পুলিশসহ অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ঘরে ঘরে গুলি চালালে বুকে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা নিয়ে নিহত হয় শিশুটির মা এবং আহত হয় শত শত লোক। ১লা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় তিন জোট এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর যৌথ আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ঐদিন ঢাকায় জরুরী অবস্থা আইন ও কার্ফ্যু উপেক্ষা করে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিল বের করে। কাজীপাড়া, যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, গেণ্ডারিয়া, সদরঘাট, খিলগাঁও, রামপুরা, মীরপুর, পল্লবীসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডা-মাস্তান এবং পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর লোকেরা মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। সেসব ঘটনায় বহু লোক আহত হয় এবং ৮ জন প্রাণ হারায়। চট্টগ্রামের কালুরঘাট, নারায়ণগঞ্জের মণ্ডলপাড়া ও খুলনায় বিক্ষুব্ধ মানুষের ওপর বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করে সরকারের পুলিশসহ সশস্ত্রবাহিনীর লোকেরা। খুলনায় ৩ জন গুলিবিদ্ধ এবং ২ শতাধিক লোক আহত ও গ্রেফতার হয়। মেলান্দহে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। দেশের সে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐদিন সরকারের সাবেক উপ-প্রধান মন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন এবং জাতীয় পার্টির ৩ জন মন্ত্রীসহ ১৯ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন।

৭২। ২রা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'-এর এক সমাবেশে দেশের রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের একটি কালো তালিকা ঘোষণা করা হয়। ঐদিনই ঢাকা শহরের সর্বত্র প্রচার ও বিতরণ করা হয় 'বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে' শিরোনামে গণঅভ্যুত্থানের আহ্বানে এক বিশেষ বুলেটিন। চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা প্রকাশ্য গণআদালতের বিচারে এরশাদের ফাঁসির দণ্ডাদেশ ঘোষণা করে তাঁর কুশপুত্তলিকা ঝুলিয়ে রাখে।

৭৩। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় তিন জোট ও 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর আহ্বানে সারাদেশে পালিত হয় সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার কর্তৃক পূর্বারোপিত বিধিনিষেধ শিথিল করা হলেও ঐদিনও সাংবাদিকরা সংবাদপত্র প্রকাশ না করার আগের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জংগী বিক্ষোভ মিছিল সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ঢাকা শহরস্থ সেনাকল্যাণ ভবনে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। রাষ্ট্রীয় বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০৫ জন সদস্য পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে কর্মরত ৫৮টি এনজিও সরকার-বিরোধী চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। জাতিসংঘের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় জাতিসংঘের দফতর ও কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর গুলিবর্ষণে চট্টগ্রাম শহরে ১ জন এবং চাঁদপুর শহরে ১ জন নিহত হন। ঐদিন রাত সাড়ে আটটায় এরশাদ সাহেব এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় তিন জোট এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর নেতৃবৃন্দ এরশাদ সাহেবের সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

৭৪। ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখ সকালে লাখ লাখ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-শিল্পী-কর্মী এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জঙ্গী বিক্ষোভ মিছিলে ভরে ওঠে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা-রাজপথ। ঢাকা শহরস্থ দেশের বিভিন্ন শহর-গঞ্জে এরশাদ সাহেবের ছবি ভাংগা ও কুশপুত্তলিকা দাহের ঘটনা ঘটে ব্যাপকহারে। ঢাকায় 'সিভিল সার্ভিস সমন্বয় পরিষদ'-এর সদস্যরা সচিবালয় ও অন্যান্য অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। 'সিভিল সার্ভিস সমন্বয় পরিষদ'-এর সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও। বিকেলে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো ঢাকায় পৃথক পৃথক সমাবেশে এরশাদ সাহেবের আগের রাতের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়ে তক্ষুণি তাঁর পদত্যাগ দাবি করে। 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর নেতৃবৃন্দও একই দাবি ঘোষণা করে। সর্বশেষে, ঐদিন টেলিভিশনের রাত ১০টার সংবাদের সময় এরশাদ সাহেবের অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়। ঐ সংবাদের সাথে সাথেই জরুরী অবস্থা আইন ও কার্ফ্যু উপেক্ষা করে ঢাকায় লাখ লাখ লোক আনন্দ-উল্লাসে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে হাজার হাজার লোকের বিজয় মিছিল।

৭৫। ৫ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় তিন জোট সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতির পদে নিয়োগ করার সুপারিশ করে। ঐদিনই এরশাদ সাহেব চতুর্থ জাতীয় সংসদ বাতিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে, প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন এই শর্তে যে, তিনি একই সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদের রাষ্ট্রীয় চাকুরী বহাল রাখতে পারবেন যাতে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর তিনি সে পদে পুনরায় ফিরে যেতে পারেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় চাকুরী বজায় ও অক্ষুণ্ন রেখেই একই সংগে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতি সাংবিধানিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে নিযুক্ত হতে পারেন না। এ জাতীয় কাজ নিঃসন্দেহে সংবিধানপরিপন্থী।

৭৬। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখ সকালে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর পদে ইস্তফা দেন। তারপর এরশাদ সাহেব সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতির পদে নিযুক্ত করেন। সবশেষে, এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন। তার কয়েকদিন পর প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ৮, ৭ ও ৫ দলীয় তিন জোটের সুপারিশ ও মনোনয়ন মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ১২ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' ও জনগণের দাবিতে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানের একটি বাড়িতে অন্তরীণ রাখে লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তাঁর পত্নী রওশন এরশাদকে। তাঁদের সঙ্গে থাকতে দেয়া হয় তাঁদের পোষ্য এক নাবালিকা মেয়ে ও নাবালক ছেলে সাদ এরশাদকেও। একই দিনে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এরশাদ সাহেবের জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ ১৫ জন প্রাক্তন মন্ত্রী ও নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।

৭৭। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীসমূহের কতিপয় উচ্চাভিলাষী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার যোগসাজশে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ২৪শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও তাঁর সরকারকে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনে উৎখাতের মাধ্যমে নিজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দেশের পবিত্র সংবিধান লংঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও অসদাচরণের অপরাধ করেছেন। তারপর, নিজের ক্ষমতাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ-সম্পদাদির অপব্যবহারের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রভেদে পদোন্নতি, পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানান স্বার্থ লাভের লোভ দেখিয়ে অনেক রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং কতিপয় সুযোগসন্ধানী, ক্ষমতালোভী, দুর্বল চরিত্র, নীতিহীন রাজনীতিক ও সমাজের দুর্নীতিবাজ বিত্তবান, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ লুটপাটকারী ব্যক্তি ও মহল বিশেষকে ব্যবহার ও নিযুক্ত করেন। অবৈধভাবে দখলকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য এরশাদ সাহেব প্রথমে 'জনদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করান। সেই রাজনৈতিক দল 'জনদল' সংগঠিত করার জন্য এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রচুর অর্থ-সম্পাদির অপব্যবহার করেন।

৭৮। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে তাঁর অবৈধভাবে দখলকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সুযোগ-সুবিধা, রাষ্ট্রের সর্বস্তরের প্রশাসনসহ নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বের ওপর জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের নামে তথাকথিত 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর গণভোটের জন্য এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা ও প্রচুর অর্থ-সম্পদের অপচয় করে শুধু দায়িত্ব ও দেশপ্রেমহীনতারই নয়, বালখিল্যতারও পরিচয় দিয়েছেন। তারপর, ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে জনদল ভেঙ্গে দিয়ে এরশাদ সাহেব পাঁচটি নাম সর্বস্ব ক্ষুদ্র দলের সমন্বয়ে গঠন করেন 'জাতীয় ফ্রন্ট'। তার জন্যও এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সকল সুযোগ-সুবিধা ও প্রচুর অর্থ-সম্পদের অপব্যবহার করেন। তারপর, ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে এরশাদ সাহেব নিজেকে (অঘোষিত) চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে 'জাতীয় পার্টি' নামে গঠন করেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল। সেই জাতীয় পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সকল সুযোগ-সুবিধা, অঢেল অর্থ-সম্পদ ও সকল স্তরের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অপব্যবহার করেন। এরশাদ সাহেব সেসব অন্যায়, বেআইনী, বিবেকহীন ও অমার্জনীয় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন ও করান কেবল নিজের স্বার্থ ও অবৈধভাবে দখলকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই, কোনভাবেই সমাজ-রাষ্ট্রের উন্নতি তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য নয়। তাছাড়াও, ১৯৮৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সেনাবাহিনীতে অর্থাৎ রাষ্ট্রের চাকুরীতে কর্ম ও কর্তব্যরত থাকা অবস্থায়ই রাজনৈতিক দল, জাতীয় পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে এবং নিজেকে তার চেয়ারম্যান নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে শুধু রাষ্ট্রীয় কর্মচারী আইন-শৃঙ্খলা লংঘনই করেননি, সেটা ছিল তাঁর নিয়মনীতি ও আইনের প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের সামিল।

৭৯। ১৯৮৬ সালের ৭ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ এবং ২৬শে আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ৮টি আসনের উপনির্বাচনে এরশাদ সাহেব গুণ্ডা-মাস্তানের পেশী ও অস্ত্রবলে ভোটকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে ব্যালট পেপারে নিজদল জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি, বিরোধী দল, বিশেষ করে, আওয়ামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগের সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান, বোমাবাজি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, অঢেল টাকা-পয়সা বিতরণে ভোট ক্রয় ও জাল ভোট প্রদান, সন্ত্রাস-হত্যা এবং সর্বোপরি, মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে তাঁর দল জাতীয় পার্টির সংসদে নিরংকুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন দেখিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কলংকজনক অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। তারপর, ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচন বর্জন ও প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রসহনমূলক রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এরশাদ সাহেব নিজেকে দেশের জনগণের কাছে হাস্যাস্পদে পরিণত এবং বহির্বিশ্বে দেশের ইজ্জত, সম্মান ও ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছেন। সর্বশেষ, ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসহ প্রায় সকল দলের নির্বাচন বর্জন ও প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোটি কোটি টাকা প্রদানে ও নানানভাবে সাহায্য করে আ. স. ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বে তথাকথিত 'সম্মিলিত বিরোধী দল', COP (Combined Opposition Party) গঠন এবং তাঁকে দলবর্জিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়ে চতুর্থ জাতীয় সংসদের ভোটারবিহীন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এরশাদ সাহেব দেশের জাতীয় সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন দারুণভাবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ঐ সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ও সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, নজিরবিহীন অর্থ-সম্পদাদির অপচয়, সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান বাহিনী গঠন, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু, সর্বস্তরের প্রশাসনসহ নির্বাচন কমিশনকে নিজের ও নিজ দলের পক্ষে ব্যবহার, পেশী ও অস্ত্রবলে ভোটকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে নিজের ও নিজ দলের পক্ষে ব্যালটে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি, অঢেল টাকা-পয়সা বিতরণে ভোট ক্রয়, জাল ভোট প্রদান, সর্বোপরি 'হ্যাঁ' বা 'না' সূচক ভোটের মাধ্যমে নিজের ওপর জনগণের আস্থা যাচাইয়ের প্রহসনমূলক গণভোট এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের হাস্যকর প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এরশাদ সাহেব দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণকে শুধু বীতশ্রদ্ধই করেননি, তিনি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন।

৮০। লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পৌনে নয় বছরের শাসন আমল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে অভিহিত ও চিহ্নিত আরও নানান কারণে। ১৯৮২ সালে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এরশাদ সাহেব তাঁর নিজের ভাবমূর্তি গড়ার এবং পরবর্তীতে নিজের ও নিজ রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় রেডিও ও টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমকে গোয়েবলসীয় কায়দায় অপব্যবহার করেন লাগামহীনভাবে, বিশেষ করে ১৯৮৬ সালের মে মাসে তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচনকালে এবং ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয় রেডিও ও টেলিভিশনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক দলীয় প্রচারে অপব্যবহার করেন একচ্ছত্রভাবে। প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সংবাদ সম্প্রচারকালে ক্রমানুসারে এরশাদ সাহেব, তাঁর পত্নী রওশন এরশাদ ও তাঁর সরকারের মন্ত্রীদের এবং নানান উপলক্ষে তাঁদের এমনভাবে ও এতক্ষণ ধরে দেখানো হয় যার ফলে জনগণ ব্যঙ্গ করে সে সময় রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে 'সাহেব-বিবি-গোলামে'র বাক্স হিসেবে অভিহিত করে। প্রতি শুক্রবার এরশাদ সাহেব বিশেষ হেলিকপ্টারে ও সংগে বিমান বাহিনীর আরও কয়েকটি হেলিকপ্টারে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দেহরক্ষী (নিরাপত্তা) বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে জুমার নামাজের অছিলায় যেতেন আটরশির ভণ্ড পীরের আড্ডাখানায়। সে কাজে এরশাদ সাহেব তাঁর পৌনে নয় বছরের শাসন আমলে বেহিসেবি অজস্র রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদাদির অপচয় করেন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও খামখেয়ালিভাবে।

৮১। এরশাদ সাহেব নিজে তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও দলের প্রায় সকল সদস্য, বিশেষ করে, তাঁর পত্নী রওশন এরশাদ এবং রওশন এরশাদের বোন ও নিকট আত্মীয়স্বজনরা নজির-বিহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ লুটপাটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। সেসব কাজে তাঁরা বহু দুর্নীতিবাজ আমলা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যবহার করেন। সে সুযোগে এরশাদ সাহেবের পৌনে নয় বছরের শাসন আমলে সেসব দুর্নীতিবাজ আমলা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারও অসদুপায়ে টাকার পাহাড় বানান। এরশাদ সাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ ব্যবহার করে অনেক সুন্দরী মহিলা শিল্পী, টেলিভিশনের সংবাদ পাঠিকা ও ঘোষিকা এবং তথাকথিত সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী সুন্দরী মহিলারাও দুর্নীতি ও অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ-সম্পদাদির মালিকে পরিণত হন। এক কথায় বলা যায় যে, এরশাদ সাহেবের শাসন আমলে তাঁর নারীঘটিত কায়কারবারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা পৌরাণিক বৃন্দাবনের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিত। সবচেয়ে নিন্দনীয় যে কাজটি এরশাদ সাহেব করেন তা ছিল অঢেল টাকা-পয়সা বিতরণ, সুযোগ-সুবিধা প্রদান, দুর্নীতি ও নানান অন্যায়-বিবেকহীন কাজে প্রশ্রয় দানের মাধ্যমে ছাত্র সমাজের নৈতিক চরিত্র, লেখাপড়া ও জ্ঞান অর্জনের মনমানসিকতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা। নানান অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব শিক্ষায়তন বন্ধ ঘোষণা দিয়ে এবং একনাগাড়ে সেসব বন্ধ রেখে তাঁর শাসন আমলে এরশাদ সাহেব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও পংগু করে ফেলেন। একই সংগে ছাত্র-সমাজের মধ্যে সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান-সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এরশাদ সাহেব শিক্ষার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট করেন দারুণভাবে।

৮২। রাষ্ট্রপতির ভবন 'গণভবন' এবং পুরাতন সংসদ ভবনের কার্যালয় এরশাদ সাহেব তাঁর রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের কাজে বেপরোয়াভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ-সুবিধা-সম্পদাদির অপব্যবহারের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর নিজের এবং রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির সেসব সভা-সমাবেশ আয়োজনে শুধু রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদাদিই নয়, তিনি সর্বস্তরের প্রশাসনকে ব্যবহার করেছেন বেপরোয়াভাবে। রাষ্ট্রীয় অর্থে ক্রয়কৃত মাইক্রোবাস, বাস, কোচ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে ব্যবহারের জন্য দিয়ে সেসবের গায়ের দু'পাশে 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি এরশাদের উপহার' কথাগুলো লিখিয়ে এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয় খরচে ব্যক্তিগত মহানুভবতার প্রদর্শন ও প্রচার করে শুধু ভণ্ডামিই করেননি, তার মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার এক অভিনব কৌশল অবলম্বনেরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সুদীর্ঘ পৌনে নয় বছর শাসন আমলে এরশাদ সাহেব দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে নানানভাবে কলুষিত করেছেন। তবে এরশাদ সাহেবের উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টির এবং তাকে বিপুল প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের পেছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থাকলেও উপজেলা ব্যবস্থায় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও কার্যকর করার যে অনেক সুযোগ-সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৮৩। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে নির্বাচন কমিশন পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের জন্য ধার্য করে ২রা মার্চ (১৯৯১) তারিখ। ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে গঠন করে বিচারপতি আনসার উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের ও ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি। ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে নির্বাচন কমিশন ২রা মার্চ (১৯৯১) তারিখের পরিবতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখ পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের জন্য চূড়ান্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করে। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সে নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া এবং প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ হিসেবে নির্ধারিত ছিল ১৯৯১ সালের যথাক্রমে ১৩ই ও ২১শে জানুয়ারী।

৮৪। ১লা জানুয়ারি (১৯৯১) তারিখে লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক বাসস্থান ক্যান্টনমেন্টস্থ সেনাভবন থেকে নগদ প্রায় দুই কোটি টাকা এবং কয়েকটি অবৈধভাবে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় সে মর্মে সরকারের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ পত্র-পত্রিকায় একটি প্রেসনোট প্রকাশ করে। ৮ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে অন্তর্বর্তী-কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাচ্যুত লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের ২ নম্বর দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারাবলে দায়ের করে দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহার সংক্রান্ত একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামলা। ১২ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ক্ষমতাচ্যুত লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে অভিযুক্ত করে অপর একটি মামলায় আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়।

৮৫। ১৩ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ ছিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করার শেষ দিন। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা শহরে ২টি, চট্টগ্রাম শহরে ১টি এবং ফেনী ও বগুড়ায় ১টি করে মোট ৫টি আসনের নির্বাচনে প্রার্থী হন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা শহরে ২টি এবং গোপালগঞ্জের (টুংগীপাড়ার) ১টিসহ মোট ৩টি আসনের নির্বাচনে প্রার্থী হন। ক্ষমতাচ্যুত লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রংপুর জেলার ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনের নির্বাচনে প্রার্থী হন। ১৪ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত সব মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর ৩,৭৬৪টি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করে। মনোনয়নপত্র দাখিলে পদ্ধতিগত ক্রুটির কারণে এরশাদ সাহেবের সবগুলো মনোনয়নপত্র সাময়িকভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে এরশাদ সাহেবের পক্ষে নির্বাচন কমিশনে আপীল করা হলে, নির্বাচন কমিশন তাঁর ৫টি মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করে। ২১শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। সেদিন ১ হাজার ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ঐদিনই নির্বাচন কমিশন কেবল গাইবান্ধা-১ আসন ছাড়া ২৯৯টি আসনে মোট ২,৭৮১ জন প্রার্থী পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সে মর্মে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দেয়। ২৬শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ক্ষমতাচ্যুত লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে আনীত মামলার চার্জশীট সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করা হয়।

৮৬। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে সেখানের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' ক্ষমতাচ্যুত লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিচার দাবি করে একটি বিবৃতি প্রদান করে। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বহালরত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখার পক্ষে তাঁর দলীয় নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখ সন্ধ্যায় রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে এক প্রদত্ত ভাষণে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "এবারের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য।" ঐ রাতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, "যে কোন মূল্যে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করা হবে।" ২৭শে ফেব্রুয়ারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৯১) তারিখে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখ বিকেল চারটার মধ্যে ২৯৪টি আসনের ফলাফল বেসরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে বিএনপি ১৩৭টি, আওয়ামী লীগ ৮৫টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামাতে ইসলামী ১৮টি, সিপিবি ৫টি, বাকশাল ৫টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি, ওয়ার্কার্স পাটি ১টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি, জাসদ (সিরাজ) ১টি, এনডিপি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৩টি আসন পায়। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উভয়ই পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটিতেই বিজয়ী হন। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র একটিতে বিজয়ী হন। ঐদিন সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, "কতিপয় অদৃশ্য শক্তির গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নির্বাচনে অতি সূক্ষ্ম ও সুকৌশলে কারচুপি করা হয়েছে।"

৮৭। ১লা মার্চ (১৯৯১) এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার তালিকায় ত্রুটি না থাকলে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেত।" তিনি আরও বলেন, "প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিয়ে আমরা কোয়ালিশন সরকার গঠন করব।" ঐদিনই আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য এবং নির্বাচনে পরাজিত ডঃ কামাল হোসেন এক বিবৃতিতে গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি আশা করি, সবাই অর্জিত গণতন্ত্র রক্ষা করবেন।" ঐ দিন রাতে রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনোত্তর ভাষণে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "কোন দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়ায় এ মুহূর্তে মন্ত্রীপরিষদ গঠন সম্ভব নয়।" ৩রা মার্চ (১৯৯১) তারিখে বিএনপি-এর এক সংসদীয় দলের সভায় বেগম খালেদা জিয়া সর্বসম্মতভাবে বিএনপি-এর সংসদীয় দলের প্রধান (নেত্রী) নির্বাচিত হন। তারপর, তিনি ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৮৮। ৪ঠা মার্চ (১৯৯১) তারিখে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক মীমাংসা ছাড়া মন্ত্রীপরিষদ গঠন করতে পারেন না।" তাঁর জবাবে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ প্রতিনিধিদলকে বলেন, "যিনিই প্রধান মন্ত্রী হোন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতা হারাবেন না।" ৫ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে গণতন্ত্রী পার্টি, বাকশাল, ন্যাপ (মোজাফফর) ও সিপিবি যৌথভাবে ঘোষণা করে যে, বিএনপি সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাজি হলে তাঁরা বিএনপিকে সমর্থন দেবে। ৮ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে জাতীয় পার্টির এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসদীয় দলের সভায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ৯ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে সংসদের ৪টি আসনের কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকার স্থগিত নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠিত হলে তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩টিতে এবং বিএনপি ১টিতে বিজয়ী হয়। ১০ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের এক সভায় শেখ হাসিনা সর্বসম্মতভাবে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন।

৮৯। ১১ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে জামাতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনে বিএনপিকে পূর্ণ সমর্থন প্রদানে তাঁদের দলের সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে অবহিত করেন। ১১ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ বলেন, "সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় বিএনপি রাজি না হলে আওয়ামী লীগই সংসদে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিল আনবে।" ১২ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের নির্বাচনী প্রচারণা উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে আয়োজিত এক জনসভায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে মন্ত্রী-এমপিরাও রেহাই পাবেন না।" ১৪ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে ভূমিকা পালনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রেসিডিয়ামের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ডঃ কামাল হোসেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে লেখা এক সুদীর্ঘ ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিতে উল্লিখিত (১৯৯১-এর) জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে দলের পরাজয়ের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের এক পর্যায়ে বলেন, "(নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে) অতি উচ্চ ধারণা ও আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের আত্মম্ভরিতা এবং নেতা ও কর্মীদের কর্মবিমুখতা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী।" ঐ দিনই মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বিএনপি প্রার্থী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর থেকে অনেক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন।

৯০। ১৫ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১৮ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোকে বঙ্গভবনে (রাষ্ট্রপতি ভবনে) গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান জানালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট সে বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী করে, ১০ জন পূর্ণ মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২০শে মার্চ (১৯৯১) তারিখ বিকেল ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটিকায় বঙ্গভবনের দরবার হলে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী, ১০ জনকে পূর্ণমন্ত্রী ও ২০ জনকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করায় আবদুল মতিন চৌধুরী ঐদিন শপথ গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, উক্ত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য সংসদ সদস্যসহ দলের কোনও নেতা-কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না।

৯১। ২১শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ঘোষণা করা হয়। ২৮শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনে বিএনপি ২৮ জনকে এবং জামাতে ইসলামী ২ জনকে মনোনয়ন প্রদান করলে তাঁদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। সেটা ছিল বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতার ও আঁতাতের ফসল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখের জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণার অব্যবহিত পর কুষ্টিয়া-২ আসনের একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে স্থগিত নির্বাচন ২৮শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী হন।১লা এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কতিপয় সাংবাদিককে বলেন, "সংসদীয় সরকার পদ্ধতির লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলব।" ২রা এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁদেরকে বলেন, "জাতীয় সংসদেই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টির সমাধান হওয়া উচিত।"

৯২। ৫ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখ সকাল নয়টায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী (প্রথম) অধিবেশন শুরু হয় বিদায়ী স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে। তুমুল বাক-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে বিভক্তি ভোটে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন বিএনপির যথাক্রমে আবদুর রহমান বিশ্বাস ও শেখ রাজ্জাক আলী। ঐদিন বিকেল তিন ঘটিকায় ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে সংসদে ভাষণ দেন। সে ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বা সংসদীয় পদ্ধতি—কি ধরনের সরকার হবে সেটা আমার ব্যাপার নয়। সেটা সংসদের ব্যাপার। আমার ইছা এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া।"

৯৩। ১০ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, "বার ঘন্টার মধ্যে (ক্ষমতাচ্যুত) এরশাদকে কারাগারে পাঠাতে হবে।" তার জবাবে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "এরশাদকে শীগ্গিরই কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হবে। কিন্তু কারাগারে পাঠাতে অনেক নিয়ম-কানুন আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই এ ব্যাপারে কিছু সময়ের প্রয়োজন।" ১৮ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে এরশাদ সাহেবকে গুলশানস্থ অন্তরীণ রাখা বাড়ি থেকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৪শে এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, "সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল গত ১৪ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে সংবিধান একাদশ সংশোধনী বিল সংসদ সচিবালয়ে জমা দিয়েছে।" ২৫শে এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে সংসদে উত্থাপিত রেডিও ও টেলিভিশন সংস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিরোধী দলীয় প্রস্তাব বিএনপি সরকারী সংসদীয় দলের কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

৯৪। ৫ই জুন (১৯৯১) তারিখে ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্য প্রদত্ত এক রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "সরকার পদ্ধতির (প্রশ্নটির) মীমাংসা করে আমাকে (রাষ্ট্রপতির) দায়িত্ব থেকে অনতি-বিলম্বে অব্যাহতি দিন।" ৭ই জুন (১৯৯১) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৯ই জুন (১৯৯১) তারিখে দেশের সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে আয়োজিত বিএনপি কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় নাটকীয়ভাবে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০ই জুন (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত বিএনপি সংসদীয় দলের এক সভায় সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যদিয়ে। ১২ই জুন (১৯৯১) তারিখে বিশেষ আদালত আগ্নেয়াস্ত্র আইনে ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

৯৫। ১৭ই জুন (১৯৯১) তারিখে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "বিএনপি এখন সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে।" ৩০শে জুন (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে জারিকৃত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) বাতিলকরণ প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি বিলের নোটিশ সংসদ সচিবালয়ে দাখিল করেন। ১লা জুলাই (১৯৯১) তারিখে রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "সময়ের চাহিদা অনুসারে সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জাতীয় সংসদ শীগ্গির এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।" ঐদিনই প্রধান মন্ত্রীর সে ভাষণের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে বিএনপি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯৬। ২রা জুলাই (১৯৯১) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জাতীয় সংসদে পেশ করেন সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবিধান দ্বাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১)। তারপর, আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ সংসদে পেশ করেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের পূর্ব (সুপ্রীম কোর্টের প্রধার বিচারপতির) পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত সংবিধান একাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১)। ৪ঠা জুলাই (১৯৯১) তারিখে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ কর্তৃক বহু আগে পেশকৃত সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের পূর্বপদে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিল সংসদে পুনরায় উত্থাপিত হয়। সংসদ স্পীকার ঐ বিলটিকে সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধন বিল (১৯৯১) হবে বলে রুলিং দিলে প্রায় আড়াই ঘন্টা ভীষণ উত্তপ্ত বিতর্কের পর বিরোধী দল আওয়ামী লীগ দলের সাংসদরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। ৬ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে ৫ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ সংবিধান সংশোধনীর ব্যাপারে একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃথক পৃথকভাবে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৯ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে সরকারী দলের দুটো সংবিধান সংশোধন বিল এবং আওয়ামী লীগের সংবিধান সংশোধন বিল সংসদের বিশেষ (স্থায়ী) কমিটিতে পাঠানোর জন্যে সর্বসম্মত-ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯৭। ১০ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন ইউসুফ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আনয়নের লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয়ে একটি সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিশ পেশ করেন। ১৪ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে সংসদকে অবহিত করেন যে, (ক্ষমতাচ্যুত) এরশাদের শাসন আমলে দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৩২ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে এবং ৮১টি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৬ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে 'গণভোট' আইন বিল (১৯৯১) উত্থাপিত হয়। সে বিষয়ের ওপর বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদকে বক্তব্য রাখতে না দেয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ সাংসদরা একযোগে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। ২৮শে জুলাই (১৯৯১) তারিখে সংবিধান সংশোধন বিল বাছাই বিষয়ক সংসদের বিশেষ কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐদিন সংসদে সরকারী দলের পেশকৃত সংবিধান সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটোয় ২৬টি পরিবর্তন আনা হয়। ৩০শে জুলাই (১৯৯১) তারিখে সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটোর ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু হয়। ঐ দিন সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবিধান সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটোর আরও কিছু বর্জনের দাবি করে। ঐ দিনই রাজনৈতিক দল 'বাকশাল' আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

৯৮। ১লা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদরা 'ইনডেমনিটি' (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ বাতিলের ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য বিএনপি-এর নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান। ২রা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে বলেন, "সংবিধান সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটো পাসে আওয়ামী লীগ রাজি নাও হতে পারে।" তাঁর জবাবে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "সংবিধান সংশোধন বিল পাশ না করা হলে আমি পদত্যাগ করবো।" ৩রা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে সংবিধান সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটোর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। ইত্যবসরে, বিএনপি সরকার সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটো আওয়ামী লীগকে উপেক্ষা করে ও পাশ কাটিয়ে সংসদে জাতীয় পার্টির সমর্থনে পাস করিয়ে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। সে উদ্দেশ্যেই বিএনপি সরকার ৫ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, সংসদে পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং পার্টির তৎকালীন মহাসচিব ও সংসদ সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে পার্টির চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য ও সংসদে পার্টির সংসদীয় দলের নেতা সাজাপ্রাপ্ত লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই ঘন্টা বিশেষ বৈঠক করার অনুমতি দেয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য ও সংসদে পার্টির সংসদীয় দলের নেতা লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির সাংসদদেরকে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১) দুটোর পক্ষে ভোট দেয়ার নির্দেশ দেন।

৯৯। ৬ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১) দুটো অনুমোদিত হয়। সংবিধান একাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১)-এর ব্যাপারে জাতীয় পার্টি ও এনডিএফ-এর এক মাত্র সাংসদ ভোটদানে বিরত থাকলেও সংবিধান দ্বাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১) পাস হয় সর্বসম্মতভাবে। উল্লেখ্য, সংবিধান একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উপরাষ্ট্রপতি ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণের দিবস থেকে তাঁর পূর্ব (সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির) পদে ফিরে যাওয়ার দিবস পর্যন্ত সময়পর্বে গৃহীত ও কৃত সকল পদক্ষেপ ও ক্রিয়াকলাপ বৈধ হিসেবে ঘোষিত হয়। সংবিধান একাদশ সংশোধন আইন (১৯৯১) সংবিধানের চতুর্থ তফশিলে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের পর ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ হিসেবে সংযোজিত করা হয়। এতে বলা হয়, "১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তাঁহার নিকট পদত্যাগ প্রদান এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১)-এর প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে বা ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে (যাই পরে হউক) উক্ত উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত অথবা প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত বলিয়া বিবেচিত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং আইনানুযায়ী যথাযথভাবে প্রণীত, প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সে সময় প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে ইস্তফা দিলে অথবা অপর কোন ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রের কোন চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন না, উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে সংবিধান একাদশ সংশোধনী (১৯৯১)-এর প্রয়োজন হত না।

১০০। সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধান মন্ত্রী সরকারের কার্যনির্বাহী প্রধান। উল্লিখিত দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রধান মন্ত্রীর ও রাষ্ট্রপতির যে দায়িত্ব-ক্ষমতা প্রদান করা হয় তা মোটামুটি বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালে প্রণীত ও বলবৎকৃত সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব-ক্ষমতার অনুরূপ। জাতীয় সংসদে সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১) দুটো পাস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি সরকার ৭ই আগস্ট (১৯৯১) দিবসকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। ৭ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখ সন্ধ্যায় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জাতীয় সংসদে সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১) দুটো পাস হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন। ঐদিনই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১) দুটো পাস হওয়ার ঘটনাকে জনগণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা-আকাংক্ষা বাস্তবায়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন।

১০১। ৮ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ও সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় সংসদে পেশ করেন 'ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স' (১৯৭৫ সালের ১৯ নম্বর অর্ডিন্যান্স) বাতিল সংক্রান্ত বিল। বিলটির ওপর কিছু আলোচনার পর সেটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংসদে গঠিত একটি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ (স্থায়ী) কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১২ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন যে, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১)-এর জন্য 'গণভোট' গ্রহণ আবশ্যক এবং তা অনুষ্ঠিত হবে ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে। ১৩ই আগস্ট (১৯৯১) রাত ২টা ৪৫ মিনিটে সংসদে সকল বিরোধী দলের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে জাতীয় সংসদে পাশ করানো হয় বিএনপি সরকার কর্তৃক পেশকৃত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (আইন) বিল (১৯৯১)। ঐ আইনে সংসদ সদস্যদের প্রকাশ্য ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ৩১শে আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে পার্টির সংসদীয় দলের নেতা লেঃ জেনারেল (অঃ) হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে তাঁর শাসনামলে সংঘটিত দেশের এক বৃহত্তম সোনা চোরাচালান মামলার চার্জশীটি দাখিল করা হয়।

১০২। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনগুলোর উপ-নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি-এর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক জনসভায় পার্টির চেয়ারপারসন ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "পাঁচ বছরের আগে কোন চক্রান্ত করে বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।" ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে সংসদের শূন্য আসনগুলোর উপনির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা শহরের মানিক মিয়া এভিনিউয়ে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ-দানকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, "বিএনপি সরকার গণতান্ত্রিক আচরণ করছে না।" ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে সংসদের ১১টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার কয়েকটি আসনের অনেক ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক গণ্ডগোল ও সন্ত্রাসী তৎপরতা সংঘটিত হয়। ঐদিন সকালে ঢাকার ভোট কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সেন্ট্রাল রোডস্থ ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার সময় কে বা কারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ঐ গুলির আঘাতে সে স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান এক রিক্সা চালক নিহত হন। তারপরও, সেখানে আরও কিছুক্ষণ গোলাগুলি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসদের ঐ উপ-নির্বাচনে ১১টি আসনের মধ্যে ৫টিতে বিএনপি, ৪টিতে জাতীয় পার্টি এবং ২টিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হন। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে বিএনপি-এর চেয়ারপারসন ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেয়ার শেষ পর্যায়ে রয়েছি।" ঐ দিনই আওয়ামী লীগ দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে ঢাকার ভোট কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনকালে সেন্ট্রাল রোডস্থ ভোট কেন্দ্রে প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দেয়। সে কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে বিচ্ছিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

১০৩। ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১)-তারিখে দেশে 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয় সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১)-এর ব্যাপারে জনগণের মতামত গ্রহণে। ঐ গণভোটে দেশের মোট ভোটারের মাত্র ৩৪.৯৩ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেন। তার মধ্যে সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১)-এর পক্ষে ভোট পড়ে ৮৪.৪২ ভাগ। ঐ গণভোটের ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বলবৎ হয়। তারপর, ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে বিএনপি-এর চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি ভবনে (বংগভবনে) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নতুন করে শপথ গ্রহণ করেন। একই অনুষ্ঠানে তাঁর ৪০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণও নতুন করে শপথ গ্রহণ করেন। ঐদিনই নির্বাচন কমিশন সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করে ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখ।

১০৪। রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ হিসেবে নির্ধারিত ছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১)। ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে বিএনপি-এর তৎকালীন সংসদ স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস সংসদের স্পীকার ও আসনে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধরীকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়াও, আওয়ামী লীগের আলহাজ্ব মকবুল হোসেনও রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হন। ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের জামাতে ইসলামী বাদে অন্য সব বিরোধী দল এক সভায় মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে। সভাশেষে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক সাংবাদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মেলনে বলেন, "সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী কোনও দলীয় প্রার্থী নন। তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।" ঐদিনই রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের মনোনয়ন বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ৩টি মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখ ছিল রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত। ঐদিন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী আলহাজ্ব মকবুল হোসেন তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ঐদিনই বিএনপি সরকার রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সংসদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধনী হিসেবে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। তার ফলে, রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে ভোট দানকালে সাংসদরা নিজ নিজ দলের জারি বা প্রদানকৃত হুইপ অর্থাৎ নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন, অন্যথায় সংসদ পদ হারাবেন।

১০৫। ১লা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১) এর সংশোধন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে তিনটি পৃথক রীট দাখিল করেন জামাতে ইসলামী বাদে সংসদের আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলোর কতিপয় নেতা। ঐদিনই জামাতে ইসলামী বাদে জাতীয় সংসদের অন্য সব বিরোধী দল এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ২রা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধন অধ্যাদেশটির বিরুদ্ধে পেশকৃত রীটগুলো শুনানীর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য হাইকোর্টের সে সময়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ সেগুলো সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বরাবরে পাঠায়। ইত্যবসরে, বিএনপি-এর মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার এক বিবৃতিতে বলেন, "রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধন অধ্যাদেশটি সংবিধান সম্মতভাবেই জারি করা হয়েছে।" ৩রা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে বিএনপি সরকার গণদাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধন অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করে।

১০৬। ৪ঠা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে দু'জন প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী পৃথক পৃথকভাবে (সে সময় পাকিস্তানী নাগরিক হয়েও জামাতে ইসলামীর কার্যত আমীর) গোলাম আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর দোয়া চান। একই দিনে সুপ্রীম কোর্টের আপীল. বিভাগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর আওতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রকাশ্যে ভোট দানের বিধিবিধানের বিরুদ্ধে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদসহ ৭ নেতার পেশকৃত রীট আবেদনের শুনানী শুরু হয়। ৫ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৬ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে শুনানী হয় সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হবে কিনা সে প্রশ্নে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদসহ ৭ নেতার পেশকৃত রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। একই দিনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তথাকথিত জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অপরদিকে, সরকারী দল বিএনপি-এর সংসদীয় দলের এক সভায় বিএনপি সংসদ সদস্যদের সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রকাশ্যে ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সে সময়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন নাকচ করে দেয়।

১০৭। ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে পূর্বনির্দিষ্টি সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদকক্ষে সাংসদের প্রকাশ্যে ভোট দান ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষিত হন। অপর প্রার্থী সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী পান মাত্র ৯২ ভোট। উক্ত নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর সাংসদরা ভোট দানে বিরত থাকেন। ৯ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে আবদুর রহমান বিশ্বাস সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ঐ শপথ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সাংসদরাসহ দল দুটোর কোনও নেতা উপস্থিত ছিলেন না। ১০ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে তৎকালীন অন্তর্বর্তী-কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি তাঁর পূর্বপদে অর্থাৎ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যান। ১২ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির প্রথম সংসদ অধিবেশনে সংসদের তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সর্বসম্মভাবে সংসদের নতুন স্পীকার নির্বাচিত হন। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের নতুন ডেপুটি স্পীকার হিসেবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন বিএনপি-এর সাংসদ হুমায়ুন খান পন্নী। ২৭শে অক্টোবর (১৯৯১) তারিখ বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে বিএনপি-এর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদল ও আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের মধ্যে। উক্ত ঘটনায় ছাত্রদলের দু'জন সশস্ত্র ছাত্র, ছাত্রলীগের একজন নিরস্ত্র ছাত্রনেতা এবং সেখানে কর্মরত একজন টোকাই বালক প্রাণ হারান। ঐ ঘটনার পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সব তৎপরতা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

১০৮। ৩০শে অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে একটি ঘটনা ঘটে যা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। উক্ত ঘটনাটি হলো "প্রজন্ম-১৯৭১"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামক একটি যুব সংগঠনের আত্মপ্রকাশ। দেশের অগণিত যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণী যাঁরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশর মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ছিলেন অবুঝ শিশু এবং যাদের জন্ম স্বাধীনতা উত্তরকালে গঠন করে উক্ত সংগঠন। তাঁদের অনেকেই ১৯৭১ সালে দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এবং তাঁদের দোসর-দালাল তথাকথিত শান্তি বাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আল শামস ইত্যাদি সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যদের হাতে নিহত শহীদ পরিবারের সন্তান। তাঁদের মনে অনেক জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন। মূলত, তাঁরা জানতে চান স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়-সৃষ্টির সঠিক পটভূমি, নেপথ্যকাহিনী তথা ইতিহাস। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী তথা আপামর জনসাধারণকে কেনই বা ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে। কিসের লক্ষ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের লাখো লাখো নরনারী আত্মাহুতি ও অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন ১৯৭১-এর মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ? সেই উপলব্ধি ও চেতনা কি একদিনে ঘটেছিল, না তার পেছনে ছিল সুদীর্ঘকালের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস কে বা কারা জনগণকে দিক নির্দেশনা প্রদান ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে সমস্ত আন্দোলন ও সংগ্রামে ? লাখো লাখো নরনারীর রক্তের ও জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের তরুণ সমাজের সেই সুদীর্ঘকালের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আন্দোলন ও সংগ্রামের সঠিক তথ্য ও ইতিহাস জানতে চাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। একই সঙ্গে শহীদ পরিবারের সন্তানরা চান সেই সমস্ত ব্যক্তির বিচার যারা সজ্ঞানে, ঠাণ্ডা মাথায় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে ১৯৭১ সালের নয় মাস মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী শাসক ও তার হানাদার সামরিক বাহিনীকে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছিল বাংলাদেশে গণহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, জনগণের বাড়িঘর-হাটবাজার-কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, সয়সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধ্বংস ইত্যাদি গর্হিত অপরাধমূলক ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে এবং যারা নিজেরাও সে জাতীয় জঘন্য কার্যকলাপ সংঘটিত করার জন্য দায়ী। প্রজন্ম-১৯৭১-এর সদস্যরা সেই সমস্ত গর্হিত অপরাধমূলক ও মানবতাবিরাধী কার্যকলাপের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইনানুগ বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও তা কার্যকর করা দেখতে চান।

১০৯। ৩রা নভেম্বর (১৯৯১) তারিখ সারা দেশ পালিত হয় আওয়ামী লীগের 'জেল হত্যা' প্রতিবাদ কর্মসূচি। ঐ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় আয়োজিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরাধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫) বাতিল করা নিয়ে টালবাহানা জাতি বরদাশত করবে না।" ৪ঠা নভেম্বর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন (অঃ) মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরুজ্জামানের বর্বরোচিত হত্যার ব্যাপারে আলোচনার সময় এক উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাংসদরা বলেন, "সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডরই আমরা নিন্দা করি।" ৮ই নভেম্বর (১৯৯১) তারিখে প্রয়াত কর্নেল (অবঃ) তাহেরের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে জাসদ (ইনু) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় কতিপয় বক্তা বলেন, "জিয়াউর রহমান কর্নেল (অব) তাহেরকে হত্যার মধ্য দিয়ে (১৯৭৫ সালের) ৭ই নভেম্বরের চেতনাকে ধ্বংস করেছেন।"

১১০। ২রা ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে সময়ে বাংলাদেশে সফররত পাকিস্তানের 'তেহরিক-ই-ইশতেকলাল' পার্টি প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আসগর খান তাঁর সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে বলেন, "শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের (সে সময়ের) আন্দোলন ছিল ন্যায্য।" ৫ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৬ই ডিসেম্বরের 'বিজয় দিবসে' সরকারী ও রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী সংকুচিত করে তার মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াসের ব্যাপারে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরী সভায় বলা হয়, "(জাতীয়) বিজয় দিবসের কর্মসূচী সংকুচিত করা (১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র।"

১১১। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে ৮ ও ৫ দলীয় দুই জোট ও বিএনপি ঢাকায় পৃথক পৃথকভাবে তিনটি জনসভার আয়োজন করে ১৯৯০ সালের ঐদিনে লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তাঁর সরকারের পতনের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে। সরকারী দল বিএনপি গুলিস্তানের সামনের রাস্তায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় এবং ৫ দলীয় জোট জিরো পয়েন্ট এলাকায় জনসভার আয়োজন করে। বিএনপি সরকারের নির্দেশে পুলিশ ৮ ও ৫ দলীয় জোট দুটোর জনসভায় বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপসহ গুলিবর্ষণ করে। উক্ত ঘটনায় শতাধিক লোক আহত ও ৪২ জন গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ ৮ ও ৫ দলীয় জোট দুটোর জনসভা পণ্ড হয়ে যায়। ঐদিনই ৮ দলীয় জোট বিএনপি সরকারের পুলিশ দিয়ে সেসব জনসভা ভেঙ্গে দেয়ার প্রতিবাদস্বরূপ ৮ই ডিসম্বর (১৯৯১) তারিখে সারাদেশে সকাল ৬টা থকে বিকেল ২টা পর্যন্ত ৮ ঘন্টা হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। ৮ দলীয় জোট ঘোষিত ঐ কর্মসূচী মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে সারা দেশে পালিত হয় ৮ ঘন্টাব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল।

১১২। ১০ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখ ঢাকায় দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দুটি পৃথক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলস্থ শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আহাদ চৌধুরী ও আব্দুল আজিজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ঐ জনসমাবেশে 'জয় বাংলা' শ্লোগান উচ্চারিত হয়। উক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাবেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচার দাবি করে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও সে সময়ে বাঙালীদের লুণ্ঠন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, বালকবৃদ্ধ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্য অপরাধমূলক তৎপরতার সংগঠকদের প্রধান নেতা গোলাম আযমের বিচার বিএনপি সরকার না করায় এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে জামাতে ইসলামী তার দলের আমীর (দল প্রধান) হিসেবে নির্বাচিত করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, জনগণের বাড়িঘর-কলকারখানায় বেপরোয়াভাবে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধমূলক ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে সক্রিয় সহায়তা ও সহযোগিতা এবং নিজেরাও সে জাতীয় জঘন্য কার্যকলাপ সংঘটিত করার জন্য দায়ী রাজাকার, আলবদর, আলশামস, সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রধান সংগঠক এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ সংগঠনের অন্যতম নেতা গোলাম আযমকে।

১১৩। ৯ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সড়ক দ্বীপ এলাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল একটি আলোচনা সভা। সে সভায় প্রধান অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। সভা চলাকালে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। তার কিছুক্ষণ পর সভাস্থলের অদূরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের সামনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল ও এসএম হল এলাকাগুলোয় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি চলে। তাছাড়াও, সার্জেন্ট জহরুল হক হল ও জগন্নাথ হল দুটোয় ১০/১২টি কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা নব্য স্বৈরাচারের তৎপরতা, শিক্ষাংগনসহ সবকিছুকে ক্ষমতাসীন বিএনপি-এর দলীয়করণ ও শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ছাত্র সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমরা শিক্ষাংগনে শান্তি চাই, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের মাধ্যমে জনগণের ভাত-কাপড়-শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে চাই।" উক্ত ভাষণে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করা হয়েছে জামাত-শিবিরের সংগে আঁতাত করে। একইভাবে ১৯৭১-এর গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের হোতা গোলাম আযমকে রাজনীতির অঙ্গনে নামানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। মানুষের পবিত্র আমানত, পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করে এসব করা হচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১৪। ১০ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় আয়োজিত এক জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "যে চক্রান্তের মাধ্যমে ছাত্রলীগ নেতা বাউফুল বসুনিয়া ও চুন্নুকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই একই চক্রান্তের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলকে ৯ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে হত্যা করা হয়েছে। এই (বিএনপি) সরকার (শিক্ষাঙ্গনে) সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত।" উক্ত ভাষণে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "আমি বার বার বলেছি, সরকার ইচ্ছে করলেই এক ঘন্টার মধ্যেই অস্ত্র উদ্ধার করতে পারে। আমি এখনও বিশ্বাস করি, অস্ত্রধারীরা কারও নয়। (বিএনপি) সরকার দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে। আজ দেশে আইন-শৃংখলা নেই। দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। (বিএনপি) যাদের সঙ্গে আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, আজ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সরকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র উদ্ধার না করে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। (বিএনপি) সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল প্রশ্নে টালবাহানা করছে। (বিএনপি) সরকার দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

১১৫। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) তারিখে শহীদ জননী বেগম জাহানারা ইমামকে আহ্বায়িকা ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য-সচিব করে গঠন করা হয় একটি ৪২ সদস্যবিশিষ্ট 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' (The National Coordination Committee for the implementation of the spirit of the Liberation War and annihilation of the Killers and Collaborators of 1971)। ঐ সমন্বয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবদুর রাজ্জাক, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)-এর সভাপতি কাজী আরেফ আহমদ, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী, বাসদ-এর আব্দুল্লাহ সরকার, আওয়ামী লীগের মির্জা সুলতান রাজা, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ডাঃ এস. এ. মালেক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান আবদুল আহাদ চৌধুরী, নাট্যশিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম, সাংবাদিক শাহারিয়ার কবির, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের গোলাম কুদ্দুছ প্রমুখ রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লোকজনের বাড়িঘর-দোকানপাট-কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধ্বংস ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধমূলক ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে সহায়তা ও সহযোগিতা এবং নিজেরাও সে জাতীয় জঘন্য কার্যকলাপ সংঘটিত করার জন্য দায়ি ব্যক্তিদের আইনানুগ বিচারের ব্যবস্থা করা। সে লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সমন্বয় কমিটি ঘোষণা দেয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উপরোল্লিখিত গর্হিত অপরাধমূলক ও মানবতাবিরাধী কার্যকলাপের প্রধান সংগঠক এবং স্বাধীনতাউত্তরকালে স্বাধীনতাবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্য-কলাপের অন্যতম নেতা গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে গণআদালতে বিচার অনুষ্ঠানের। ঢাকা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও মহল্লাসহ দেশের অন্যন্য শহর, বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জেও গঠন করা হয় উক্ত সমন্বয় কমিটির শাখা-প্রশাখা। পরবর্তীতে, উক্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়নে একটি ৮ সদস্যবিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। সেই স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা হলেন: (১) শহীদ জননী বেগম জাহানারা ইমাম, (২) অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, (৩) আবদুর রাজ্জাক, এমপি, (৪) কাজী আরেফ আহমদ, (৫) নূরুল ইসলাম নাহিদ, (৬) আব্দুল আহাদ চৌধুরী, (৭) সৈয়দ হাসান ইমাম ও (৮) শাহরিয়ার কবির।

১১৬। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) তারিখে বাংলা একাডেমী চত্বরে মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আয়োজিত 'বাংলাদেশের বিশ বছরঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা' শীর্ষক আলোচনা সভায় কতিপয় বক্তা বলেন, "বাংলাদেশের ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। অশুভ রাজনীতির শিকার হয়ে ১৯৭৫ সালের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত হয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বেতার-টিভি ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে অনুচ্চারিত রাখা হচ্ছে। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে জাতিকে সঠিক ইতিহাস থেকে দূরে রাখা যাবে না। ইতিহাস তার নিজস্ব সত্তায় একদিন গর্জে উঠবেই।" উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ১৯৭১-এর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী বলেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ (১৯৭১)-এর প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা প্রথমে চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম. এ. হান্নান পাঠ করে শোনান। পরবর্তীতে, একজন কলেজ শিক্ষক ঘোষণাটির বংগানুবাদ পাঠ করেন। অতঃপর, ২৭শে মার্চ (১৯৭১) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত একটি ঘোষণা পাঠ করেন। এগুলো ইতিহাসের অংশ। যাঁরা এ সমস্ত বিষয়ে বিকৃত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করেন, প্রকারান্তরে তাঁরা এসব বীর সন্তানদেরই অবমাননা করেন। জেনারেল জিয়ার অবিকৃত ঘোষণাটি এখনও বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে।"

১১৭। ৬ই মার্চ (১৯৯২) তারিখে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "১৫ই আগস্ট (১৯৭৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে (দেশে) স্বৈরাচারের বিষবৃক্ষ রোপিত হয় এবং ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ জারি করে ও তৎপরবর্তীকালে সংবিধান পঞ্চম সংশোধনী (১৯৭৯)-এর মাধ্যমে তাঁর খুনীদের অপকর্ম জায়েজ করা হয়। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সামরিক সরকারপ্রধান বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বাংলাদেশের বিদেশস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে চাকুরী দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবিরচক্রকে পুনর্বাসিত করেন। পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানে এমন জঘন্য কালাকানুন নেই। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলোর (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে) প্রকাশিত ঘোষণায় উক্ত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল করার কথা থাকলেও বর্তমান বিএনপি সরকার তা কার্যকর করছে না।" পরিশেষে, উক্ত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিলের সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "আমরা দেশে আইনের শাসন কায়েম করতে চাই।"

১১৮। ৭ই মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ (১৯৭১) উপলক্ষে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "৭ই মার্চ (১৯৭১) একদিনে আসেনি। বৃটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর পাকিস্তানীরা আঘাত করেছিল আমাদের ওপর, আমাদের জাতীয় সত্তার ওপর। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এ দিনটি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এদিন এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক মুক্তির তথা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে ঘাতকের নির্মম বুলেটে তাঁকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সে হত্যার বিচার আজও হয়নি। ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স দিয়ে তাঁর হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।" উক্ত ভাষণে বিএনপি সরকারের আচার-আচরণের তীব্র সমালোচনা করে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "দীর্ঘ পনের বছর ধরে আমরা সংগ্রাম করেছি। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বৈরাচারের পতন হলেও একই চেহারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এই (বিএনপি) সরকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। নামে মাত্র সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বৈরাচারের অবসান ঘটেনি।"

১১৯। ১৬ই মার্চ (১৯৯২) তারিখ সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) সড়কস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবন' প্রাংগণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রক্ত লালের' উদ্যোগে আয়োজিত 'হস্তাক্ষর প্রতিযাগিতা ও শিশু-কিশোর সমাবেশে' আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের (জাতীয়) চরিত্র নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে (জাতির) সঠিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।" তারপর, শেখ হাসিনা নব প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু, মুক্তি সংগ্রাম, (১৯৭১-এর) মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং জাতির গৌরবমণ্ডিত প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য দেশের সচেতন নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত সমাবেশে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "যার পুণ্যজনমে দেশ হয়েছে ধন্য, বাঙালীর গৌরবের হয়েছে চরম বিকাশ, আজ তাঁর ৭২তম জন্মবার্ষিকী। এই সংগ্রামী মহাপুরুষ সারা জীবন ভিনদেশী শাসকগোষ্ঠীর হাতে অসহনীয় জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করে, এমন কি দুইবার ফাঁসির কাষ্ঠে গিয়েও, আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনের দীর্ঘ চূড়ান্ত পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ (প্রথম প্রহরে) এই বাড়ি থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এই বাড়িতেই স্বাধীনতার শত্রু ঘাতকরা তাঁর জীবন কেড়ে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সমগ্র জাতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াই পরিচালনা করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে। এই গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতা অর্জনে ৩০ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে। দেশবাসী অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ ও সাহসী নেতৃত্ব আর বাংলার আপামর জনগণের সম্মিলিত সকল সংগ্রামের ফসল আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে ফিরে এসে শূন্য হাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত আর পোড়ামাটি বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্ব, আন্তরিকতা এবং বিজ্ঞানসম্মত ও পরিকল্পিত দেশ শাসনের ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ তথা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তখনি স্বাধীনতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকের দল তাঁকে সপরিবার হত্যা করে। মানবতার শত্রুদের কাছ থেকে শিশু-নারী-পুরুষ কেউই রেহাই পায়নি। জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স সংযোজন করে সেই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই আজ দেশ ও জাতির স্বার্থেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

১২০। ১৭ই মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবন' প্রাঙ্গণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "চারিদিকে আজ হতাশার ধ্বনি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, অরাজকতা, সব মিলে সারা দেশে এক অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। মানুষের আয় বাড়ছে না, অথচ সবকিছু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জনগণ চরম অর্থনৈতিক দৈন্যে নিপতিত। আইন-শৃংখলা বাহিনীকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। দলীয়করণ করে তাদেরকে দলীয় কাজে ব্যবহার করছে এই (বিএনপি) সরকার। . . . এই ক্রান্তিলগ্নে গণতন্ত্রের শুভ ফল জাতিকে দেয়ার জন্যে আমরা অর্থনৈতিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। সারা বিশ্বে আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক, সময়োপযোগী অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এ নিয়ে আলোচনা চলছে। ইনশাআল্লাহ, এ কর্মসূচী জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণে শুভ ফল আনবে।" উক্ত ভাষণের এক পর্যায়ে (বিএনপি) সরকারের আচার-আচরণের তীব্র সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করছি। জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে এটাই ছিল (১৯৯০-এর) আন্দোলনের প্রত্যাশা। কিন্তু (বিএনপি) সরকার তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকার অতীতের সরকারের পথ অনুসরণ করে চলছে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, এ সরকার এরশাদের জুতা পরে ও চশমা লাগিয়েই দেশ শাসন করছে।" বিস্ময়কর যে, জনগণের সার্বজনীন ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও অতীতের জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারগুলোর মতো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে বেতার-টিভি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম-গুলোকে কোন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী গ্রহণ করার অনুমতি দেয়নি।

১২১। ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ইফতার পার্টি উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। সেদিন ঘোষিত ঐ অর্থনৈতিক নীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন হিসেবে বলা হয়, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি খাতের অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ও স্থায়ীভাবে স্বপ্রণোদিত সমবায় প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করা হবে। প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও সামাজিক উপযোগিতার নিরিখে সরকারী ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকা নির্ণীত হবে। কাংক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ-সুবিধা যাতে সবাই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে এই বাজার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়ক ও সম্পূরক। (ব্যক্তি বা বেসরকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতে প্রতিষ্ঠিত) কোন আর্থিক সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না। রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান অদক্ষতা ও অনভিপ্রেত অলাভজনকতা দূর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রতিযোগী বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধারায় উৎপাদনশীলতার দ্বারা এগুলোকে লাভজনক করতে হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মসূচী এবং আওয়ামী লীগের ১৯৯১ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ও ভিন্নতা শুধু একটি বিষয়েই। তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সংসদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের প্রকাশিত ও প্রচারিত নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন হিসেবে বলা হয়েছে: "সাধারণভাবে কোন ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।" পক্ষান্তরে, ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত আওয়ামী লীগের তথাকথিত নতুন অর্থনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন হিসেবে বলা হয়েছে: "কোন আর্থিক সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।"

১২২। ২১শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে পার্টির সংসদীয় দলের নেতা লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে তাঁর শাসন আমলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার 'এটিপি' বিমান ক্রয় সম্পর্কিত একটি দুর্নীতির মামলার চার্জশীট আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। ঢাকা বিভাগীয় বিশেষ আদালতের জজ কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী উক্ত চার্জশীট অভিযুক্তদের পাঠ করে শোনান। লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত চার্জশীট পেশ করা হয়েছিল। অপর তিনজন অভিযুক্তরা ছিলেন সাবেক মন্ত্রী লেঃ কর্নেল (অবঃ) এইচ. এম. এ. গাফফার, জিয়াউদ্দিন আহম্মদ বাবলু এবং সাবেক শিল্প সচিব এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন। উক্ত অভিযোগে বলা হয় যে, ১৯৮৯ সালে মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে 'এটিপি' বিমান ক্রয় করে অভিযুক্তরা বাংলাদেশ সরকারের তথা রাষ্ট্রের ২০ কোটি ১৮ লক্ষ ৮ হাজার ২৬০ টাকা ক্ষতি সাধন করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেরা কিংবা অন্যকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের ঐ অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অধীনে উল্লিখিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করা হয়। উক্ত অভিযোগে আরও বলা হয় যে, ১৯৮৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও সাবেক শিল্প সচিব এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন বৃটিশ এরোস্পেস কোম্পানী পরিদর্শনকালে বর্ধিত মূল্যে 'এটিপি' বিমান ক্রয় করেন। উক্ত বিমান ক্রয়ে তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। সাবেক পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী লেঃ কর্নেল (অবঃ) এইচ. এম. এ. গাফফার বাংলাদেশ বিমানের আর্থিক লোকসান জানা সত্ত্বেও উক্ত বিমান ক্রয়ের চুক্তি অনুমোদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। সাবেক বেসামরিক বিমান চলাচল প্রতিমন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ বাবলু বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের দায়িত্বে থেকেও উক্ত 'এটিপি' বিমান ক্রয় বন্ধ করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

১২৩। ২৮শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা। উক্ত সভায় গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি আহমেদুল কবির তাঁর ভাষণে বলেন, "(১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফলশ্রুতি হচ্ছে গণতন্ত্র। তাই, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। . . . জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে সংসদীয় (মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার) গণতন্ত্র বিকল হতে বাধ্য। আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।" জনাব আহমেদুল কবির আরও বলেন, "বর্তমানে সময় এসেছে। এখন দেশের জনগণই বাধ্য করবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্র হতে এবং তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ করতে।" উক্ত আলোচনা সভায় গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ আফজাল তাঁর ভাষণে বলেন, "এবারের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ না করে। বিগত ষোল-সতের বছর ধরেই স্বাধীনতা দিবসে রেডিও-টেলিভিশনে তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) নামও উচ্চারিত হয় না। ১৯৭১ সালের প্রবাসী (বিপ্লবী) সরকারের নামও উচ্চারিত হয় না।" তারপর, মোহাম্মদ আফজাল অতীতের সরকারগুলো এবং বর্তমান বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মানুষ আবারও জেগে উঠেছে। আজকের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলোর সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের ওপর নির্ভর করবে দেশ কোন্ পথে যাবে।" উক্ত সভায় গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন, "১৯৭৫-এর পরের সংবিধানে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দ নেই। পরিবর্তে এসেছে স্বাধীনতা যুদ্ধ বা (War of Independence) শব্দগুলো। এই দুটো টার্ম-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে একটি ধারাবাহিকতা, যা আমরা অর্জন করেছিলাম ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে। War of Independence শব্দগুলো সংবিধানে জুড়ে দেয়ায় মনে হয় যে, কোন একজন সামরিক কর্মকর্তা হুইসেল বাজিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন।" . . . তারপর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন, "গণতন্ত্রের মূল শত্রু হচ্ছে মৌলবাদী শক্তি। মৌলবাদী শক্তি মানবতার শত্রু। বিশ্বব্যাপী এখন গণতন্ত্রের আওয়াজ উঠেছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে। আবার সময় এসেছে জাতীয় ঐক্যের অর্থাৎ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২৪। ১৪ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ বিকেলে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে নিহত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তান ও স্বাধীনতা উত্তরকালের তরুণ-তরুণীদের সমন্বয়ে গঠিত 'প্রজন্ম-১৯৭১' সংগঠনের ২৫ জন সদস্য পহেলা বৈশাখ দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঢাকার ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) সড়কস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এক শুভেচ্ছা সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। উক্ত সাক্ষাৎকারের প্রাক্কালে 'প্রজন্ম-১৯৭১' সংগঠনের সদস্যরা সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর, তাঁরা শেখ হাসিনার কাছে পেশ করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী এবং তাঁদের জীবনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি। ঐ সময় শহীদ নূরুল আলমের কন্যা 'মুক্তি' ফুলের তোড়া, শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার তাঁর লেখা বই 'মুক্তি' ও তাঁর কন্যা শমী কায়সারের লেখা বই 'আর কতদূর' এবং তাঁরা 'প্রজন্ম-১৯৭১' সংগঠনের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের ওপর একটি 'চিত্রকর্ম' শেখ হাসিনাকে উপহার দেন। উক্ত সাক্ষাৎকারের সময় আলাপের এক পর্যায়ে 'প্রজন্ম-১৯৭১' সংগঠনের সদস্যরা অভিযোগের সুরে বলেন, "সুকৌশলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে, যার ফলে, একটি বিকৃত প্রজন্ম সৃষ্টি হতে চলেছে। সেই অশুভ স্রোতধারার বিপরীতে আমরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যথোচিত অবদান রাখতে এবং ভূমিকা পালন করতে চাই। আমরা অবিলম্বে ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিলের দাবি জানাই।"

১২৫। ২২শে এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক-দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি' শহীদ জননী বেগম জাহানারা ইমামকে চেয়ারপারসন ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য-সচিব করে পূর্ব-গঠিত ৮ সদস্যবিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে গঠন করে একটি ১৮ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি। উক্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন বিশিষ্ট কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ আহমদ শরীফ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, প্রখ্যাত লেখক ও কথাশিল্পী শওকত ওসমান, স্থপতি মযহারুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কলিম শরাফী, ফয়েজ আহমদ, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, প্রবীণ এডভোকেট গাজীউল হক, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী ও মাওলানা আবদুল আউয়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২৬। ১১ই মে (১৯৯২) তারিখ সকাল সাড়ে দশটায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আলম-অসীম)-এর দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন। তাতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি শাহে আলম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে তার উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। উক্ত অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাসের পটভূমি উল্লেখ করে বলেন, "অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য শহীদদের তালিকায় ছাত্রলীগের নাম সর্বাগ্রে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, প্রতিটি (জাতীয়) আন্দোলনে, সংগ্রামে তারা সংগ্রামের ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছে।" . . . তারপর ছাত্রলীগকে আরও শক্তিশালী সুসংগঠিত করে তোলার জন্য সর্বস্তরের ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "আমি চাই, (কোন) ব্যক্তি বিশেষের নয়, ছাত্রলীগ জাতির তথা দেশের (জনগণের) জন্য কাজ করবে।"

১২৭। ১১ই মে (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের তাদের সংগঠনের মূলনীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য 'শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতি'র ধারণায় উজ্জীবিত হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে। প্রতিটি ছাত্র, তথা নেতাকর্মীকে সর্বপ্রথমে শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং শিক্ষাঙ্গনে যাতে শান্তি (ও শিক্ষার পরিবেশ) বজায় থাকে সেজন্যে সবাইকে (ঐক্যবদ্ধভাবে) কাজ করে যেতে হবে। তার সাথে প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" সে প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির জনক (বঙ্গবন্ধু)-কে হত্যা করে অবৈধভাবে (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া চলেছে এবং সে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা দখল করেছে, তারা সব সময় সচেতন ছাত্র সমাজকে ভয় করেছে। সে কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ছাত্র সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে সাম্প্রতিককালের গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজের প্রশংসনীয় ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী (এরশাদ) সরকারের পতন ঘটিয়ে আমরা গণতন্ত্র এনেছি। (অথচ এখন) আমরা দেখছি একটি নির্বাচিত সরকার রয়েছে, কিন্তু তারপরেও দেখি যে, স্বৈরাচারীর পতন ঘটলেও স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটেনি। স্বৈরাচার অব্যাহত রয়েছে। (দেশে) চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। (এখন) যাঁরা ক্ষমতাসীন, তাঁরা জানেন না, বোঝেন না, গণতন্ত্রের অনুশীলন কিভাবে করতে হয়। এখানে তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার অভাব রয়েছে। এঁদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহসহ সারা দেশের কোনও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার কোন (সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ) পরিবেশ নেই। (বাংলাদেশের প্রতিটি) শিক্ষাঙ্গন (এখন) এসব সন্ত্রাসীদের কবলে।"

১২৮। ১১ই মে (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণের আর এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দল আওয়ামী লীগের আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচী উল্লেখ করে বলেন, "আমরা সকলের ভাত, কাপড়, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশেষ করে, গরীবের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সমস্ত কর্মসূচী নিয়েছি। আমাদের (অর্থনৈতিক) কর্মসূচীর পরিবর্তন করা হয়েছে সে কথা সত্য, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা যে (অর্থনৈতিক) নীতিমালা দিয়েছি, তার মাধ্যমে ধনী-গরীবের (মধ্যে বিরাজিত) ব্যবধান আমরা ঘুচাতে চাই। স্বাধীনতার স্বাদ (জনগণের) ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে যে কর্মসূচী তিনি দিয়েছিলেন তা (এতোদিনে) বাস্তবায়িত হত। গরীব আর গরীব থাকত না। (দেশের) প্রতিটি মানুষ ন্যূনতম বাঁচার অধিকার ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা পেত। তিনি (বঙ্গবন্ধু) চেয়েছিলেন, ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে সুখী সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়তে। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে (বঙ্গবন্ধুকে) দেয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে (তাঁর) সেই ইচ্ছাকে তিরোহিত করা হয়েছে। (তাই) এখন সময়ের সাথে তাল রেখে আমরা পথ পরিবর্তন করেছি মাত্র, কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য এক (ও অভিন্ন)।" . . . পরিশেষে, বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, "এই (বিএনপি) সরকার অবৈধ অস্ত্রধারীদের মদদ দিয়ে সারা দেশে মাস্তানী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছে। আজকে যারা দেশে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে আছে, তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা হয় না। ১৯৭১-এর ঘাতক ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র, যারা (অতীতে) বিদেশে বসে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, আজ তারাই দেশে এসে বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। আজকে সেই ঘাতকচক্র ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন শহীদ রুমীর মা বেগম জাহানারা ইমামসহ মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করলেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে এ (বিএনপি) সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করল। (পক্ষান্তরে), যারা অস্ত্র নিয়ে (দেশের) স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, সরকারী (বিএনপি) দল তাদেরকে মদদ দেয়। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে ঘৃণার আর কী আছে!"

১২৯। ইতিমধ্যে, জামাতে ইসলামী ও বঙ্গবন্ধুর হত্যার নায়ক কর্নেল (অবঃ) ফারুকের ফ্যাসিস্ট ফ্রিডম পার্টি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক-দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি' (সংক্ষেপে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি)-এর গণতান্ত্রিক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টির আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য যৌথভাবে গঠন করে এক ফ্যাসিস্ট সশস্ত্র 'যুব কমান্ড' বাহিনী। ঐ 'যুব কমান্ড' বাহিনীর সদস্যরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে 'ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'র শান্তিপূর্ণ সভা, সমাবেশ ও মিছিলে সহিংস ও সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকে। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিএনপি সরকার 'যুব কমাণ্ডের' সে সমস্ত সশস্ত্র, সহিংস, বর্বরোচিত তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দৃশ্যত নির্লিপ্ত ও নির্বাক থাকে। ফলে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও 'যুব কমান্ডের' সেসব আইন লংঘনীয় সহিংস ও বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে, দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং তা অব্যাহত থাকে।

১৩০। ১৮ই জুন (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট অধিবেশন শুরু হয় এবং ঐ দিনেই অর্থমন্ত্রী সংসদে সরকারের বাজেট পেশ করেন। কিন্তু একমাত্র জামাতে ইসলামী ব্যতীত দু'জন স্বতন্ত্র সদস্যসহ সংসদের অন্যান্য বিরোধী দলগুলো তাদের ১৭ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংসদ অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এপ্রিল (১৯৯২) মাসে সংসদের স্বল্পকালীন অধিবেশনের শেষের দিকে ১৭ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে সংসদ থেকে একযোগে ওয়াকআউট করার পর দু'জন স্বতন্ত্র সদস্য ও আওয়ামী লীগসহ সেসব বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ৪ দফা দাবি ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়ঃ (১) দেশের প্রচলিত আইন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন (ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩) অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার করতে হবে; (২) (গোলাম আযমের গণবিচারের জন্য গঠিত) গণআদালতের উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ২৪ জন দেশবরেণ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে (বিএনপি সরকার কর্তৃক) দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে; (৩) রাজনৈতিক মত পার্থক্য নির্বিশেষে প্রতিটি দলের সভা-সমাবেশসহ গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং (৪) (জাতীয় সংসদে) বিরোধী দলীয় (নেতা) নেত্রীর মাইক কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না এবং সকল সংসদ সদস্যের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় সংসদের দু'জন স্বতন্ত্র সদস্য ও আওয়ামী লীগসহ সেসব বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের উক্ত ঘোষণায় এও বলা হয়েছিল যে, (বিএনপি) সরকার তাদের ঐ ৪দফা দাবি না মানা এবং বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তাঁরা সংসদ অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখবেন।

১৩১। ইতিপূর্বে, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীসহ দেশের অনেক আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রের নায়ক হন্তারক খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক জারিকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে ও জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের প্রতি বহুবার আবেদন জানিয়েছিলেন। একই লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে পেশকৃত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল বিল সংসদে পাস করানোর জন্য বহু আহ্বানও জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মহল। বিএনপি সরকারের আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় বিশেষ কমিটি উল্লিখিত ঐ বিলটির ব্যাপারে বিভিন্ন আইনগত ও সাংবিধানিক বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ইতিপূর্বে ৭০ দিন করে ৪ দফা সময় বাড়িয়ে নেয়। ঐ সময়পর্বে উল্লিখিত উক্ত কমিটির বহু সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় বিশেষ কমিটির উক্ত বিলটির ব্যাপারে রিপোর্ট প্রদানের জন্য চতুর্থবারের বর্ধিত সময়সীমার শেষ তারিখ ছিল ২৫শে জুন (১৯৯২)। ঐদিন জাতীয় সংসদে সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫) বাতিল বিলটির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার জন্য আরও সময় প্রয়োজন সে মর্মে আবেদন জানালে সংসদ স্পীকার বিশেষ কমিটিকে তাঁর রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা আরও ৭০ দিন বাড়িয়ে দেন। তার ফলে, ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫) বাতিল বিলটি জাতীয় সংসদে পাসের ভবিষ্যৎ শুধু অনিশ্চিতই হয়নি, সে ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মহল ও জনমনে সৃষ্টি হয় দারুণ সন্দেহ ও নানান জল্পনা-কল্পনা।

১৩২। ২৯শে জুন (১৯৯২) তারিখ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের দু'জন স্বতন্ত্র সদস্যসহ প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দলের সাংসদগণ সংসদের বাজেট অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখেন। ঐ সময় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র দলের সংসদে অনুপস্থিতিতে কেবল সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সংসদে বাজেট পাস করানো আইনসম্মত হলেও তা নৈতিকতা ও ন্যায়সম্মত হবে না সেই মর্মে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করা হয়। তারই প্রেক্ষাপটে এবং জাতীয় সংসদে উদ্ভূত অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের সপক্ষের অন্যান্য ক্ষুদ্র দলের পূর্ব-ঘোষিত ৪দফা দাবির ব্যাপারে একটি সমঝোতায় আসার প্রয়াস চালানো হয়। অবশেষে, ২৯শে জুন (১৯৯২) তারিখ সোমবার দিবাগত রাত ২টা ৩০ মিনিটে সরকার ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি যৌথ সমঝোতা ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। ঐ যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন বিএনপি সরকারের পক্ষে সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে দলের সংসদ উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ ও চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম।

১৩৩। ৩০শে জুন (১৯৯২) তারিখের প্রথম প্রহরে সরকারী দল বিএনপি ও সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐ যৌথ ঘোষণায় বলা হয়ঃ "যেহেতু (বাংলাদেশের) গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই বাংলাদেশ এবং নয় বছরের সুদীর্ঘ যৌথ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মূল্যে স্বৈরাচার উৎখাতের পর গণতন্ত্র অর্জিত হয়েছে; এবং যেহেতু এ দেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সার্বভৌম সংসদ নির্বাচিত করেছে; এবং যেহেতু জনগণ পূর্ণ আস্থা রেখেছে যে, এই সংসদের প্রতিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ জনগণের ইচ্ছা ও আকাংক্ষার বাস্তবায়ন করবেন, জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণসহ দেশের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আন্তরিক অবদান রাখবেন; এবং যেহেতু সংসদে বাদ-প্রতিবাদ, সাময়িক (সংসদ) বর্জন ইত্যাদি যেমন সংসদীয় রীতিসিদ্ধ, তেমনি সকল সংসদ সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও সংহতিকরণে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন এবং যা জনগণের একান্ত প্রত্যাশা; এবং যেহেতু মূলত গোলাম আযম প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের (সংসদ) সদস্যবৃন্দ সংসদের চলতি অধিবেশনে আজ পর্যন্ত যোগদান করেননি; এবং যেহেতু সংসদের কার্যকারিতা সরকারী দল ও বিরোধী দলের সহযোগিতা ও সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল; এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সর্বতোভাবে সফল করার জন্য এই সহযোগিতা ও সমঝোতা একান্তই অপরিহার্য, সেহেতু ঃ (১) সংসদে গোলাম আযম সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রস্তাবের আলোকে দেশের সংবিধানসম্মত প্রচলিত আইন অনুযায়ী গোলাম আযমের বিচার করা হবে। সরকার গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ইতিপূর্বেই তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করেন। (২) একই লক্ষ্যে গণআদালত সংক্রান্ত ২৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা হবে। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের আইনজীবিগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৩) একই সাথে সংসদের ভেতরে ও বাইরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সকল সংসদ সদস্য ও দলের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।"

১৩৪। ৯ই জুলাই (১৯৯২) তারিখে ঢাকার মন্ত্রীপাড়ার ২৯ নম্বর মিন্টো রোডস্থ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাষ্ট্রীয় বাসভবনে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রিত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিলের প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার অযথা কালক্ষেপণ করায় গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয়, "তিন জোটের ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী হত্যা, ক্যু ও সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিএনপি সরকারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই, এ সভা মনে করে যে, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চিরঅবসান, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং স্বাধীন জাতি হিসাবে মর্যাদা রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কুখ্যাত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল করার দাবি জনগণের দাবি।" পরিশেষে, উপরোক্ত সভায় জনগণের দীর্ঘদিনের উল্লিখিত কাঙ্খিত দাবি বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৫ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখে জাতীয় শোক দিবসে দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। ৯ই জুলাই (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত ঐ কর্মসূচীকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঐ দিনের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে উল্লিখিত গণদাবিসমূহ আদায়ের জন্য দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে দম্ভোক্তি করা হয়।

১৩৫। ইতিপূর্বে, জাতীয় সংসদে বৃহত্তম বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সংসদে অপর অন্যতম বিরোধী দল জাতীয় পার্টি যৌথভাবে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে, তার সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে। ঐ দিন উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের প্রশ্নে জাতীয় সংসদে সরকারী দল বিএনপি'র এবং আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সাংসদদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা সংঘটিত হয়। বিএনপি মন্ত্রীসহ সাংসদরা বিরোধী দল দুটোর অনাস্থা প্রস্তাব সংসদের কার্যপ্রণালীর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী সংসদে আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য নয় সে কথা বলে সংসদ স্পীকারকে উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দাবি ও অনুরোধ জানান। এক পর্যায়ে, সংসদ স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীও ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব পেশে কিছু ক্রটি ছিল বলে মন্তব্য করেন। যা হোক, পরিশেষে সংসদ স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর সংসদে আলোচনার অনুমতি দেন।

১৩৬। বেশ কয়েকদিন ধরে সংসদে চলে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে গৃহীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক। উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে জাতীয় সংসদের বৃহত্তম বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে, সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে তথ্য ও উদ্ধৃতিসহ অনেক অভিযোগ বর্ণনা করে ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখে সুদীর্ঘ সোয়া ঘন্টা ধরে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের গোড়ার দিকে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদ স্পীকারকে সম্বোধন করে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে যে, আমরা প্রথম যখন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার বিল পেশ করি, তখন আমাদের সামনে যাঁরা বসে আছেন, আজকের (বিএনপি) সরকারী দল তার বিরোধিতা করেছিলেন।কিন্তু একটি পর্যায়ে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন অথবা হিসেব কষেছিলেন অথবা অংক কষেছিলেন (যে), ঠিক এই পদ্ধতিতে এলে পরে ক্ষমতার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়িত হবে। তাই (সে সময়) তাঁরাও আমাদের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন এবং ৬ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে এই সংসদে আমরা Parliamentary System অর্থাৎ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এনেছিলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলাম, মাননীয় স্পীকার! কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে (খালেদা জিয়ার) সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, দলীয়করণ এবং সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সরকারকে সহযোগিতা করতে গিয়ে যেন জনগণের কাছে আমরা আমাদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। জনগণ (এখন) আমাদেরকেও দোষারোপ করতে শুরু করেছে। মাননীয় স্পীকার, বিরোধী দল হিসেবে আমাদের স্থান জনগণের কাছে, আমাদের রাজনীতি জনগণের জন্য। আমি বারবার বলেছি (যে), আমাদের রাজনীতি ক্ষমতামুখী নয়, জনতামুখী। কাজেই জনগণ যখন আস্থাহীনতায় ভুগছে, জনগণ যখন (বিএনপি) সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে, তখন তারই প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এই সংসদে আমাদের পক্ষ থেকে সাত-স্যাতজন সদস্য আজ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন।"

১৩৭। অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত ঐ ভাষণে তিনি আরও বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে যদি প্রশ্ন করি (যে), এই ডিফেকটিভ বিল আনার অভ্যাসও আছে, যেমন সরকারের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে হয়েছে তেমনি ডিফেকটিভ প্রস্তাবও আপনারা গ্রহণ করলেন। আজকের যে অনাস্থা প্রস্তাব আপনারা ডিফেকটিভ হিসেবে বর্ণনা করলেন আবার তা উত্থাপন করতে দিলেন, তাহলে আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রশ্নঃ আপনারা কি ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন না? এটা (সংসদ সদস্য) মেনন সাহেব অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন। এটাও কি এক ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার নয়? তবুও, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই (এ কারণে যে), আপনি (অনাস্থা প্রস্তাব) গ্রহণ করেছেন, (তার ওপর) আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন। আসুন আমরা দেখি, এতে কি আছেঃ এই অনাস্থা প্রস্তাবে আজকে জনগণের যে আহাজারী, সেই আহাজারীই কিন্তু এই অনাস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ, আজকে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, আমরা চেষ্টা করেছি, বারবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করেছি—যখন আমরা সংসদীয় পদ্ধতি (সংক্রান্ত বিল) আনি তখনও চেষ্টা করেছি—সরকার সঠিকভাবে চলুক। জনগণের মনের আশা পূর্ণ করুক। আমরা যখন সংসদীয় পদ্ধতি (সংক্রান্ত বিল) নিয়ে এলাম, আমরা বিরোধী দল থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং আমাদের আশা ছিল যে, সংসদীয় পদ্ধতির রীতিনীতি অনুযায়ী এই (বিএনপি) সরকার চলবে এবং এই সংসদ চলবে। (বিএনপি) সরকার কিন্তু প্রথমে রাজি হয়নি, মাননীয় স্পীকার, কোন মতেই রাজী হয়নি।"

১৩৮। শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার অন্যতম কারণ হিসেবে 'জানমালের নিরাপত্তাহীনতাবোধ, ৪/৭/৯২ তারিখে দৈনিক দিনকালে "৪ মাসে ৪৬৬০ জন আত্মহত্যা করেছে" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ, ৬/৭/৯২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে "রাতের বাহিনীর তৎপরতা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ, ৬/৭/৯২ তারিখে দৈনিক আজকের কাগজে "সাড়ে তিন কোটি মানুষ গৃহহীন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ, ২০/৭/৯২ তারিখে দৈনিক লাল সবুজ পত্রিকায় "ঢাকায় মাফিয়া চক্রের রাজত্ব" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ, ৩১/৭/৯২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে "অভিভাবক মহলে আতংক" শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদ, ১২/৮/৯২ তারিখে ঢাকার 'স্কলাসটিকা' স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত বেনামী চিঠিতে "তিন লক্ষ টাকা না দিলে ছাত্রদের কিডন্যাপ করা হবে" মর্মে হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করেন। তারপর, শেখ হাসিনা বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে দেখুন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে কি-না? আজ বিকেলেরই একটা ঘটনা। 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে 'শোক দিবস পালন কমিটি' আয়োজিত একটি মিছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে 'বঙ্গবন্ধু ভবন' অভিমুখে যাত্রা করেছিল। কিন্তু মিছিলটি এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে যাবার সময় সেখানে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) জিয়া হল থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়, গুলি ছোঁড়া হয়, বোমাবাজি করা হয় এবং মিছিলকারীদেরকে, বহু মানুষকে আহত করা হয। পুলিশ সেখানে নীরব ভূমিকা পালন করে। সন্ত্রাসী, যারা (জিয়া) হল থেকে গুলি করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ উল্টো মিছিলকারীদের ওপরই টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এর থেকে লজ্জা ও দুঃখের আর কী থাকতে পারে? মাননীয় স্পীকার, আজকে জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার যে কি দারুণভাবে ব্যর্থ, তার বহু চিত্র (উদাহরণ) আজ আমাদের কাছে রয়েছে। . . . মাননীয় স্পীকার, নিরাপত্তা-হীনতায় শুধু যে দেশবাসী ভুগছে তা নয়, আজকে আমাদের সংসদের আইনমন্ত্রী, আইনের রক্ষক, তিনি কি বলছেন আমরা একটু দেখি। ৩১/৭/৯২ দৈনিক আজকের কাগজে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ বলেছেন, 'আপনি সাংবাদিক, আপনার যেমন জীবনের নিরাপত্তার অভাব, আমি মন্ত্রী, আমারও'।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৯। শেখ হাসিনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে ১৬/৪/৯২ তারিখে দৈনিক খবরে "ছাত্রাবাসে আটক করে তরুণীকে বলাৎকার" শিরোনামে পরিবেশিত খবর, ৮/৭/৯২ তারিখে দৈনিক সংবাদে "একজন নারীর বদলে ৬টি গরু" শিরোনামে পরিবেশিত খবর, ১১/৮/৯২ তারিখে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় "যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে ৭০০ গৃহবধু তালাকপ্রাপ্ত" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদাদির উদ্ধৃতি দেন। তারপর, শেখ হাসিনা বলেন, "শুধুমাত্র চোরাকারবারীরা" একটি নারীর বদলে একটি গরুই নয়, মাননীয় স্পীকার, আজকে নারী পাচার, শিশু পাচার যেভাবে হচ্ছে, তার যে করুণ চিত্র আমরা পাচ্ছি, তার বহু ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে। বাংলাদেশের শিশুদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে। সেখানে ক্যামেল রেইসে সেইসব শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। বহু শিশু আজ ইন্ডিয়ার বোম্বাইতে। তাদের ধরে সেখানে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে বারবার খবর দেয়া হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর কাছে চিঠি এসেছে। তারপরেও, সেই শিশুদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয়নি। আপনি যদি ডকুমেন্টস চান, আমার কাছে আছে। সেই ডকুমেন্টস আছে, আমি আপনাকে দেব।" ৩১/৭/৯২ তারিখে ইংরেজী Front Line পত্রিকায় 'Children for Export' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যপ্রাচ্যে উট-দৌড় খেলায় ব্যবহার সংক্রান্ত সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "এই কাগজ আমি আপনার কাছে দেব। কারণ এখানে বহু শিশু, ৩ বছর থেকে তার ঊর্ধ্বে॥ তাদের উটের পিঠে বাংলাদেশের শিশুদের বেঁধে দেয়া হয়। শিশুরা আতংকে চিৎকার করে আর সেই চিৎকার শুনে উট ঊর্ধ্বগতিতে ছোটে। আমাদের দেশের শিশুকে এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জানতে চাই সরকারের কাছে, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্পীকার, এর জন্য কি ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছেন?"

১৪০। শেখ হাসিনা অনাস্থা প্রস্তাবে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অতি ব্যাপক বৃদ্ধির অভিযোগ বর্ণনা করে তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, গরুর বদলে নারী—এটা আমি এ সংসদে আগেই বলেছি। এর আর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না। শুধুমাত্র এই নয়, আজকে সন্ত্রাসের আরও চিত্র ঃ ইসলামী ছাত্র শিবিরের হামলার ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর ১লা জুলাই (১৯৯২) তারিখে খোলায় ক্লাস শুরু হলে সেদিনই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে দু'গ্রুপ গুলি বিনিময় করে এবং কয়েকজন মারাত্মক আহত হয়। (ঢাকার) সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পিতাকে দেখতে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতা জরীফ ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। পবিত্র ঈদুল আযহার পূর্বের রাতে বিএনপি-এর সশস্ত্র খুনীচক্র বাড়িতে হামলা চালিয়ে নৃশংসভাবে ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদক আজিজুল ইসলাম রাজুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। গত ১১ই জুলাই (১৯৯২) তারিখে ঈশ্বরদীর দাশুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সরদার আবদুর রবকে নিজ বাসভবনে বিএনপি-এর সশস্ত্র খুনীরা গুলি করে হত্যা করে। আসামীরা প্রকাশ্য দিবালোকে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিরাজগঞ্জ সরকারী মনসুর আলী কলেজের ছাত্র সংসদের জিএস নজরুল ইসলাম বকুলের হাত প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা কেটে ফেলে। ঈশ্বরদী থানার ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল বাশারের চোখ ছাত্রদলের গুণ্ডারা তুলে ফেলে। চট্টগ্রাম হালিশহর ছাত্রলীগ কর্মী বাদলকে ছাত্রদলের খুনীরা গুলি করে হত্যা করে।"

১৪১। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে দেশের সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ও তৎপরতার অব্যাহত অতি দ্রুত বৃদ্ধির অভিযোগ বর্ণনাকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, "৪ঠা জুলাই (১৯৯২) বিএনপি খুনীচক্র হত্যা করে আদমজীনগর ছাত্রলীগ নেতা সেলিমকে। ২০শে জুন (১৯৯২) কমলগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের হাতের আঙ্গুল কেটে নেয় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। ২৭শে জুন (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদ সদস্য জননেতা আবদুর রাজ্জাকের গ্রামের বাড়ীতে হামলা চালানো হয়। দিনাজপুরে ছাত্রলীগ নেতা অজয়কে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ছাত্রদলের খুনীচক্র। এছাড়াও, এর আগে কবে কত তারিখে কতজনকে হত্যা করা হয়, তাঁর একটা কপিও আপনাকে আমাদের (দলের) জেনারেল সেক্রেটারী দিয়েছেন। আজকে শুধু হত্যা নয়, ছিনতাই হচ্ছে। এই সংসদের ৩৩০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অন্তত ১০ জন সংসদ সদস্যের হয়তো নিজের অথবা তাঁদের স্ত্রী-কন্যার স্বর্ণ-অলংকার ছিনতাইয়ের ঘটনা আপনি অবহিত আছেন। পাশাপাশি, মন্ত্রীর গাড়ী হাইজ্যাক, ত্রাণমন্ত্রীর গাড়ী হাইজ্যাকের ঘটনা আপনি অবহিত আছেন। অনেক গাড়ী হাইজ্যাকের ঘটনা আপনি জানেন। মাননীয় স্পীকার, এত বড় লিস্ট আর পড়তে চাই না। বেশী দূর যেতে হবে না। এই সংসদে উপস্থিত আছেন, আমি আপনার সামনে তাঁকে হাজির করছি। নেত্রকোনার পূর্বধলা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোশাররফ সাহেব। আজকে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখুন। তিনি যখন মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন—তাও আবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে—তাঁকে এই বিএনপি-র গুণ্ডারা হামলা করে। কয়েকদিন আগে তাঁর অপারেশন হয়েছে। আপনি দেখতে পারেন—তাঁর জিহ্বা, কপাল, মুখে গুলি লেগেছিল, সেগুলো বের করা হয়েছে। বেশী দূরে যাবার দরকার নেই, বিএনপি-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসের নমুনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।"

১৪২। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে উত্থাপিত দেশে অব্যাহতভাবে অন্যান্য সমাজবিরোধী, সহিংস সন্ত্রাসী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেআইনী কার্যকলাপের দ্রুত বৃদ্ধির আরও উদাহরণ দিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে আরও বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে শিশুদের কথা বলেছি। এবার নারীদের কথা। আমি বলি যে, আমার দেশের মা-বোনেরা আজ কোথায় আছে? এদেশের নারীদের পাচার করা হচ্ছে। এই যে আমার কাছে একটি বই, "The Flesh Trade", এই বইতে বলা হয়েছে, মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশের দু'লক্ষ মহিলা বিক্রি হয়ে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। তার মানে, আমার বাংলাদেশের মা-বোনেরা আজ পাকিস্তানের পতিতালয়ে স্থান পাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা অতীতে ঘটেছে কিনা জানি না, কিন্তু বর্তমানে অনেক এ জাতীয় ঘটনা ঘটছে। আমরা আপনার মাধ্যমে (বিএনপি) সরকারের কাছে এর জবাব চাই। মাননীয় স্পীকার, একটি ছবি, বিএনপি-এর পতাকা, হাতে অস্ত্র নিয়ে—মনে হচ্ছে কোন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। ছাত্রদল ছাত্রাবাস দখল করছে। পতাকা নিয়ে, অস্ত্র হাতে নিয়ে (ছাত্রদলের হাতে), পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্মম ও বর্বরোচিত নির্যাতনে ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয় মানিক নৃশংসভাবে। মাদারীপুর-শরীয়তপুরে বিএনপি আজকে 'সর্বহারা পার্টি'কে মদদ দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে, জিম্মি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করছে। যখন এর আগে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, (তখনও) এ ঘটনা ঘটেছিল। বিএনপি যখন ক্ষমতাচ্যুত ছিল, সেখানে সর্বহারাদের দৌরাত্ম্য কমেছিল। আজকে আবার যখন বিএনপি ক্ষমতায় গেছে, সেখানে এখন আবার সেই 'সর্বহারা পার্টি'কে মদদ দিচ্ছে (এই বিএনপি) সরকার এবং আবার মানুষ জানমাল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।"

১৪৩। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অনাস্থা প্রস্তাবে উল্লিখিত রাষ্ট্রের ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের দলীয়করণ কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে (সরকারের) দলীয়করণ কি পর্যায়ে গেছে? আর একটা কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল, এই সংসদে প্রশ্নোত্তরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ ডিটেনশনে রয়েছে। বিএনপি সরকার বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন চালিয়ে, জেলে পুরে ডিটেনশন দিয়ে আজকে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করতে চায়। আর সব জায়গা তারা দখল করতে চায়। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত ছাত্র সংগঠন (ঐ শিক্ষায়তনের ছাত্র সংসদ) নির্বাচন বর্জন করেছে। কারণ সেখানেও দলীয়করণ চলছে, সেখানেও সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে। আজকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা (ছাত্রলীগ) দল থেকে যাদের বহিষ্কার করেছি, তারা মদদ পায় পুলিশের, সরকারের। পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে তারা হলে ঢোকে, (এই বিএনপি) সরকার তাদের মদদ যোগায়। এর চেয়ে লজ্জা আর কী থাকতে পারে? (এবার) আসুন বাস টার্মিনালের (বিষয়ে)। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের ১১-দফা দাবির ভিত্তিতে গত ২২শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুন (১৯৯২) দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল হয়। এই হরতাল চলাকালীন বিএনপি সরকারের যে 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি', সে নীতি অবলম্বন করে ২৪শে জুন (১৯৯২) ফুলবাড়িয়ার (বাস) টার্মিনাল দখল করে অস্ত্রধারীদের নিয়ে। পুলিশ তাদের পাহারা দেয়। ২৭শে জুন (১৯৯২) গাবতলী বাস টার্মিনাল বিএনপি-এর অস্ত্রধারীরা দখল করে পুলিশের পাহারায়। ৩০শে জুন (১৯৯২) মহাখালী বাস টার্মিনাল দখল করে অস্ত্রধারীরা পুলিশের প্রহরায়। ৩১শে জুন (১৯৯২) দয়াগঞ্জ ট্রাক টার্মিনাল বিএনপি দখল করে। এখানে পুলিশ, বিডিআর—তাদের ছত্রচ্ছায়ায় বিএনপি-এর গুণ্ডাবাহিনী দখল করে রাখে। সেখানে যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাদের নামও রয়েছে। সেখানে ফরিদপুর, খুলনা বাস টার্মিনালসহ সমস্ত জায়গায়—আদমজীনগর, ঢাকা বাজুতে মধ্যরাতে সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা করে হাজার হাজার শ্রমিককে বের করে দিয়ে জায়গা দখল করা হচ্ছে। খুন করা হয় আদমজী মিলস-এ, (তা) আপনি জানেন। আজকে জনগণের জানমালের নিরপত্তার অভাব, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য, ব্যবসায়ী খুন, সরকারের দলীয়করণ। এই দলীয়করণ ও ট্রেড ইউনিয়ন হাইজ্যাক, (বাস) টার্মিনাল ও শিল্পাঞ্চল দখল এবং সাংবাদিকদেরও ওপর আঘাত এসেছে, সে ঘটনা সকলেই অবহিত। এ ধরনের ঘটনার অতীতে কোন নজির নেই। বহু বক্তা (এ ব্যাপারে) বলে গেছেন। (তাই) আমি আর বাড়াতে চাই না।"

১৪৪। শেখ হাসিনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রশ্নে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা বারবার বলেছি (যে), আমার কাছে ডকুমেন্টস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কবে এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি জানি, আপনি এদিক-ওদিক চাইছেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনি অস্থির। কিন্তু তারপরেও আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অশান্ত অবস্থা। আমরা বারবার বলেছি (যে), এই অশান্ত অবস্থার সমাধান করতে হবে এবং এখানে যাতে করে আর কোন জানমালের ক্ষতি না হয়। কারণ, আমরা জানি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিকে পুলিশ মারা যাচ্ছে, সেনাবাহিনী মারা যাচ্ছে, সেখানে যারা সেটলার বা অপাহাড়ী (তারা) মারা যাচ্ছে। পাহাড়ীরাও মারা যাচ্ছে। আমরা চেয়েছি সেখানে রাজনৈতিক সমাধান। আজকে যখন 'শান্তি বাহিনী' তাদের অস্ত্র সংবরণ করেছে, আমি দাবি করছি (যে), সব দল মিলে একটা সংসদীয় কমিটি গঠন করে এই সমস্যার সমাধান করা হোক। কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে (যে), বিএনপি সরকার (সে ব্যাপারেও) দলীয়করণে বিশ্বাসী। তাঁরা (বিএনপি সরকার) এ সমস্যার সমাধান করতে চান না। কেন চান না, সেখানে কোন রহস্য নিহিত আছে। সে রহস্যটা কি? কি উদ্দেশ্য আছে সে প্রশ্নটা আমার রয়ে গেলো। আজ আমার কাছে বহু রিপোর্ট রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রিপোর্ট। সময় নেই বলে কোট করতে পারছি না। আপনি যদি চান, এর কপি আপনাকে পাঠাতে পারি। সেখানে দেখবেন (যে), সেখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) কি অবস্থা বিরাজ করছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৫। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে রোহিঙ্গা সমস্যা প্রশ্নে শেখ হাসিনা বলেন, 'মাননীয় স্পীকার, আজকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপার এসেছে। এই রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প খুলে দেশের ভেতর কারা এনেছে? আমি যদি বলি (যে), (বিএনপি) সরকারই তাদের উৎসাহিত করেছে এদেশে প্রবেশ করতে। তার কারণ কি ছিলো? এর উদ্দেশ্য দুটি হতে পারে। সরকার যখন দেশের ভেতর রাষ্ট্র পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে, রোহিঙ্গাদের নিয়ে এনে সেখানে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে, এই সমস্যা দেখিয়ে হয়তো একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। আরেকটি হতে পারে, রোহিঙ্গাদের দেখিয়ে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ, রিলিফ সামগ্রী এনে তা আত্মসাৎ করা। যেমন করা হয়েছে (১৯৯১ সালের) ২৯শে এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের পর, সেখানে ১০% ভাগও পুনর্বাসন কাজ হয়নি। যদি (মার্কিন) আমেরিকান টাস্ক ফোর্স এসে সেখানে কাজ না করতো, তাহলে সেখানে যে করুণ চিত্র হতো তা বর্ণনা করা যায় না। ঘূর্ণিঝড়ের পর দেখা গেছে মানুষ ও গরুসহ জীবজন্তুর লাশ একই সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কোন দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হয়নি। মানুষের লাশ কংকাল হয়ে গেছে, (তা) আমি নিজে সেখানে দেখে এসেছি।"

১৪৬। শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে আরও বলেন, "আজকে রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে, তিনি silent diplomacy দিয়ে সমাধান করবেন। যে আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন তা আজ পাহাড়প্রমাণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সমাধান তো করতে পারেননি! আমরা জানি তাদের (রোহিঙ্গাদের) নিরাপত্তার অভাব। কিন্তু মায়ানমার সরকারের সঙ্গে যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুক্তি করলেন, কেন সেখানে জাতিসংঘের প্রতিনিধি রাখা হয়নি? আজ যদি জাতিসংঘের প্রতিনিধি রেখে সেদিন চুক্তি করা হতো, আমরা বিশ্বাস করি (যে), জাতিসংঘের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, তাঁদের তত্ত্বাবধানে এই শরণার্থীরা (তাদের) দেশে ফিরে যেতো ঃ (তাদের) দেশে ফিরে যেতে তখন তারা ভয় পেতো না। কি রহস্য আছে এর পেছনে যে, মায়ানমার সরকারের সঙ্গে আজকে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি করলেন? সেখানে তো মিলিটারি ডিক্টেটর। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও একজন অবঃ, অবসরপ্রাপ্ত, (তাই) হয়তো আত্মার মিল আছে, ভাবের আদান-প্রদান আছে। সেজন্য বোধ হয় তাঁরা একে অপরকে বন্ধু মনে করছেন। কিন্তু কৈ শরণার্থীদেরতো ফিরিয়ে দিতে পারেন নি? এটা পররাষ্ট্র নীতিতে, তাদের (বিএনপি সরকারের) চরমভাবে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা চাই না (যে), শরণার্থীদের কোন জায়গায় ঠেলে দেয়া হোক। কিন্তু আজকে সেখানে অস্ত্রের খেলা চলছে, সেখানে আজকে (অস্ত্রের) ট্রেনিং চলছে। এদেশকে আজ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া, আত্মঘাতী সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার একটা চক্রান্ত চলছে, যে চক্রান্ত আমরা কোনমতে বরদাশত করতে পারি না। তাই আমরা মনে করি (যে), আজকে যত দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক, জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ এ সমস্যার সমাধানে সরকার উদ্যোগী হবে। এটাই আমরা কামনা করি।"

১৪৭। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখে সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সংসদে তর্ক-বিতর্কের সময় বিএনপি-এর কতিপয় মন্ত্রী ও সাংসদ বঙ্গবন্ধুর শাসন আমল সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিলেন তার জবাবে তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, এখানে মন্ত্রীরা অনেক বক্তব্য দিয়েছেন। কর্নেল (অবঃ) আকবর সাহেব বলেছেন যে, (তাঁরা) এখন ফ্রন্ট লাইনে খেলছেন। আমরাও বলি তাই। (যদিও তাঁরা) ফ্রন্ট লাইনে খেলছেন, খেলায় তাঁরা পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। খেলায় ফেল করেছেন, তাঁরা পাস করতে পারেননি। এবার সেকেন্ড লাইনে আসুন, কেমন খেলা জমে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই। কর্নেল (অবঃ) আকবর সাহেব ঠিকই বলেছেন, ফ্রন্ট লাইনে এখন (তিনি) খেলতে পারছেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছি। কাজেই তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, এখানে কোন মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আমলের কথা তুলেছেন। একটি কথা তাঁদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বঙ্গবন্ধুর আমলে ছিল একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে, এখানে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হবে যে, সেটা ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, প্রদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার মতো পুলিশ বাহিনী ছিলো না, সেনাবাহিনী ছিলো না, বিডিআর ছিলো না, কিছুই ছিলো না। তারপর আপনি তো জানেন যে, বাঙালীদের কোথাও কোন স্থান ছিলো না। কোন বাঙালী সেক্রেটারি পদ পর্যন্ত পেতো না। সেনাবাহিনীতে একমাত্র কর্নেল ওসমানী সাহেব ছিলেন। বাঙালীরা কোন (গুরুত্বপূর্ণ) প্রশাসন (পদ) পেতো না, এমন কি প্রশাসনে ডিসি, এসপি-এর পদও না। নন-বাঙালীরা পেতো, বাঙালীরা পেতো না। তেমনি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তখনও এমন হয়নি। আজকে সেখানে দেখা যায়, যে কোন ক্ষেত্রে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা তো নেই-ই, তারপরেও এই (বিএনপি) সরকারের আমলে সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে।"

১৪৮। শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সংসদে তর্ক-বিতর্কের সময় বিএনপি-এর কতিপয় মন্ত্রী ও সাংসদ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছিলেন তার জবাবে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজ কতকগুলো কথা এসেছে, যেগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে। আমি আশা করিনি শহীদ পরিবারের (সম্পর্কে) কেউ এ ধরনের কথা বলবে। আজকে শেখ কামাল সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। 'সত্তর থেকে নব্বই ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট'-এর লেখক আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার—তাঁর (ঐ) বইতে আছে, '(মেজর) ডালিম বেগম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজিবকে 'মা' বলে সম্বোধন করতো। প্রায়শ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করতো। ডালিম, ডালিমের স্ত্রী এবং (তার) স্ত্রীর মা হেনা বেগম ঘন ঘন বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনার নিকট যেতো।' কথাটা মিথ্যা নয়, মাননীয় স্পীকার। ডালিমের স্ত্রী বা ডালিমের শাশুড়ী, আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন এক সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করতাম। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সব সময় পারিবারিক সম্পর্ক ছিলো। পঁচাত্তরের (১৯৭৫-এর) পনেরই আগস্টের ঘটনাকে, যেখানে ডালিমের বোনের বিয়ে এবং গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের ঘটনা বলে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তথ্য ঠিক নয়। তা এ বইতেও আছে যে, 'ডালিমের বোনের বিয়েতে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে তাকে (ডালিমের স্ত্রীকে) উত্যক্ত করলে ডালিম উক্ত ছেলেকে চড় মারে। তখন ডালিমকে ঐ ছেলের বন্ধু-বান্ধবরা ঘেরাও করে রাখে। গাজী (সাহেব) এ কথা জানতে পেরে, পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরে, ডালিম ও তার স্ত্রীকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধুর মধ্যস্থতায় (তাদের) বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং গাজী (সাহেব) ও ডালিম পরস্পর হাত মেলায়। এক সঙ্গে মিষ্টি খেয়ে পরে মধ্যরাতে (তারা) বঙ্গবন্ধুর বাসা হতে বিদায় নেয়।"

১৪৯। শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডা চলাকালে বিএনপি-এর কতিপয় মন্ত্রী ও সাংসদ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছিলেন তার জবাবে আরও বলেন, "আজকে শেখ কামালকে জড়িয়ে এই সংসদে যে সমস্ত কথা একজন সদস্য বলেছেন। (তিনি বলেছেন যে), বরকত ও কামাল এক সঙ্গে গুলি খেয়েছিলো। আজকে আমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি (যে), যদি বরকত বন্ধু হয়ে থাকে, যদি কামালের সঙ্গে একদিনের বন্ধুত্ব থেকে থাকে তো উনি বলুন, রাত্রি ১২টার সময় কোনদিন, কোন ব্যাংকে ব্যাংক ডাকাতি করা যায় কিনা? তাও আবার স্টেট ব্যাংক! স্টেট ব্যাংক কিভাবে তার ভোল্ট রক্ষা করে, তা যাদের সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আছে, তারাও জানেন। আর একটা কথা মনে রাখা উচিত। একটি দেশের প্রধান মন্ত্রীর ছেলের টাকার জন্য ব্যাংক ডাকাতির প্রয়োজন হয় না, মাননীয় স্পীকার। এ কথা মনে রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার, শেখ কামালকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, আমি বেশী বলতে চাই না, তাহলে মনে করবেন আমি bias। কিন্তু শেখ কামাল এমন একটি ছেলে যার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মুক্তিযুদ্ধে, গানবাজনায়, নাটকে, খেলাধূলায় যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আজকে যারা তার নামে মধ্যরাতে ব্যাংক ডাকাতির কথা বলে, আজকে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলে। (তাই) এ কথা সত্য নয়। এ জাতীয় কথা এ সংসদে কখনই উথাপন করতে দেয়া উচিত নয়। আমার ভাই শেখ জামাল যখন সেন্টহার্স্টে পড়তে যায়, প্রধান মন্ত্রীর ছেলে হয়েও লন্ডনে একটি দোকানে সেলসম্যানের চাকুরী করে লেখাপড়ার খরচ নিজেই সে যুগিয়েছিলো। আজকে অনেক প্রধান মন্ত্রীর ছেলেরা বিদেশে থেকে পড়াশুনা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(তারা) কি ধরনের জীবন যাপন করে, (সে সম্পর্কে) আমি প্রশ্ন রাখতে চাই। আমি কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। মাননীয় স্পীকার, শুধুমাত্র আমি এজন্য বললাম যে, এ সমস্ত নোংরা অসত্য কথা বলা ঠিক নয়।"

১৫০। শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাবে উত্থাপিত অভিযোগাদির কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। এই অনাস্থা প্রস্তাব খণ্ডন করতে না পেরে অসত্য অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছে। অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনেক কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করা যায়। আমরা সেদিকে যেতে চাই না। আমরা বর্তমানকে জানতে চাই। আজকে দেশের মানুষের যে জানমালের নিরাপত্তা নেই, আজকে অর্থনৈতিক অবস্থার যে চরম অবনতি ঘটেছে, আজকে সারা দেশে যে সন্ত্রাস চলছে, বিএনপি (সরকার) কেমন করে শান্তি আনবে? কেমন শান্তি আনবে? সমস্ত জায়গা যখন দখল শেষ করে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করবে, যখন বিরোধী দলকে টুঁটি চেপে, গলা চেপে হত্যা করবে, বিরোধী দলকে বিএনপি সরকার যখন shut down করে রেখে কবরের শান্তি আনবে—যেমনি (দেশের) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আনছে, বাস টার্মিনালগুলোতে (বিএনপি-এর) অস্ত্রধারীরা বসে আছে—ঠিক তেমনি তারা কবরের শান্তি চায়। কিন্তু এই দলীয়করণ, এই দলীয়করণের পরিণতি কখনই ভালো হয় না।"

১৫১। শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে আরও বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজ দলীয়করণ সকল ক্ষেত্রে। কয়েকদিন আগে একটি চিঠি পেলাম BSS (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা) থেকে। সেখানেও দলীয়করণ হয়েছে। আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আপনাকে বলছি (যে), (বিএনপি) দলীয়করণ করতে করতে আপনাকেও কিন্তু ছাড়েনি, মাননীয় স্পীকার। কারণ, ঐ চেয়ারটায় যখন বসেন, তখন স্পীকার কিন্তু কোন দলের থাকতে পারেন না। স্পীকারকে সব সময় নির্দলীয় থাকতে হয়। এটাই নিয়ম। আমরা কাউলের 'Practice and Procedure of Parliament' বইতে দেখি, সেখানে কি (বলা) আছে? (সে বইতে) Speaker's Seat সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'In India, the presiding officers follow more or less the traditions and conventions established by the Speakers of the British House of Commons. Even during the tenure of Sir Frederick Whyte, who was only a nominated presiding officer, the British Model of Speakership was generally followed. The presiding officer kept himself completely aloof from party politics. Speaker Patel dissociated himself from the Swarajist Party of which he was an active member prior to his election and during his entire term of office he kept himself aloof from party interest.' (অনাস্থা) প্রস্তাব উত্থাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার সময় মনে হয়েছিলো যে, সেদিন আমাদের অনেক (সংসদ) সদস্য কথা বলতে উঠেছিলো, কিন্তু কোন সুযোগ পায়নি, মাননীয় স্পীকার। অনেক সময় আমরা এটা দেখি যে, আমাদের (সংসদ) নেতারা সুযোগ পান না। তার ওপর আরও একটি খবর শুনলাম যে, আপনি এই সংসদের ৩৩০ জন সদস্যের কাস্টোডিয়ান। আমাদের সকলের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। আপনি কখনও একতরফা হতে পারেন না। তারপর যখন শুনি (যে), আপনি খুলনা বিএনপি-এর প্রেসিডেন্ট, মাননীয় স্পীকার, এতে পার্লামেন্ট প্র্যাকটিস কি ক্ষুণ্ন হয় না? কথাটা কি সত্য? আপনার কাছ থেকে তো আমরা এটা আশা করি না। আপনি দলমত নির্বিশেষে সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে এই সংসদে সকল সদস্যের অধিকার রক্ষা করবেন, সকল সদস্যের আস্থা-বিশ্বাস আপনার ওপর থাকবে, আমরা এটাই চাই।"

১৫২। শেখ হাসিনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে বিএনপি সরকারের আরও সমালোচনা করে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই (যে), (এ সংসদে) একটি চুক্তি হয়েছিলো আমাদের মধ্যে—সে চুক্তিমালায় সই করেছিলেন (সরকারী দলের) সংসদ উপনেতা ও চীফ হুইপ এবং আমাদের (সংসদ) উপনেতা ও চীফ হুইপ। (সে চুক্তিতে) বলা হয়েছিলো যে, সংসদের ভেতরে-বাইরে সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বজায় রাখা হবে। সেটা কি কার্যকর হয়েছে, মাননীয় স্পীকার? আজকে সারা দেশে সংসদ সদস্য মোশাররফের মতো আমার (দলের) কর্মীরাও নির্যাতিত। আজকে প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হচ্ছে, যে প্রশাসন, প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ কর্মচারীদের কেউ ক্ষমতায় গেলেই দলীয়করণ করতে পারে না। আজকে যাঁরা আওয়ামী লীগের কথা তোলেন, তাঁদের একটি কথাই বলতে চাই যে, তখন আর কোন দল ছিলো না। আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীন করেছিলো। প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে, সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে, বিডিআর গড়ে তুলতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে। তখন তো বিএনপি-এর জন্মই হয়নি। মাননীয় স্পীকার, অবশ্যই আমাদের অতীত আছে। অতীত ইতিহাস আছে। যাঁদের অতীত নেই, যাঁদের ইতিহাস নেই, যাঁদের ঐতিহ্য নেই—তাঁদের তো অতীত ইতিহাস নিয়ে কিছু বলার নেই। আমাদের আওয়ামী লীগের অতীত ইতিহাস আছে, অতীত ঐতিহ্য আছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষকে কিছু দিতে পারি আর না পারি, এদেশের মানুষকে আমরা স্বাধীনতা তো দিয়েছি। জাতির জনক শেখ মুজিব—আপনারা স্বীকার করেন আর না করেন, সারা বিশ্বের মানুষ স্বীকার করে যে, তিনি (বঙ্গবন্ধু) এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আত্মপরিচয়ে বাঙ্গালী জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়েছেন। বাংলাদেশের পতাকাকে বিশ্বের দরবারে উড়িয়েছেন। বাংলাদেশ মানচিত্রকে স্থাপন করেছেন। আজকে যাঁরা কিছু হয়েছেন, বিদেশে যান, এদেশে প্রমোশন পান, এদেশে মন্ত্রী হন, যাঁরা যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু হয়েছেন—বাঙ্গালী জাতি যদি স্বাধীনতা না পেতো, তাহলে কেউ ঐ জায়গায় উঠতে পারতেন না। যিনি যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতেন। বলা হয়, এক দলীয় শাসন, বলা হয় বহু কথা। আজকে বলা হয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে—অবশ্য (আওয়ামী লীগের সাংসদ) তোফায়েল সাহেব (এ ব্যাপারে) বলেছেন, (তাই) রিপিট করতে চাই না। (সংবাদপত্রের) স্বাধীনতা যে ছিলো, (সরকারী দল বিএনপি-এর) মন্ত্রীরা তো বিভিন্ন সংবাদপত্র কোট করে বিভিন্ন কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও সব সময় স্বাধীনতা ছিলো, তাতে দলের সদস্যদের (বিভিন্ন) উক্তি থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়।"

১৫৩। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে শেখ হাসিনা তাঁর দলের মধ্যে যে গণতন্ত্রের ও গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ রয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আমরা এদেশে গণতন্ত্রকে লালন-পালন করেছি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য গণতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে, আপনি জানেন যে, আমাদের দল 'জনকল্যাণমুখী নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা' ঘোষণা করেছে। আমরা জানি, ঐ ধাক্কা মেরে, ঝাঁকি মেরে মেরে, যেমন সংসদীয় (মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির) গণতন্ত্র এনেছি, আমরা যে অর্থনৈতিক নীতিমালা দিয়েছি—যে নীতিমালার মাঝে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি রয়েছে—আমরা আশা করি যে, একদিন বিএনপিও ঐ নীতিমালার আলোকে (তাদের) নীতিমালা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই সরকারও (আমাদের) নীতিমালার আলোকে (তাদের অর্থনৈতিক) নীতিমালা গ্রহণ করে বাংলার মানুষের মুক্তি আনবে। আমরা চাই এদেশের মানুষের অধিকার। আজকে যারা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে, তারা একথা বলতে চায় যে, দেশের মানুষ যেখানে আস্থা হারিয়েছে, দেশের মানুষ যেখানে অনাস্থা দিয়েছে, সেখানে আমরা তো চুপ থাকতে পারি না। আজকে একথা ঠিক নয় যে, একটি সরকারের পতন হলে গণতন্ত্র খোয়া যাবে। বিএনপি সরকার অপকর্ম করলে, (সে সম্পর্কে) বলতে গেলেই 'গণতন্ত্র গেল', 'গণতন্ত্র গেল' বলে চিৎকার করবে—গণতন্ত্র কি এতই ঠুনকো জিনিস, মাননীয় স্পীকার? অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক আন্দোলন করে, অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র এনেছি। আমি একথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি (যে), সরকারের পতন হলে গণতন্ত্র নস্যাৎ হবে না। ১৯৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, ৫ই ডিসেম্বর, ৬ই ডিসেম্বর যেভাবে মার্শাল ল' ঠেকিয়ে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করেছি, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, ঠিক সেভাবে আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করবো।"

১৫৪। শেখ হাসিনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে বিএনপি দলে যে গণতন্ত্রের, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ও চর্চার অভাব রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দিয়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকা না থাকার সঙ্গে গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন সম্পর্ক নেই, এটা আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই। আজকে জাতিকে বিভ্রান্ত করা, জাতির মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে যে, (এ বিএনপি) সরকারের পতন হলে গণতন্ত্র যাবে, এটা ঠিক নয়। বিএনপি গণতন্ত্র শিখলো কবে? মার্শাল ল'র মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছিলো। মার্শাল ল'র মধ্য দিয়ে বিএনপি-এর জন্ম, মার্শাল ল'র মধ্য দিয়েই তাদের অগ্রযাত্রা। কাজেই, (তাদেরকে) গণতন্ত্রের ভাষা যদি শিখিয়ে থাকি, আমরাই শিখিয়েছি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকে আমরা চাই (যে), বিএনপি গণতন্ত্র শিখুক, গণতন্ত্রের প্র্যাকটিস করুক এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তারা অনুশীলন করুক। গণতন্ত্রের যে মূল কথা সহনশীলতা, সমঝোতা, তারা শিখুক। কিন্তু আমরা সহযোগিতা করেছি, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংসদীয় (মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির) গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে তাদের (বিএনপি-এর) ক্ষমতার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়িত করতে সহযোগিতা করেছি।"

১৫৫। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত তাঁর ভাষণের শেষাংশে শেখ হাসিনা বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছি যে, বিএনপি (সরকার)-এর ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব আমরা বিরোধী দল থেকে নিতে পারি না। কাজেই, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের (বিএনপি সরকারের) অযোগ্যতার, অদক্ষতার, অব্যবস্থার, দলীয়করণ ও সন্ত্রাস করে জনজীবনে যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং আজকে জনগণের মাঝে যে আস্থাহীনতা এসেছে, সেখানে আমরা কোনদিনই তাদের সহযোগিতা করতে পারি না। কোনদিনই তাদের (বিএনপি-এর) সঙ্গে হাত মেলাতে পারি না। তারই কারণ হিসেবে জনগণের যে অভিমত সেই অভিমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে আজ আমরা এই অনাস্থা (প্রস্তাব) এনেছি। আমরা আশা করবো (যে), জনগণের এই রায় বিএনপি সরকার মেনে নেবে। আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু!"

১৫৬। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখ গভীর রাতে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর প্রায় এক ঘন্টা ধরে সমাপনী ভাষণ দেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণের পর পরই। তাঁর ভাষণের শুরুতেই প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মাধ্যমে সংসদের সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি বিরোধী দলের নেত্রীর শেষ প্রশ্ন দিয়েই শুরু করবো। তিনি বলেছেন, 'আমরাই তাদেরকে শিখিয়েছি গণতন্ত্র' অর্থাৎ বিএনপি-কে তিনি গণতন্ত্র শিখিয়েছেন। কিছুদিন আগে উনি বলেছেন যে, বিএনপিকে উনি গণতন্ত্র শেখাবেন। এখন বলছেন, শিখিয়ে ফেলেছেন। মাননীয় স্পীকার, তাঁদের গণতন্ত্রের নমুনা এ দেশবাসী জানে। তাঁদের গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের (সংসদ) উপনেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক কথাই বলেছেন। কাজেই আমি তার পুনরাবৃত্তি করবো না। শুধু এক বাক্যে বলবো যে, সেই গণতন্ত্র ছিলো একদলীয় গণতন্ত্র, এক দলীয় শাসন। সেই গণতন্ত্র আমরা শিখতে চাই না। সেই গণতন্ত্র আমরা এদেশের মানুষকে শেখাতে চাই না, বরং আমরা শিখিয়েছি তাঁদেরকে গণতন্ত্র। বলতে চাই যে, জিয়াউর রহমান এদেশে গণতন্ত্র এনেছে, শিখিয়েছে। সেটি হলো বহুদলীয় গণতন্ত্র। আর যেটি, সেটি হলো আপনারা আজকে নির্বাচন করেছেন যে নাম নিয়ে। আজকে সংসদে যে নাম নিয়ে বসে আছেন সেই নামটি কিন্তু আপনাদের পঁচাত্তর (১৯৭৫) সালের আগে শেষ হয়ে গিয়েছিলো, হারিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে হয়েছিলো 'বাকশাল' অর্থাৎ জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলো বলেই আপনারা আবার আপনাদের সেই নামে ফিরে আসতে পেরেছেন এবং গণতন্ত্র আমরা শিখিয়েছি।"

১৫৭। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখ গভীর রাতে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর তাঁর সমাপনী ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যাপারে বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য আমরা যে বিল এনেছিলাম সরকারী দল তার প্রতিবাদ করেছিল।' (এ কথা) সম্পূর্ণ অসত্য। আমরা বলি (যে), সরকারী দলও বিল এনেছিলো এবং সরকারী দলের সহযোগিতা না হলে কোনদিনই সেই সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন সম্ভব হতো না। সরকারী দলই সেই উদ্যোগ নিয়েছিলো। সরকারী দল বিল এনেছিলো এবং তার মধ্য দিয়েই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছি। কাজেই, আসুন, সত্য কথা স্বীকার করে নিই। আমরা যে সংসদীয় রীতিনীতি প্রবর্তন করেছি, সেই সংসদীয় পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আজকে অনেক বেশী প্রয়োজন ঐক্য। সেই ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য প্রতিনিয়ত বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে শুধু অপপ্রচার, মিথ্যে অপবাদ দিয়ে চলেছে। এতে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে, দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই, আসুন, যদি এতোই গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাহলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। দু'টি দলসহ অন্যান্য দলকে পাঁচ বছরের জন্য জনগণ ম্যান্ডেট দিয়েছে। তাই গণতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সর্বরকম প্রক্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতেও আমরা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবো।"

১৫৮। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে বলা কতিপয় মন্তব্যের জবাব হিসেবে বলেন, "তিনি আরও বলেছেন, 'এই অনাস্থা প্রস্তাবে জনগণের আহাজারি প্রতিফলিত হয়েছে।' আমি (বলতে) চাই, জনগণ অনাস্থা প্রস্তাব দেন নির্বাচনে। কাকে (নির্বাচন) করবে, কাকে বর্জন করবে, সেটা তখন প্রমাণিত হয়। নির্বাচনের মধ্য দিয়েই জনগণের আস্থা-অনাস্থা প্রতিফলিত হয়। সেই আস্থা-অনাস্থার প্রতিফলনও জনগণ দেখিয়েছেন। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবিধান অনুযায়ী (সংসদের) ৫টি আসনের বেশী আসনে কেউ (নির্বাচনের জন্য) দাঁড়াতে পারেন না। সেখানে কেউ দু'টিতে, কেউ পাঁচটিতে, কেউ তিনটি আসনে (নির্বাচনের জন্য) দাঁড়িয়েছেন। বিরোধীদলের অনেকেও দু'টি আসনে (নির্বাচনের জন্য) দাঁড়িয়েছেন এবং দু'টি আসনেই জয় লাভ করেছেন। সামনেই (সাংসদ) তোফায়েল সাহেব আছেন। তিনি (নির্বাচনের জন্য) দু'টিতেই দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি দু'টিতেই জয় লাভ করেছিলেন। (সাংসদ) রাজ্জাক সাহেবও দু'টিতেই জয় লাভ করেছেন। সেখানে জনগণের রায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা দেখেছি (যে), বিরোধী দলের নেত্রী তিনটি আসনে (নির্বাচনের জন্য) দাঁড়িয়েছিলেন, দু'টিতে পরাজিত হয়েছেন। এটাই কি জনগণের রায় নয়? তারপরেও, তিনি বিরোধীদলের নেত্রী। অনাস্থা প্রস্তাব তো জনগণ সেদিনই দিয়ে দিয়েছেন!"

১৫৯। সংসদে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী উত্থাপিত কতিপয় অভিযোগের জবাব হিসেবে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আরও বলা হয়েছে (যে), বিভিন্ন স্কুলে অপহরণের থ্রেট, নারী পাচার, শিশু পাচার ইত্যাদি রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে একটু আগেই আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এটি কারা করছেন? তিনি বলেছেন (যে), তিনি প্রমাণ করবেন কারা এগুলো করছে। এই অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা কারা সৃষ্টি করতে চায় সেটি নিশ্চয়ই আমরা আগামীতে প্রমাণ করবো। ইতিমধ্যেই, বেশ কিছু (লোক) ধরা হয়েছে। যারা অপহরণ করেছে তাদেরকে এবং সেইসব শিশুকে খুঁজে বের করা হয়েছে, তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি উটের দৌড়ে বাংলাদেশের শিশুদের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমরা জানি, এটা কবেকার ঘটনা। সেই রিপোর্ট আমাদের কাছেও আছে। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার যথোপযুক্ত তদন্ত করেছে। আমরা দেখেছি, সেখানে পত্রিকায় কি (সংবাদ) বেরিয়েছিলো। আপনি (শেখ হাসিনা) কিন্তু সেই রিপোর্টের কথা বলেননি। সেখানে একটি পত্রিকায় বেরিয়েছিলো যে, যেই দেশের নাম করা হয়েছে, সেই দেশে তারাই এর প্রতিবাদ করেছে। বলা হয়েছে যে, সেই শিশুরা, তারা এতিম শিশু, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব তারা নিয়েছে এবং তারা ভালো আছে। প্রয়োজন হলে তাদেরকে যে কেউ এসে দেখতে পারে, তাদেরকে দেখানো হবে। সেটি পত্রিকায় বেরিয়েছে। আমরা আরও তথ্য দিতে পারি।"

১৬০। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার আরও কতিপয় অভিযোগের জবাবে বলেন, "আরও বলা হয়েছে যে, ৩৩০ জন সংসদ সদস্যের অন্তত ১০ জন সদস্যের অলংকার ছিনতাই, মন্ত্রীর গাড়ী হাইজ্যাক হয়েছে। আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলতে চাই (যে), দীর্ঘ ৯ বছর স্বৈরাচার দেশে জেঁকে বসেছিলো, সে স্বৈরাচারই সন্ত্রাসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। এ অবস্থায় রাতারাতি কি সব হাইজ্যাক বন্ধ করা যাবে? রাতারাতি কি সব ঠিক হয়ে যাবে? সেটি কখনোই সম্ভব নয়। আমরা বলেছি (যে), কিছু কিছু সন্ত্রাস অবশ্যই আছে। সেগুলোও দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং দমন করা হবে। কাজেই, হাইজ্যাক নেই, একথা আমরা কখনো বলিনি। কিন্তু হাইজ্যাককে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, হাইজ্যাকারদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু হাইজ্যাক কখনোই বন্ধ হবে না। আমরা দেখতে পাই (যে), বিভিন্ন সময়ে এখানেও কেউ কেউ ছিলো। আমরা দেখেছি (যে), অনেকের সম্পর্কে খুনের মামলাও রয়েছে। সেই রকম লোকও কিন্তু অনেক দলে আশ্রয় পেয়েছে এবং দলের সদস্যও হয়েছে। কাজেই, সন্ত্রাসীরা যদি সেই দলে থাকে, তারা যদি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে সন্ত্রাস করে, তাহলে কিভাবে সন্ত্রাস বন্ধ হবে? কাজেই, আজকে তাদেরকে (সন্ত্রাসীদেরকে) সহযোগিতা না করার জন্য বলবো। সম্মানিত বিরোধী দলের নেত্রীকে আমি অনুরোধ করবো (যে), সে রকম সদস্য যদি তাঁদের দলে কেউ থাকে, তাহলে তিনি যেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিজেই তাঁদেরকে ধরিয়ে দেন। তাহলে দেশ উপকৃত হবে, জনগণ উপকৃত হবে।"

১৬১। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, তিনি আরও বলেছেন (যে), সংসদে উপস্থিত মোশাররফ সাহেব যখন সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নাকি তাঁর ওপর বিএনপি-এর সদস্যরা আক্রমণ করেছে। আমরা বলতে চাই (যে), যেখানেই আক্রমণ হয়, সেখানেই ওনারা (আওয়ামী লীগাররা) বিএনপিই চোখে দেখেন। তাহলে সারা বাংলাদেশটা বিএনপি-এর হয়ে গেছে! তার মানে সারা বাংলাদেশের মানুষ বিএনপি'র ওপরই নির্ভর করছে, এটা কি তাই প্রমাণ করে না? উনি বলেছেন (যে), সন্ত্রাসীরা আজকে তাদের দল ছেড়ে বিএনপিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এটা যদি বলা হয়, তাহলে বলবো বিএনপি যে সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কৃত করেছে, তারা সেই সন্ত্রাসীদেরকে কিন্তু তাদের দলে জায়গা করে দিয়েছে। এমন নজিরও আমাদের কাছে আছে। এমন দৃষ্টান্তও আমাদের কাছে আছে। তাই বলতে চাই, মোশাররফ সাহেব, সন্ত্রাসীরা যারা (তারা যে) আপনার দলে ছিলো। নিজের দলের মারামারি, নিজের দলের বিভ্রান্তি ঢাকার জন্য আজকে সবকিছু বিএনপি-এর ছাত্রদলের ওপর এবং বিএনপি-এর ওপর চাপিয়ে দিয়ে অসত্য বলা ঠিক হবে না, বরং আমরা বলতে চাই (যে), আজকে সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ ও ছাত্র সংগঠনগুলো বুঝতে পেরেছে (যে), এদেশে যদি সত্যিকারের গণতন্ত্র কেউ প্রতিষ্ঠিত করে থাকে সেটা করেছে বিএনপি। এদেশে যদি জনগণের অধিকার কেউ প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, সেটা করেছে বিএনপি। এদেশে ছাত্ররা আজকে যে গণতন্ত্রের কথা বলছে, নয়টি বছর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছে, সেই আন্দোলনে কেউ যদি সহযোগিতা করে থাকে, সেটা করেছে বিএনপি। তার জন্যই আজকে বিএনপি-এর ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে সমস্ত আস্থা ও বিশ্বাস। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হচ্ছে, সে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করছে বিএনপি-এর ছাত্রদল এবং শুধু সেটাই নয়, কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি (যে), চাকসু'র ভিপি তাদের দল ছেড়ে এসেছে। কেননা সেখানে গণতন্ত্র নেই। রয়েছে সন্ত্রাস, লালন করা হচ্ছে সন্ত্রাসীদের। এসব কারণে তিনি (চাকসু-এর ভিপি) সেই দল পরিত্যাগ করে আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেছেন। এটাই কি প্রমাণ করে না যে, জাতীয়তাবাদী দলে শুধু নয়, তার অংগ সংগঠনগুলোতেও গণতন্ত্র রয়েছে এবং সে গণতন্ত্রের জন্যই আজকে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজ, যারা আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবে, তারাই এই জাতীয়তাবাদী দলের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করছে।"

১৬২। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত সমাপনী ভাষণে আরও বলেন, "সারা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের জয়জয়কার দেখে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এজন্য আজকে সবকিছু হারিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে এসেছে। তাও কার সঙ্গে? সেটা হলো যারা একদিন স্বৈরাচারী ছিলো। যাদেরকে স্বৈরাচারী বলে রাজপথে এই ছাত্র-যুবকেরা রক্ত দিয়েছে, জেল খেটেছে। আপনারাও জানেন (যে), নূর হোসেন, দিপালী সাহা, জেহাদ, আরও অনেকে, সেই তাদের হাত ধরেই আজকে আপনারা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। এটাই কি গণতন্ত্রের নমুনা? এটাই কি গণতন্ত্রের ঐতিহ্য? এটাই কি জনগণের অধিকারকে সমুন্নত রাখা? তাই, আজকে জনগণ আরও বেশি করে প্রস্তাব দেবে এবং আগামী নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রতি অনাস্থা দেবে এ কারণে যে, তারা শুধু সুযোগের সন্ধানেই থাকে। তাদের কাছে দেশ বড় নয়, জাতি বড় নয়, গণতন্ত্র বড় নয়। তারা যখনই সুযোগ পায়, তখনই স্বৈরাচারীদের সাথে হাত মেলায়। যেমন মিলিয়েছে ১৯৮৬-তে, তেমনি মিলিয়েছে ১৯৯২-তে। মাননীয় স্পীকার, আর একটা কথা। অনেক কথা আছে যেগুলোর কিছু কিছু সত্য (বলে) আমি স্বীকার করি। যেমন বলেছে, (যে), আমার দেশের মা-বোনেরা পাকিস্তানের পতিতালয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পতিতালয়ে (কি-না) আমি জানি না। তবে, পাচার হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি। খবরের কাগজে দেখেছি। এসব পাচারকারীকে বিভিন্ন জায়গায় ধরা হয়েছে। অনেক পাচারকারী এখনও জেলে আছে এবং পাকিস্তানী জেলে যারা আছে, ইতিমধ্যেই তাদের অনেককে ফেরত আনা হয়েছে। তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। এবং সেটাও করেছে এই জাতীয়তাবাদী দলের সরকার, বিএনপি সরকার।"

১৬৩। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে আরও বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আর একটা কথা এখানে বলা হয়েছে (যে), মাদারীপুর, শরীয়তপুরে বিএনপি সর্বহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টিকে মদদ দিচ্ছে। জনগণ নাকি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমি জিজ্ঞেস করতে (বলতে) চাই, মাননীয় স্পীকার, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে বিএনপি-এর কোনও এমপি নেই। কাজেই, বিএনপি-এর স্থান সেখানে কম। বিএনপি সেখানে অত্যন্ত দুর্বল যার জন্য কোন সদস্যই আমরা (সেখান থেকে) আনতে পারিনি। মদদ তাঁরাই দিচ্ছেন যে দল ওখানে শক্তিশালী। যার বলে তাঁরা (আওয়ামী লীগাররা) নির্বাচিত হয়েছেন, তারাই আজকে মদদ দিচ্ছে, তাদের আশ্রয়, তাদের প্রশ্রয়ে 'সর্বহারারা' এসব করার সুযোগ পাচ্ছে।" তারপর, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "মাননীয় স্পীকার, বলা হয়েছে (যে), পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার (সমাধান) না কি বিএনপি সরকার চায় না। আমরা বলতে চাই (যে), পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কার সৃষ্টি? আওয়ামী লীগ যখন স্বাধীনতার পরে ক্ষমতায় ছিলো, তখন তারা বলেছিলো, পার্বত্য অঞ্চলের সকলেই বাঙ্গালী। সকলকে জোর করে বাঙ্গালী করা হয়েছে। তখন থেকেই তারা (পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীরা) প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। আমরা বলতে চাই (যে), সেখানে বিভিন্ন ধর্মের, গোত্রের ও সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। তারা যে যে ধর্মের সেটাই আমরা রাখতে চাই। আমাদের দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চায়। আমরা বলছি (যে), তারা বাঙ্গালী নয়, তারা বাংলাদেশী। তারা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চাই, এরি মধ্যেই সেটি প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা (আওয়ামী লীগাররা) বলতে চান যে, সংসদীয় কমিটি করা হোক। আমরা বলতে চাই (যে), আমাদের যে সদিচ্ছা আছে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা একটি কমিটি করে দিয়েছি। সংসদীয় কমিটি আর সংসদ সদস্য দিয়ে কমিটি করার মধ্যে এমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ, আপনারা যদি সংসদ সদস্যদের অবমূল্যায়ন করেন, তাহলে ভুল হবে। সেইজন্যই আমরা সংসদ সদস্যদের দিয়েই কমিটি গঠন করেছি। বিএনপি যে মনেপ্রাণে এ সমস্যার সমাধান চায়, ইতিমধ্যেই তার কিছু নজির সবাই দেখেছেন এবং আগামী দিনেও দেখতে পাবেন। বিএনপি এই সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ করতে সক্ষম হবে এবং এটি দেখার পর এই বিএনপি সরকারের প্রতি তাদের আস্থা-বিশ্বাস রয়েছে বলেই তারা ইতিমধ্যেই ceasefire (ঘোষণা) করেছে এবং আলোচনায় বসতেও তারা রাজি হয়েছে। এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা যে, তারা আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে। একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তারা যে আস্থা রেখেছে সেটিই হলো বিএনপি সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য। তাই আবারও শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম (সমস্যা সমাধানের উদাহরণ) দিয়ে বলতে চাই যে, অনাস্থা প্রস্তাব আপনারা বিরোধী দল দিলেও আমাদের ওপর কিন্তু জনগণের আস্থা আরও বেশি করে অর্পিত হচ্ছে এবং তারা আস্থা জ্ঞাপন করেই চলেছে।"

১৬৪। সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত তাঁর ভাষণে রোহিংগা সমস্যা সৃষ্টির জন্য বিএনপি সরকারকে দায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার জবাব হিসেবে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "মাননীয় স্পীকার, পরবর্তীতে বলা হয়েছে (যে), রোহিংগাদের (বিএনপি) সরকার এনেছে। আমাদের জানা নেই, কোন দেশে এ রকম নজির আছে কি-না যে, বিদেশী কাউকে ডেকে এনে দেশে রাখা হয়। এটা বোধ হয় তাদের কিছু, তাদের হয়তো সে রকম চিন্তা-ভাবনা ছিলো।" তারপর, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অপর কতিপয় অভিযোগ ও মন্তব্যের জবাব হিসেবে বলেন, "স্বাধীনতাউত্তরকালে দেশের অবস্থা এমন হয়েছিলো যা সকলেই জানে—বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কি আকার ধারণ করেছিলো। তখন দেশে সরকার বলে কিছু ছিলো না। তিনি বলেছেন, তখন নাকি আমাদের পুলিশ ছিলো না, আর্মি ছিলো না, প্রশাসন চালাবার মতো লোক ছিলো না। এমন কি, তিনি বলেছেন (যে), এম.এ.জি. ওসমানী ছাড়া নাকি কর্নেলের ওপরে কেউ যেতে পারেনি। আমি বলতে চাই (যে), এসব তথ্য হয়তো তাঁর কাছে নেই কিংবা ভুল তথ্য রয়েছে। জেনারেল ওয়াছিউদ্দিন কিন্তু তখনও মেজর জেনারেল ছিলেন। পরবর্তীতে, জনাব ইসকান্দার করিম কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। জনাব মজিদ-উল হক, যিনি আমাদের পাশে বসে আছেন, তিনি তখন ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, এমন কি আজকে তিনি সংসদ সদস্য হতে পারেননি, তবে আপনার দলীয় সদস্য সেই খলিলুর রহমান—তিনিও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেখানে (পাকিস্তানে) বসে বসেই কিন্তু পদোন্নতি লাভ করে ব্রিগেডিয়ার হয়েছিলেন। কাজেই, অনেকে ছিলেন এবং দেখা গেছে সেদিন এই আর্মিকে একদম ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিলো না, বুট ছিলো না, খাবার ছিলো না, রেশন ছিলো না। তাদের জন্য কিছুই করা হয়নি। তাদেরকে একদম সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে একটা প্রাইভেট বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। লাল বাহিনী, নীল বাহিনী এবং আর একটি রক্ষী বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল কিসের জন্য এবং (তাতে) কারা ছিলো তা এদেশের মানুষ জানতে চায়।"

১৬৫। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখে সংসদে প্রধান মন্ত্রী তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে রোহিংগা সমস্যা সমাধানে তাঁর সরকার কি কি ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেন, "রোহিংগার কথা আজকে বলা হচ্ছে। রোহিংগা সমস্যা সম্পর্কে আমাদের ফরেন মিনিস্টার বলেছেন। আমি আর বিস্তারিত বলবো না। তিনি (শেখ হাসিনা) বলেছেন (যে), সেখানে বিপুল পরিমাণ সাহায্য এনে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আমি বিরোধী দলের নেত্রীকে আবারও আহ্বান করে বলবো যে, তিনি যেন সেখানে যান, রোহিংগা ক্যাম্পগুলোতে যান এবং দেখে আসেন রিলিফ কিভাবে বন্টন করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন এনজিও রয়েছে। (সেখানে) U.N.H.C.R. আছে। সরকারের লোকও রয়েছে। তাঁরা সেখানে প্রতিনিয়ত কাজ করছেন এবং রোহিংগারা সাহায্য পাচ্ছে। এটা আমাদের কথা নয়, বিদেশীরা পর্যন্ত এটা বলেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কাছেও বলেছে, যদিও কথাটি আপনারা (এর আগে) সংসদে বলেননি। সত্যি কথা বললে অন্তত সংসদের মর্যাদা বাড়ে। সংসদ শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু আপনারা সেটা এড়িয়ে গেছেন। বিদেশীরা পর্যন্ত বলেছে, 'যেভাবে তোমরা (রোহিংগা) শরণার্থীদের রেখেছ, যেভাবে তাদেরকে রাখা হয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হয়েছে, এটি একটি দৃষ্টান্ত, এটি একটি নজির! এতো তাড়াতাড়ি এরকমভাবে কেউ কখনো করতে পারে না।' রিলিফ আত্মসাতের নজির বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেই। তিনি (শেখ হাসিনা) এর আগেও বলেছেন যে, গত ২৯শে এপ্রিল (১৯৯১) যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল, সেখানেও বহু সাহায্য এসেছে এবং তা নাকি আত্মসাৎ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই (যে), সেখানে বহু সাহায্য এসেছে এবং সে সাহায্যগুলো দুঃস্থ মানুষের মধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। সেই নজির আছে। দেশী-বিদেশী পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে (যে), এই প্রথমবার যেখানে কোন রিলিফ চুরি হয়নি। দুর্গত মানুষের কাছে, তাদের ঘরে ঘরে সেটা পৌঁছেছে, এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজেই, আপনাদের বুঝতে হবে যে, রিলিফ চুরির নজির আমাদের নেই। স্বাধীনতার পরবর্তীতে বহু সাহায্য এসেছে। সেই সাহায্য যদি শুধু সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হতো, তাহলে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হতো না এবং (যুদ্ধ) বিধ্বস্ত বাংলাদেশ আবার গড়ে উঠতে পারতো।কিন্তু তা না হয়ে, সেসব সাহায্য লুটপাট হয়েছে, চুরি হয়েছে, জনগণের মুখের সামনে দিয়ে চলে গেছে।" তারপর প্রধান মন্ত্রী রোহিংগাদের প্রশ্নের ব্যাপারে আরও বলেন, "পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে, রোহিংগা শরণার্থীদের ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। আমরা শুধু এটাই বলতে চাই (যে), রোহিংগা শরণার্থীদের আমরা বলেছি (যে), তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা তাদের ফেরত পাঠাতে চাই না, বরং তাদের সব রকম দেখাশোনা করা হচ্ছে এবং পরিবেশ যখন সত্যিকারভাবে ঠিক হবে, আমরা যখন মনে করবো যে, তারা তাদের দেশে নিরাপদে থাকতে পারবে, তখনই শরণার্থীরা তাদের দেশে ফিরে যাবে। আমি বলতে চাই (যে), অবশ্যই তারা (তাদের) দেশে ফিরে যাবে। যেহেতু তারা সেই দেশের নাগরিক, তারা বার্মার (মায়ানমারের) নাগরিক, তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে এবং আমরা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছি।"

১৬৬। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখ গভীর রাতে সংসদে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দানকালে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকার রাষ্ট্রের ও দেশের সর্বস্তরে দলীয়করণ করছে বলে তীব্র সমালোচনা করে যে সমস্ত অভিযোগ করেছিলেন তার জবাবে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, দলীয়করণের কথা বলা হয়েছে। আমাদের (সংসদ) উপনেতা এ সম্পর্কে বলেছেন। যেহেতু আমাদের উপনেতা বলেছেন, সেহেতু আমি (এ ব্যাপারে) খুব সংক্ষেপে বলবো। দলীয়করণ কি জিনিস আমরা জানি না। আমরা সকলকে সমান সুযোগ দিই। আপনারা তো দেখেছেন। আপনাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট হচ্ছে, ব্রীজ হচ্ছে। এমনকি, জাতীয় পার্টি সেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধন্যবাদ দিয়েছে এবং আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রীর প্রমোশন পর্যন্ত চাওয়া হয়েছে। আপনাদের সংসদ-সদস্যা প্রতিনিয়িত আমাদের কাছে আসছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, আজকে আমরা শুধু সংসদীয় পদ্ধতিই চালু করিনি, এই পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য, গণতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য, সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য আমরা সম্পদের সমান বন্টন করছি। সেভাবে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছি এবং সেই প্রক্রিয়া আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। দলীয়করণ কারা করেছে? তার প্রমাণ দেখা যায় এক দলীয় শাসনে, এমন কি সরকারী কর্মচারীদের সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এর থেকে দলীয়করণ আর কি হতে পারে? সেখানে মিলিটারী, পুলিশ, বিডিআর ও সরকারী কর্মচারীকে সে দলের সদস্য করা হয়েছিলো। সেটা কি দলীয়করণ ছিলো না? এটা সবচেয়ে বড় দলীয়করণ যার জন্য আজকে জনগণ তাদের ওপর আস্থা হারিয়েছে। এরা আসলে আবারও দলীয় প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং উন্নয়নের ধারা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যেয়ে লুটপাটের রাজনীতি কায়েম হবে। সেইজন্য তারা (আওয়ামী লীগাররা) জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। জনগণের আস্থা তারা ফেরত আনতে পারছে না। আমরা শুধু বলতে চাই (যে), আমরা আন্দোলন করেছি। সেই আন্দোলনে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। নির্বাচন এসেছে। নির্বাচনে সকল দলেরই নির্বাচনী কর্মসূচী থাকে, নির্বাচনী মেনিফেস্টো থাকে। আমরা সেই নির্বাচনী মেনিফেস্টো জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমার মনে পড়ে (যে), শুধু আমরা নই, সকল দলের নেতারা টেলিভিশনে বক্তৃতায় নিজ নিজ দলের কর্মসূচী তুলে ধরেছিলেন। জনগণকে বলাই হয়েছিলো (যে), যদি আমরা ক্ষমতায় আসি তাহলে আমরা এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করবো। আজকে জনগণকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করার দায়িত্ব কি আমাদের নয়? আমরা যে ১৯-দফা কর্মসূচী দিয়েছি, সেটি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কি আমাদের নয়? সেদিন কথা দিয়েছি বলে আমরা সেই কথা রাখছি। সেই কারণেই, ১৯-দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চলছে। দলীয়করণ কর্মসূচী নয়।"

১৬৭। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখ গভীর রাতে সংসদে প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে সংসদের বিরোধী দল আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর তাঁর আগে প্রদত্ত সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে বিএনপি সরকারের প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও ব্যর্থতার দোষারোপ করে যে মন্তব্য করা হয়েছিলো তার জবাব হিসেবে কিছু তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আমি আর একটা কথা বলবো। তিনি (শেখ হাসিনা) বলেছেন (যে), বিএনপি-এর মন্ত্রীরা ব্যর্থ। তাঁরা দেশ চালাতে পারেন না। আমি নাম বলবো না, এখানেও অনেকেই আছেন। কিন্তু তাঁরা অধিক আগ্রহে বিএনপি-তে যোগদান করতে চান। কিন্তু একটি শর্ত। (সে) শর্ত হচ্ছে (যে): আমাদের যদি ঐ জায়গাটি দেয়া হয়, ঐ সুযোগটি দেয়া হয়, তাহলে আমরা বিএনপি-তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগদান করবো এবং বিএনপি তখন খুব ভাল হয়ে যাবে, কোন অনাস্থাই থাকবে না। তখন বিএনপি ছাড়া দেশের মানুষ আর কিছুই বুঝবে না এবং যাঁরা আছেন, যাঁদের কোন দল নেই, যাঁদের কোন পার্টি নেই, যাঁদের একজনের বেশী দু'জন সঙ্গী নেই, এ রকম অনেকেই রয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, এঁদেরকে বিএনপি খামও দিতে চায় না এবং এঁদেরকে নিয়ে দল ভারীও করতে চায় না। কারণ, এই পার্লামেন্টে বিএনপি-এর যোগ্য সদস্য রয়েছেন। বিএনপি তাঁদেরকে মন্ত্রী সভার সদস্য করেও শেষ করতে পারবে না। এতে পাঁচটি বছর লেগে যাবে। কাজেই, one man one party দিয়ে আমাদের দল ভারী করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই, তাঁরা আজকে নারাজ হয়ে অপপ্রচার করছেন এবং বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। আমি বলছি (যে), আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে। বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সেই অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করে প্রমাণ করে দেবে (যে), বিএনপি-এর প্রতি জনগণের কতটা আস্থা রয়েছে। একটু পরেই সেটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবো (যে), বিএনপি-এর প্রতি জনগণের কতটা আস্থা রয়েছে।"

১৬৮। ১২ই আগস্ট (১৯৯২) মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখের ভোররাতে সংসদে প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে বিরোধী দলের আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর তাঁর সমাপনী ভাষণ সমাপ্ত করেন। তাঁর ঐ ভাষণের শেষাংশে প্রধান মন্ত্রী খালেদ জিয়া বলেন, "তাই আসুন, শুধু কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, বিশৃংখলা, অরাজকতা কিংবা একে অপরকে দোষারোপ না করে সম্মিলিতভাবে আজকে আমরা এই দেশটিকে গড়ার দায়িত্ব নিই—যে দেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি, রক্ত দিয়েছি, রক্ত দিয়ে যে দেশকে স্বাধীন করেছি। কাজেই, এ দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে (যে), এই স্বাধীন দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে বসবাস করবে, গণতন্ত্র উপভোগ করবে, জনগণের প্রতি তাদের যে আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, সেই আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন তারা কাজের মধ্যে দেখতে পাবে। আজকে শুধু বিএনপিকে অপবাদ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করলে কোন লাভ হবে না, এখনও জনগণ বিভ্রান্ত নয়। আমি চ্যালেঞ্জ করছি (যে), যে কোন জায়গায় আমি (খালেদা জিয়া) চ্যালেঞ্জ করতে রাজি আছি। আমরা সেখানে যাবো, প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নয়, খালেদা হিসেবে আমি সেখানে যাবো। আপনারা মিটিং ডাকুন, আমরা দেখিয়ে দেবো (যে), জনগণ কার পেছনে আছে, কিভাবে আছে। জনগণ কাদের সমাদর করে, সেটিও আমরা প্রমাণ করে দেবো। কাজেই, বিএনপি কোন কিছুতেই ভয় পায় না। বিএনপি-এর পেছনে জনগণ রয়েছে এবং এই জনগণকে নিয়েই (এক সময়) রাজপথে ছিলাম। রাজপথ, সংসদ এবং সরকার, সব নিয়েই বিএনপি। আগামী দিনেও নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে এবং দেশের জনগণের অধিকারকে সমুন্নত রাখবে, দেশের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।" প্রধান মন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম খালেদা জিয়ার সমাপনী ভাষণের অব্যবহিত পর বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া হলে সংসদে বিএনপি-এর সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ও জামাতে ইসলামীর সহায়তায় তা নাকচ হয়ে যায়।

১৬৯। ১৫ই আগস্ট (১৯৯২) তারিখ ছিলো ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যায় আওয়ামী লীগের 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের কর্মসূচী। ঐদিন আওয়ামী লীগের পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার এবং ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) বাতিলের দাবিতে সারা দেশে পালিত হয় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সাল থেকে আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ই আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। ১৯৯২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ঐ প্রথম আওয়ামী লীগ 'জাতীয় শোক দিবসে' ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ ঘোষিত ঐ 'জাতীয় শোক দিবসে' ঢাকায় নারী-পুরুষ ও বালক-কিশোর-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজার হাজার নেতা-কর্মী, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী, ভক্ত ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ব্যক্তি ও জনসাধারণ অতি প্রত্যূষ থেকে দুপুর পর্যন্ত বানানী কবরস্থানে গিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর), সড়কস্থ বাস ভবনে এবং অপর দুটো বাড়িতে প্রায় একই সময়ে নিহত (১) বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (রেণু), (২) বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসের, (৩) বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, (৪) শেখ কামালের নববিবাহিতা ও সে সময়ে অন্তঃসত্ত্বা পত্নী সুলতানা কামাল (খুকী), (৫) বঙ্গবন্ধুর মেজো পুত্র শেখ জামাল, (৬) শেখ জামালের নববিবাহিতা পত্নী পারভীন জামাল (রোজী), (৭) বঙ্গবন্ধুর ১০ বছর বয়স্ক সর্বকনিষ্ঠ ও শেষ সন্তান শেখ রাসেল, (৮) সে রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভনে কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক ডিএসপি, (৯) বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন জামাই ও তাঁর মন্ত্রীপরিষদের সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত, (১০) আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ১৪ বছর বয়স্কা কন্যা মিস বেবী, (১১) তাঁর ১২ বছর বয়স্ক পুত্র আরিফ, (১২) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ-এর ৪ বছর বয়স্ক পুত্র বাবু, (১৩) আবদুর রব সেরনিয়াবাতের একজন মধ্যবয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র, (১৪) তাঁর একজন কিশোর ভাগিনা নান্টু, (১৫) তাঁর বাসায় সে রাতে অবস্থানরত ৩ জন অতিথি, (১৬) তাঁর বাসায় কর্মরত ৪ জন কাজের পুরুষ-মহিলা, (১৭) তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল জামিল, (১৮) বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা ও তৎকালীন 'বাকশালে'র অন্যতম সেক্রেটারী ও দৈনিক 'বাংলার বাণী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি এবং (১৯) শেখ মণির সে সময়ে অন্তঃসত্ত্বা পত্নী শামসুন্নেছা আরজু প্রমুখ শহীদদের কবর জেয়ারত, কবরে পুষ্পমাল্য, পুষ্পস্তবক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্পণের মাধ্যমে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আল্লাহতালার কাছে তাদের বিদেহী আত্মার জন্য মাগফেরাত কামনা করতেন। একই সাথে, নারী-পুরুষ, বালক-কিশোর-বৃদ্ধ ও রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে হাজার হাজার নেতা-কর্মী, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী, ভক্ত ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী ও সংস্কৃতিসেবী বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) সড়কস্থ বাসভবনে (বঙ্গবন্ধু ভবনে) গিয়ে সেখানে রক্ষিত তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি অর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পরম করুণাময় আল্লাহ-তা'লার কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার জন্য মাগফেরাত কামনা করতেন। তাছাড়া, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নিহত সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ঐদিন ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের অন্যান্য শহরের প্রায় প্রতিটি মহল্লায় এবং প্রায় প্রতিটি থানার উপশহরে ও গ্রামাঞ্চলে কাংগালী ভোজ ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হতো। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১৯৯২ সালের ১৫ই আগস্টে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দেয়ায় 'জাতীয় শোক দিবসে' ইতিপূর্বে প্রতি বছর পালিত উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ অনেকাংশে বিঘ্নিত ও ব্যাহত হয়। অত্যন্ত বিস্ময়কর ও পরিতাপের বিষয় যে, জনগণের সার্বজনীন ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার অতীতের লেঃ জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারগুলোর মতো বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় বেতার-টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণপ্রচার মাধ্যমকে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি দেয়নি।

১৭০। ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৫/০৯/৯২ তারিখের সরকারী গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' শিরোনামে এক অধ্যাদেশ জারি করেন। নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ, ১৯৯২, ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখ হতে কার্যকর ও বলবৎ করা হয়। ঐ অধ্যাদেশ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই, বিএনপি বাদে, বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী, সমাজসেবী, বিএনপি-এর অংগ ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া, অন্যান্য সকল ছাত্র-শিক্ষক সংগঠন ঐ অধ্যাদেশ জারির তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "বিরোধী দলকে দমন করার জন্যই ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জারি করেছে।" আন্তরিকতা থাকলে দেশের প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব বলে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, যদি আমার হুকুম পালিত হতো, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে দেশে সন্ত্রাস দমন করতে পারতাম।" ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে ৫ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় স্টীয়ারিং কমিটির এক বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "সন্ত্রাস দমনে সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। সকল প্রকার কালাকানুন প্রত্যাহার করে এই সদিচ্ছার প্রমাণ দেয়াই ছিলো ক্ষমতাসীন বিএনপি-এর স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গীকার। কিন্তু বিএনপি সরকার সে অঙ্গীকার পূরণ না করে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের লালন করেছে। এখন অভ্যন্তরীণ দলীয় সন্ত্রাস নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করায় নিজেদের সমস্ত দায়িত্ব জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে জাতীয় সংসদকে এড়িয়ে এক জঘন্য আইন জারির অপচেষ্টা করছে। এ ধরনের আইন কোনমতেই দেশবাসী মেনে নিতে রাজি নয়।"

১৭১। ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশকে 'নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশ' হিসেবে অভিহিত করে বলা হয় "যেখানে প্রচলিত আইনেই অপরাধ ও সন্ত্রাস দমন সম্ভব, সেখানে জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের বিশেষ অধ্যাদেশ জারির অর্থ হচ্ছে 'বিশেষ ক্ষমতা আইনে'র চেয়েও নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশের অক্টোপাশে দেশ ও জাতিকে আবদ্ধ করা। সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে দমন ও নিপীড়ন চালিয়ে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, পেশাজীবী মানুষের ন্যায্য আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার লক্ষ্যেই এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে দুর্নীতি ও ক্ষমতাসীন দলের তাঁবেদারি থেকে মুক্ত করা গেলেই প্রচলিত ফৌজদারী আইনে সন্ত্রাস দমন সম্ভব।" জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)-এর স্থায়ী কমিটির মহাসচিব আ.স.ম. আবদুর রব ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে এক বিবৃতিতে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশকে 'কালাকানুন' বলে অভিহিত করে বলেন, "যথাযথ আইনের প্রয়োগ না করে কালাকানুন প্রণয়নের উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা।" ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলীর এক যৌথ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ জারি থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের মুলতবি সভা বিকেল ৪ ঘটিকায় ঢাকার মিন্টো রোডস্থ দলীয় সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাষ্ট্রীয় বাসভবনে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় দলের ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত দলের গঠনতন্ত্র উপপরিষদের বিভিন্ন সুপারিশমালা, দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক বিষয়াদি এবং বিশেষ করে, বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। ঐ সভায় 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২) জারির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "এ অধ্যাদেশটি দেশকে আরও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেবে। হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের জন্য এ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে।" আওয়ামী লীগের ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আরও বলা হয়, "(সংসদের) চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে শীতকালীন অধিবেশনে জাতীয় সংসদ হতে প্রত্যাখ্যাত 'সন্ত্রাস দমন' বিলটি সংসদীয় কমিটিতে বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায়ই ভিন্ন নামে পুনরায় 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ নামে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন শাসকদল (বিএনপি) জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে যে অধ্যাদেশ অনুমোদন করেছে, তা দেশের সংবিধান ও সংসদীয় রীতিনীতির পরিপন্থী। উক্ত অধ্যাদেশটিতে এমন কিছু বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মৌলিক মানবাধিকারসহ আইনের আশ্রয় লাভের বিশ্বজনস্বীকৃত অধিকারকে পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ক্রমবর্ধমান অপরাধ দমনে দেশের প্রচলিত আইন ও সরকারের দল-নিরপেক্ষ কার্যক্রম ও সদিচ্ছাই যথেষ্ট। আইনের আশ্রয় লাভের ও মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী, সংসদীয় রীতিনীতি বিরোধী, সংসদকে অকার্যকর ও অবমাননা করার এই সরকারী হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণকে সোচ্চার হওয়ার জন্য সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।"

১৭২। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।" ঐ অধ্যাদেশের ২ নম্বর ধারার সংজ্ঞা (৩)-এ নৈরাজ্যমূলক অপরাধের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, "নৈরাজ্যমূলক অপরাধ অর্থঃ (ক) কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা বেআইনী বল প্রয়োগ করিয়া (অ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোনো নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করা, (আ) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা কোনো যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা; (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো যানবাহনের ক্ষতি সাধন করা; (গ) ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, আইনের অধীন গঠিত, স্থাপিত বা সৃষ্ট কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো কোম্পানী, ফার্ম বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোনো দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাবর বা অস্থাবর যে কোনো সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা; (ঘ) কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিসপত্র বা অন্য কোন বস্তু বা যানবাহন ছিনতাই করা বা জোরপূর্বক কাড়িয়া লওয়া; (ঙ) রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশেপাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো স্থানে কোনো বালিকা, কিশোরী ও তরুণীসহ যে কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে উত্যক্ত বা হয়রানি করা; (চ) কোনো স্থানে, বাড়িতে, দোকানে, হাটে-বাজারে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন করিয়া ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃঙ্খলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা; (ছ) কোনো প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়ে, গ্রহণে বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাহারও দরপত্র গ্রহণে বিধিবহির্ভূতভাবে বাধ্য করা।"

১৭৩। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৪ নম্বর ধারায় 'নৈরার্জ্যমূলক অপরাধের শাস্তি' শিরোনামে বলা হয়ঃ "কোনো ব্যক্তি কোনো নৈরাজ্যমূলক অপরাধ করিলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি, অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।" 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৫ নম্বর ধারায় 'অপরাধ সংঘটনে সহায়তার শাস্তি' শিরোনামে বলা হয়ঃ "কোনো ব্যক্তি কোনো নৈরাজ্যমূলক অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিলে তিনি ধারা ৪-এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।" 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৬ নম্বর ধারায় 'অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী বা তদ্বারা সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বিধান' শিরোনামে বলা হয়ঃ "ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহৃত কোনো দ্রব্যসামগ্রী বা উক্ত অপরাধের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ রাষ্ট্রের অনকূলে বাজেয়াপ্তির বা উহার বৈধ মালিক বা দখলদারের নিকট ফেরত দিবার আদেশ দিতে পারিবে।"

১৭৪। 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৭ নম্বর ধারায় 'অপরাধের বিচার' শিরোনামে বলা হয়ঃ "অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহাই থাকুক না কেন, এ অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ কেবল ধারা ৮-এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।" 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৮ নম্বর ধারায় 'নৈরাজ্য-মূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন' শিরোনামে বলা হয়ঃ "(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রত্যেকটি জেলায় এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে, যাহা 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে অভিহিত হইবে। (২) প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে একজন করিয়া বিচারক থাকিবেন এবং কেবল একজন চাকুরীরত বা অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজ এই ট্রাইব্যুনালে বিচারক হইবার যোগ্য হইবেন। (৩) ট্রাইব্যুনালের বিচারক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (৪) সরকার প্রয়োজনবোধে একজন সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজকে তাঁহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে কোনো ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (৫) কোনো জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইলে, সরকার সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালের এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে। (৬) প্রত্যেক ট্রাইব্যুনাল জেলা সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে উহা অন্য কোনো স্থানেও বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।"

১৭৫।'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ১৩ নম্বর ধারায় 'আপীল' শিরোনামে বলা হয় ঃ "ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ বা খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ধারা ১৪-এর অধীন স্থাপিত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনালে' আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ১৪ নম্বর ধারায় 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনাল' শিরোনামে বলা হয়ঃ "(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিবে, যাহা 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনাল' নামে অভিহিত হইবে। (২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন এইরূপ দুই ব্যক্তি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এইরূপ একজন কর্মরত জেলা জজ সমন্বয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং তাঁহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (৩) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন আপীল ট্রাইব্যুনালের এমন সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে সরকার উহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন। (৪) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারী আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারে এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, আপীল ট্রাইব্যুনালও, যতদূর সম্ভব, এই অধ্যাদেশের অধীন আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে সেই একইরূপ ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। (৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বতঃই কোন ট্রাইব্যুনাল হইতে কোনো মামলা অন্য কোনো ট্রাইব্যুনালে ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্থানান্তর করিতে পারিবে। (৬) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭৬। 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ১৫ নম্বর ধারায় 'অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা এবং অজামিনযোগ্যতা' শিরোনামে বলা হয়ঃ "(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) হইবে। (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো আদালত তদন্ত পর্যায়ে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পারিবে না।"

১৭৭। 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৯ নম্বর ধারায় 'ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার' শিরোনামে বলা হয়ঃ "(১) সাব-ইন্সপেক্টর মর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোনো ট্রাইব্যুনাল কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না। (২) যদি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই অধ্যাদেশের অপরাধের সহিত একই সঙ্গে বা একই মামলায় ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে। (৩) যে ট্রাইব্যুনালের এলাকায় এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ বা উহার কোনো অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যে ট্রাইব্যুনালের এলাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বা একাধিক অভিযুক্তদের মধ্যে তাহাদের যে কোনো একজনকে পাওয়া যায়, সেই ট্রাইব্যুনালে উক্ত অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। (৪) ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনবোধে উহার নিকট বিচারাধীন কোনো মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনধিক পনের দিনের সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে। এই উপধারার অধীনে অধিকতর তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়সীমা ধারা ১৬(৩)-এ উল্লিখিত সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৫) ট্রাইব্যুনাল এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি এবং উপ-ধারা (২)-তে উল্লিখিত অন্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। (৬) যদি ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৫)-এর অধীন মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করে এবং অনুরূপ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোনো আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে মৃত্যু দণ্ডাদেশ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার জন্য, ট্রাইব্যুনাল, মামলার নথিপত্র আপীল দায়েরের তারিখ অতিবাহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আপীল ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর হইবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭৮। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশের শেষ ধারা ১৬ নম্বর ধারায় 'ফৌজদারী কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure, 1898 : Act V of 1898)' শিরোনামে বলা হয়ঃ "(১) এই অধ্যাদেশে ভিন্নতর কোনে কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, উহার বিচার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং ট্রাইব্যুনাল একটি সেশনস আদালত বলিয়া গণ্য হইবে। (২) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত, তৎসম্পর্কে এজাহার প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না যায়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালের অনুমোদনক্রমে এই তদন্ত অতিরিক্ত ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। (৩) ট্রাইব্যুনাল কোনো মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করার তারিখ হইতে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে উহার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিবে, তবে শর্ত থাকে, যদি কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা না যায়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধক্রমে অতিরিক্ত ৩০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।"

১৭৯। ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চত্বরে সুদীর্ঘ ৫ বছর ৮ মাস পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দু'দিনের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর লিখিত ১ ঘন্টা ১ মিনিট ধরে ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে ঐ অধিবেশনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ঐ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষা এবং (১৯৭১-এর) মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বর্তমান নব্য স্বৈরাচারী' (বিএনপি) শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান। ঐ ভাষণে তিনি সে সময়ে দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন এবং আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের প্রতি নির্দেশ দেন, "শিল্পাঞ্চলে, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে, সন্ত্রাস দমনে এবং দেশের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্ত প্রতিরোধে সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

১৮০। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের উদ্বোধনী ও প্রধান অতিথির ভাষণের গোড়ার দিকে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে স্বাধীনতা ও সমাজ প্রগতির শত্রুরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে (১৯৭১-এর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ ও (দেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত) রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে ধ্বংস করেছে। স্বাধীনতার ধারাকে উল্টে দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার ধারায় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও স্বনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে বিদেশনির্ভরশীলতা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আমাদের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত বিপন্ন। সাম্প্রদায়িক শক্তির হিংস্র আগ্রাসন ও নিষ্ঠুরতা বাংলাদেশে নব শক্তিতে ও মাত্রায় উজ্জীবিত। তাদের সঙ্গে বর্তমান (বিএনপি) শাসকগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ন্যক্কারজনক নীতিবিবর্জিত আঁতাত সমগ্র বাঙালী জাতিকে পুনরায় শংকিত করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনর্বাসন ও সর্বব্যাপী উত্থানে ১৯৭১ ও ১৯৭৫-এর ঘাতকরা আজ একই মঞ্চে সংগঠিত। এ অবস্থায় দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষা এবং (১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান (বিএনপি-এর নেতৃত্বাধীন) 'নব্য স্বেচ্ছাচারী' শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।"

১৮১। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কোনও প্রকার ছাড় দিতে পারে না বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "মূলত, সমগ্র দেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত—স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে আমি স্বাধীনতার পক্ষের সকল দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিসহ সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা-বিরোধী ১৯৭১ ও ১৯৭৫-এর ঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছি।"

১৮২। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় সেত্রী শেখ হাসিনা দেশের সে সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, "ক্ষমতাসীন (বিএনপি) সরকারের অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা, অব্যবস্থা ও দলীয়করণের কারণে (দেশের) আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। পরিকল্পিতভাবে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ায় সমগ্র দেশের মানুষ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। সর্বগ্রাসী নিরাপত্তাহীনতা জনজীবনকে বিপর্যস্ত ও আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। জনগণের মধ্যে নিশ্চিত সন্দেহ জন্মেছে যে, (প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি) সরকারই সন্ত্রাসের লালন-পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে।" তারপর, শেখ হাসিনা আরও বলেন, "বিগত দেড় বছরের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের অঙ্গীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত) তিন (৮, ৭ ও ৫ দলীয়) জোটের রূপরেখার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র বাসনা ও চক্রান্তের পরিণতিতে বর্তমান (বিএনপি) সরকার স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র (বিএনপি) সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়-মদদে শুধু দেশপ্রেমিক নেতা-কর্মী ও ব্যক্তিবর্গের জীবন নাশের হুমকি দিয়েই বেড়াচ্ছে না, গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েও চলছে।"

১৮৩। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে জনগণের স্বার্থরক্ষা ও গণমানুষের আকাংক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রাম-আন্দোলনে দলের সুদীর্ঘ চার দশকের ভূমিকা বর্ণনা করে শেখ হাসিনা বলেন, "বাঙালী জাতির হাজার বছরের কাংক্ষিত স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সমগ্র জীবনের শ্রম, মেধা ও সাধনা দিয়ে তৃণমূল পর্যায় হতে আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবল (১৯৭১ সালের) ৯ মাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়নি। এই স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের সংগ্রামের মাধ্যমে পটভূমি তৈরি করতে হয়েছিলো। বাঙালী জাতিকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে।" তারপর, ১৯৭১ সালের মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ (১৯৭১)-এর ভাষণে জনগণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির যে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিলো জনগণ ও বাঙালী সেনা অফিসারদের কাছে স্বাধীনতার গ্রীন সিগন্যাল। ২৫শে মার্চ (১৯৭১)-এর কালো রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী জনগণের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে, নেতৃত্বে ও নির্দেশে বাংলার জনগণ মরণপণ লড়াই করে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা।"

১৮৪। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের আর এক পর্যায়ে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, "স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে বঙ্গবন্ধু জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পঁচাত্তরের (১৯৭৫-এর) ১৫ই আগস্ট জাতির জনককে হত্যা করে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে। সূচিত হয় হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের ধারা।" সে প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পথ ধরে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল জিয়া। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন জেনারেল এরশাদ।" তারপর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে আন্দোলন-সংগ্রাম প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের মাত্র একদিন পর ২৬শে মার্চ (১৯৮২) মহান স্বাধীনতা দিবসে আমরাই (সাভারস্থ) জাতীয় স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিলাম। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম।"

১৮৫। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের আর এক পর্যায়ে ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে দলের অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সেদিন আমরা নির্বাচনে গিয়েছিলাম স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের অংশ হিসেবে সাংবিধানিক ধারায় স্বৈরশাসক এরশাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মোকাবেলা করার লক্ষ্যে।" সে প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "যারা বলে থাকে ছিয়াশির (১৯৮৬-এর) নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ না নিলে এরশাদের পতন হতো, তাদের কাছে প্রশ্নঃ আটাশির (১৯৮৮-এর) (চতুর্থ) সংসদ নির্বাচনে তিন (৮, ৭ ও ৫ দলীয়) জোট অংশগ্রহণ না করার পরেও কেন এরশাদের পতন ঘটেনি?" সে প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম (যে), বাংলার মাটিতে যেন আর সংবিধান বহির্ভূতভাবে ক্ষমতার হাতবদল না ঘটে। সেই লক্ষ্যে সাতাশির (১৯৮৭-এর) জাতীয় কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ স্বৈরশাসন উৎখাতের ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করে। নব্বইয়ের (১৯৯০-এর) ৬ই নভেম্বর স্বৈরাচারের সকল বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে (ঢাকা শহরের) পান্থপথের জনসভায় জনগণের পক্ষ থেকে আমি সংবিধানের ৫১ ও ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা ঘোষণা করি। সেই রূপরেখা অনুযায়ী এরশাদ ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৯০) পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন এবং ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯০) পদত্যাগ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।"

১৮৬। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের আর এক পর্যায়ে ১৯৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "একানব্বইয়ের (১৯৯১-এর) সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের ৩৮ শতাংশ পেয়েও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারেনি। বিএনপি মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে জামাতের সাথে হাত মিলিয়ে আজ ক্ষমতাসীন।" তারপর, শেখ হাসিনা আরও বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবিরের অশুভ আঁতাত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমঝোতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের ওপর এক বিরাট আঘাতস্বরূপ। বর্তমান সরকার স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। তাই জামাতে ইসলামী (সে সময়ে) পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে সাংবিধানিক ধারা লংঘন করে সংগঠনের (জামাতে ইসলামীর) প্রধান (আমীর) বানানোর ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে।" তারপর, (১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত) গণআদালত কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের রায় বাস্তবায়নের জন্য (বিএনপি) সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্য (যে), সরকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ের প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখাননি। যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার প্রসঙ্গে সরকার জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, দুঃখের বিষয় সে চুক্তি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা হয়নি। সরকার (ঐ) চুক্তি কার্যকর না করে জনমতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন।"

১৮৭। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের অপর এক পর্যায়ে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির বিষয়ে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে আমরা (বিএনপি) সরকারকে সহযোগিতা করতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু (বিএনপি) সরকার আমাদের সহযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।" তারপর, শেখ হাসিনা ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ও সাংবাদিকদের ওপর পুলিশ বাহিনীর হামলা সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র কর্তৃক দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক নেতাদের তালিকা প্রণয়ন ও হত্যার হুমকি প্রদান সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ না করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১৮৮। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের কতিপয় অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত আচার-আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের প্রেক্ষিতে জাতি আশা করেছিলো (যে), স্বৈরাচারী বিধি ও ব্যবস্থার অবসান হবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু জাতি গভীর শংকার সাথে লক্ষ্য করছে (যে), আজ প্রকৃত সংসদীয় (মন্ত্রীপরিষদভিত্তিক) সরকার পদ্ধতি ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার পরিবর্তে প্রশাসন দলীয়করণ ও দখলীকরণ করা হচ্ছে। স্বৈরাচারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না করে তাকেই নব্য স্বৈরাচারের আভরণে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে।" তারপর, তিনি আরও বলেন, "সরকার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা না করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণকারী '(নৈরাজ্যমূলক) অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ জারি করেছেন। এই অধ্যাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত ২৬, ২৭, ৩৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।" ঐ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিরোধী দলের ওপর দমননীতি চালানোর চক্রান্তও চলবে বলে শেখ হাসিনা আশংকা প্রকাশ করেন।

১৮৯। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের আর এক পর্যায়ে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সংসদীয় গণতন্ত্রকে অর্থবহ ও কার্যকর করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, পঁচাত্তরের (১৯৭৫-এর) আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচারের মাধ্যমে হত্যা-ক্যু-চক্রান্তের রাজনীতির চিরঅবসানের জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল ও স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির কালো থাবা থেকে দেশ, জাতি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" তারপর, শেখ হাসিনা আরও বলেন, "জাতীয় আকাংক্ষা ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে দলের ঘোষণাপত্র যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে। গণতন্ত্রের চর্চা, অনুশীলন ও জবাবদিহিতার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে দলের সাংগঠনিক কাঠামো (বর্তমান বাস্তবতা ও চাহিদা মোকাবেলা করার) ও কার্যক্রম (সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে) পরিচালনার লক্ষ্যেই এই সংশোধনী।" শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, "এই কাউন্সিলের পর পরই তৃণমূল পর্যায়ে দলের সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।" আওয়ামী লীগের ঐ দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জনগণকে সাথে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন এবং দলীয় ঐ দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মে লনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১৯০। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ ৫ বছর ৮ মাস পর অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো নানান কারণে। বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, থানা, শহর, প্রধান নগর, মহানগর ও রাজধানী ঢাকার প্রতিটি ওয়ার্ড-মহল্লা থেকে প্রায় ৩ হাজার কাউন্সিলর ও ১০ হাজার ডেলিগেট আওয়ামী লীগের ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বব্যাপারে সর্বময় ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কাউন্সিলের উক্ত সম্মেলনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনার জন্য অন্যান্য বিষয়সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলোঃ (১) আওয়ামী লীগের দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, থানা, শহর, প্রধান নগর, মহানগর, রাজধানী ঢাকার শাখা কমিটিসহ কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ বছর ৮ মাসের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা; (২) ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ও তদারকিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার ৮ দলীয় জোটের অংগদলগুলোর প্রাপ্ত ভোট বাদ দিয়ে এককভাবে বিএনপি-এর প্রায় সমান ৩১ শতাংশ সাধারণ ভোট পেয়েও সে দলের ১৪০টি আসনের তুলনায় মাত্র ৯০টি আসন পাওয়ার কারণ, রহস্য, তথ্য ও মাজেজাদি অনুসন্ধান, উদ্ঘাটন ও চিহ্নিত করা এবং তা পর্যালোচনা ও পুনঃরীক্ষণ করা; (৩) বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুবীক্ষণ, বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনা করার মাধ্যমে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কৌশল নির্ধারণ করা; (৪) দলের ঘোষণাপত্র সংশোধন ও অনুমোদন করা; (৫) ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত দলের সংশোধিত ও পরিমার্জিত অর্থনীতি আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুমোদন করা; (৬) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আনীত দলের গঠনতন্ত্রের কতিপয় সংশোধনী আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুমোদন করা এবং সর্বোপরি, (৭) দলের প্রেসিডিয়ামসহ কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নির্বাচিত করা।

১৯১। উপরোল্লিখিত ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা করা দীর্ঘ ব্যবধানে অনুষ্ঠিত মাত্র দু'দিনের কাউন্সিল সম্মেলনে আদৌও সম্ভব ছিলো কিনা সে সম্পর্কে দলের একজন অতি সাধারণ কর্মীও বলে দিতে পারতেন। তাঁর জন্য দলের নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মোটেই প্রয়োজন হতো না। অতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্বলিত আলোচ্যসূচী যে মাত্র দু'দিনে সমাপ্ত করা সম্ভব ছিলো না, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উপরোল্লিখিত ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ১ নম্বর বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন-বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হয়েছে দলের ৬৪টি জেলা শাখার মধ্যে দলের নেতৃত্ব বা তথাকথিত 'হাইকমাণ্ড' কর্তৃক পূর্বপরিকল্পনা বা দুরভিসন্ধি মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত মাত্র সীমিত কয়েকজন বশংবদ সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদককে। অবশ্য, আরও কয়েকজন জেলা সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক স্বপ্রণোদিত হয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন দলের সভানেত্রী (যিনি নিজেই ঐ কাউন্সিল সম্মেলনের সাধারণ আলোচনা অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করছিলেন)-এর অনুমতিক্রমে। কিন্তু অধিকাংশ বক্তার ক্ষেত্রেই বক্তব্য শুরু করার মাত্র কয়েক মিনিট পর অর্থাৎ বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে না দিয়েই আকস্মিকভাবে সভানেত্রীর অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ও নির্দেশে তাঁদের বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আরও অনেক বক্তা সভানেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বক্তব্য রাখার অনুমতি পাননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২। ১৯৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে চরম ব্যর্থতা ও পরাজয়ের পর ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলনের সাধারণ আলোচনা অধিবেশনে যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পাওয়া উচিত ও যুক্তিযুক্ত ছিলো অর্থাৎ উপরোল্লিখিত ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ২ নম্বর বিষয়টি, কোন এক অজ্ঞাত ও রহস্যজনক কারণে তা আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি, দলের সভানেত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে সে সম্পর্কে আলোচনা বা আলোচনার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করার অনুমতি কাউকেই দেয়া হয়নি। উপরোল্লিখিত ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ৩ নম্বর বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিলো কেবল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার দলীয় ঐ দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ এবং দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা ও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরীর দলের কেন্দ্রীয় কমিটি (বা সংসদ)-এর ৫ বছর ৮ মাসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অনভিপ্রেত ও যন্ত্রণাদায়ক অতি দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশের মধ্যে। কাউন্সিল সম্মেলনের সাধারণ আলোচনা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে দলের প্রস্তাবিত সংশোধিত 'ঘোষণাপত্র' কেবল পাঠ করেই তার ওপর কোনরূপ আলোচনা করার বা সংশোধনী আনার কোনও অনুমতি বা সময় না দিয়েই তার ব্যাপারে উপস্থিত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের অনুমোদন চাওয়া হয়। আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল সম্মেলনে উপস্থিত কাউন্সিলর-ডেলিগেটরা রাজনীতি সম্পর্কে এতো বেশী জ্ঞানী, বিদগ্ধ, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী যে, তাঁরা কোনরূপ আলোচনা কিংবা তার ওপর কোনও পরিমার্জন অথবা আরও কিছু সংশোধনের প্রস্তাব না করেই দলীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তথাকথিত 'হাইকমান্ড' কর্তৃক সংশোধিত এবং অধিবেশনে উপস্থাপিত দলীয় ঐ 'ঘোষণাপত্র' নির্বাকে ও নির্দ্বিধায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেন।

১৯৩। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের সাধারণ আলোচনার জন্য নির্ধারিত অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে দলের বহুল প্রচারিত তথাকথিত সংশোধিত নতুন অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাঠ করে শোনানো হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দলের নীতি সম্পর্কিত এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও আলোচনা-পর্যালোচনা করার কোনরূপ অনুমতি কিংবা সুযোগই দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তথাকথিত 'হাইকমান্ডে'র নির্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটি (বা সংসদ)-এর কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত বহুল প্রচারিত ঐ তথাকথিত সংশোধিত দলের নতুন অর্থনীতিমালা দলের সর্বময় ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী দলীয় কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকেই ইতিপূর্বে ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা ও পাঠ করে শোনানো হয়েছিলো এবং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপি সে সময় উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দসহ সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সম্ভবত হয়তো বা সে কারণেই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তথাকথিত 'হাইকমান্ড' দলের কাউন্সিল সম্মেলনের উক্ত অধিবেশনে সে সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে দেননি কিংবা সে সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা-পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা ছিলো বলে মনে বা অনুভব করেন নি।

১৯৪। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের সাধারণ আলোচনার জন্য নির্ধারিত অধিবেশনের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বা তথাকথিত 'হাইকমাণ্ডে'র পরামর্শ-নির্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটি (বা সংসদ) কর্তৃক অনুমোদিত দলের গঠনতন্ত্রের কতিপয় সংশোধনী। ঐসব সংশোধনীর মাধ্যমে দলেরঃ (ক) কেন্দ্রীয় কমিটি (বা সংসদ)-এর সম্পাদক-মণ্ডলীর প্রতিটি বিষয়ক সম্পাদকের সহায়তাকারী হিসেবে 'সহকারী সম্পাদকে'র পদ সৃষ্টি; (খ) প্রতিজন সম্পাদকের বিষয় সম্পর্কিত 'উপকমিটি' গঠন; (গ) কেন্দ্রীয় কমিটি (বা সংসদ)-সহ প্রতিটি শাখা কমিটি (বা সংসদ)-এর সভাপতিকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ-পরামর্শ প্রদানে নির্দিষ্ট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, সংস্কৃতি-সমাজকর্মী ও আইনজ্ঞসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমন্বয়ে 'উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটি' গঠন; (ঘ) দলের তথাকথিত 'হাইকমান্ডে'র ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পূরণে দলের সভাপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়ামের কার্যপরিধি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে সংকুচিত ও খর্ব করে তার যাবতীয় ক্ষমতা দলের চেয়ারপারসন (সভাপতি বা সভনেত্রী)-এর ওপর ন্যস্তকরণ এবং (ঙ) দু'বছরের পরিবর্তে তিন বছর অন্তর অন্তর দলের কাউন্সিল সম্মেলন আয়োজন এবং বিভিন্ন কমিটি ও কার্যনির্বাহী সংসদের মেয়াদকাল সে অনুযায়ী বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি। উপরোল্লিখিত (ক), (খ) ও (গ) প্রস্তাব তিনটি বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটি' গুলোর সদস্যদের সংখ্যা কেন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখা হলো তা বোধগম্য নয়। উপরোল্লিখিত (ঘ) প্রস্তাবটি অর্থাৎ দলের ১২ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলীর যাবতীয় ক্ষমতা কেবল এক ব্যক্তি অর্থাৎ দলের সভাপতি বা সভানেত্রীর ওপর অর্পণ করা শুধু আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং যৌথ বা সম্মিলিত নেতৃত্ব প্রদান সম্পর্কিত ঐতিহ্য ও ইতিহাসের লংঘনই নয়, তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পরিপন্থী ও স্বৈরতন্ত্রীও বটে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আওয়ামী লীগের ১৯৮১ সালের গঠনতন্ত্রের ঐ পাঁচটি সংশোধনী [১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত] দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের সাধারণ আলোচনার জন্য নির্ধারিত অধিবেশনে কোনরূপ আলোচনা-অনুবীক্ষণ ব্যতিরেকেই প্রায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রস্তাবসমূহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লিখিত অধিবেশনে উপস্থিত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় দু'একজন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সকল ক্ষমতা দলের সভাপতি বা সভানেত্রীর ওপর ন্যস্ত ও কেন্দ্রীভূতকরণের প্রস্তাবের ব্যাপারে আপত্তি ওঠালে, তা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কতিপয় নেতার ধমকানিতে এবং অন্যান্য কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের সরব কিংবা মৌন সমর্থনে প্রত্যাখ্যাত হয়। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সকল ক্ষমতা দলের সভাপতি বা সভনেত্রীর ওপর ন্যস্ত ও কেন্দ্রীভূতকরণের ঐ প্রস্তাব কেবল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সে সমস্ত বশংবদ কেন্দ্রীয় নেতা, উপনেতা, পাতিনেতা এবং বিভিন্ন জেলা-শাখা কমিটির নেতা, উপনেতা ও পাতিনেতার অন্ধ বিশ্বাস যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অমর ও অনন্তকাল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থাকবেন, যেমনটি তাঁরা ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কোনও আলোচনা-আপত্তি ব্যতিরেকেই দেশের সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ও রাষ্ট্রপতিকে সুদূরপ্রসারী ও একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান এবং দেশে একদলীয় রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বঙ্গবন্ধুকে চিরঞ্জীব ব্যক্তি ও আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে পাবেন বলে ভেবেছিলেন এবং সে কল্পনা-বিলাস ও স্বপ্নে বিভোরও ছিলেন।

১৯৫। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ছিলো দলের কেন্দ্রীয় (কার্যনির্বাহী) কমিটি (বা সংসদ)-এর কর্মকর্তা ও সদস্যদের নির্বাচন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯৮১ সালের গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর দলের সর্বময় ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী দলের কাউন্সিল সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় (কার্যনির্বাহী) কমিটি (বা সংসদ)-সহ অন্য সকল কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ১৯৯২ সালের ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুদীর্ঘ ৫ বছর ৮ মাস পর। ১৯৮৭ সাল থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ১৯৯১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ও তদারকিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদের সাধারণ নির্বাচনে ব্যস্ততার কারণে দলীয় গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক যথাসময়ে দলের কাউন্সিল সম্মেলন আয়োজনে অপারগতা ও ব্যর্থতার জন্য দলের নেতৃত্ব দুঃখ প্রকাশ করেন। সম্ভবত, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অনিয়ম ও সংবিধান লংঘন পরিহার করা যায়, তার জন্য আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রতি দু'বছরের পরিবর্তে তিন বছর অন্তর অন্তর দলের কাউন্সিল সম্মেলন ও বিভিন্ন কমিটি ও সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন (যুক্তরাজ্য)-সহ পাশ্চাত্যের দেশগুলোয় রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় সম্মেলন ও নির্বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, সেসব দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতন ও দায়িত্বশীল জনগণ গণতন্ত্রের রীতিনীতির প্রতি অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ও অংগীকারাবদ্ধ। তাই, সুদীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের অজুহাতে দলের গঠনতন্ত্রের বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে দলের কাউন্সিল দু'বছরের পরিবর্তে ৫ বছর ৮ মাস পর আয়োজন করা শুধু অমার্জনীয় ব্যর্থতা-অপরাধই নয়, তা দলের নেতৃত্বের খামখেয়ালিপনা, দায়িত্ব-হীনতা, গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী এবং সর্বোপরি, স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও দৃষ্টিভংগীর পরিচায়ক ও বহিঃপ্রকাশও বটে।

১৯৬। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলনের শেষ দিনের (অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখ) গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হয় দলের নির্বাচন অধিবেশন। ঐদিন মধ্যরাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনাকে তৃতীয়বারের মতো পুনঃনির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করা হলে, তা উপস্থিত দলীয় কাউন্সিলর ও ডেলিগেট-বৃন্দ সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেন। তারপর, তাঁরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় (কার্যনির্বাহী) কমিটি (বা সংসদ)-এর সাধারণ সম্পাদকসহ সভাপতি-মণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ও সদস্যদের পদসমূহে মনোনীত করার নিঃশর্ত ও সম্পূর্ণ একচ্ছত্র এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পণ করেন দলীয় সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর। রাত সাড়ে তিনটা অর্থাৎ ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখ ভোররাত সাড়ে তিন ঘটিকা পর্যন্ত দলের জেলা, নগর, মহানগর কমিটিগুলোর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতার সংগে পৃথক পৃথকভাবে একান্তে আলোচনা-পরামর্শের পর শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা ও তাঁর নিকট আত্মীয় এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমানকে তিন বছরের জন্য আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করার ঘোষণা দেন। তাছাড়াও, শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি-মণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সদস্যের পদসমূহে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দমত মনোনীত নেতাদের নামও ঘোষণা করেন। সেসব নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক এবং অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সম্মেলন।

১৯৭। ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলন শেষে গণতন্ত্রমনা, দলের নীরব সমর্থক, বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী, বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং দেশের স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধে গর্বিত ও ১৯৭১-এর মুক্তি-স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধে উজ্জীবিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন সকল বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী মহল-সংগঠনের সদস্যদের মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে। ঐ কাউন্সিল সম্মেলন, আয়োজন, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, দলের শৃঙ্খলা ও শক্তি প্রদর্শন ইত্যাদির দিক দিয়ে যে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু দলের কাউন্সিল সম্মেলনের যে মূল উদ্দেশ্য, যথা: জাতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং দলের সাংগঠনিক, গঠনতান্ত্রিক ও বিভিন্ন কমিটি-সংসদের কর্মকর্তা-সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপর বিস্তারিত গণতন্ত্রের রীতিনীতিসম্মতভাবে খোলামেলা আলোচনা-পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ-অণুবীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রস্তাব পাসের ব্যাপারে কোনও অনুকরণ-অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল সম্মেলনে। তার ফলে, আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল সম্মেলন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে, দলের প্রধান নেতৃত্বের দলের গঠনতন্ত্র আরোপিত এক দায়সারা ও লোক দেখানো প্রহসনমূলক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সেসব ঘটনা যদি সংসদের ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ও অন্যতম উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিনিধিত্বকারী দল জাতীয় পার্টির বেলায় ঘটতো, তাহলে মোটেই কিছু বলার থাকতো না। কারণ, এই দুটো দলের প্রায় সকল ক্ষমতা ও সর্বব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব কেবল একক ব্যক্তি দলের চেয়ারম্যান বা চেয়ারপারসনের হাতে সর্বতো ও সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত। দলীয় গঠনতন্ত্রে এই দুটো দলের কেবল দল প্রধান নির্বাচনের বিধিবিধান রয়েছে। তারপর, এই দল দুটোর চেয়ারপারসন, এককভাবে দলের স্থায়ী কমিটি, কার্যনির্বাহী কমিটি, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদির কর্মকর্তা ও সদস্যদের মনোনীত করেন। তাছাড়াও, এই দুটো দলের চেয়ারপারসনের দলের অন্যান্য অংগসংগঠনের, যথা: ছাত্র, যুব, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা ইত্যাদি বিষয়ক সংগঠনের কর্মকর্তা-সদস্যদের নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমতো নিযুক্ত করার গঠনতান্ত্রিক ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং, এই দুটো দল মূলত স্বৈরতন্ত্রী। কিন্তু, গণতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লীগপ্রধান সভাপতি বা সভানেত্রীকে যদি বিএনপি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারপারসনদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একচ্ছত্র ক্ষমতার ঠিক অনুরূপ ক্ষমতা গঠনতান্ত্রিকভাবে প্রদান করা হয়, তাহলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণের, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা পূরণ, অসম্ভব না হলেও, রয়ে যাবে সুদূরপরাহত। উল্লেখ্য, ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'সাধারণ আলোচনা' ও 'দলের নির্বাচন' দুটো অধিবেশন পরিচালনায় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, বিশেষ করে, দলের তথাকথিত 'হাইকমান্ডে'র স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব-আচার-আচরণ এবং দলের গঠনতন্ত্রে নির্দেশিত দিকনির্দেশনা, নিয়মনীতি ও বিধি বিধানসমূহের প্রতি অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঘটনা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুতরাং, ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত গণতন্ত্র ও ত্যাগের ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথাকথিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ঘটা উপরোল্লেখিত ঘটনা এবং সেইসব সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিরূপ ও নিন্দাসূচক মন্তব্যের কারণে তা দলের ইতিহাসে চিহ্নিত ও অভিহিত হয়ে থাকবে একটি অনভিপ্রেত কালো অধ্যায় হিসেবে।

১৯৮। ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখ ভোর রাত ৩টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৃতীয়বার সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত সভানেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এককভাবে মনোনীত দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের যে তালিকা ঘোষণা করা হয় তাতে ডক্টর কামাল হোসেন, শেখ আবদুল আজিজ, এম. মতিউর রহমান ও সালাউদ্দিন ইউসুফ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আওয়ামী লীগের এই চার বিশিষ্ট ও প্রবীণ নেতা পূর্ববর্তী সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তাঁদেরকে দলের ঐ কাউন্সিল সম্মেলনে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে সৃষ্ট সভানেত্রীর ১৫ সদস্যবিশিষ্ট 'উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটির' সদস্য নিযুক্ত করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের সভানেত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ-পরামর্শ প্রদানের জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে ঐ 'উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটি' গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। তাই, আওয়ামী লীগের উল্লিখিত চার প্রবীণ নেতাকে ঐ 'উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটিতে' অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যাপারটি বিভিন্ন মহলে দারুণ বিস্ময় ও হতাশা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আওয়ামী লীগ, বিশেষ করে, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী ডক্টর কামাল হোসেনের মতো জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দলের সভাপতিমণ্ডলী কিংবা কার্যনির্বাহী সংসদের বাইরে রাখা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত ছিলো না বলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও মহলে মন্তব্য করা হয়।

১৯৯। ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এর ৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশের ৬১টি জেলাকে এক একটি এলাকা হিসেবে নির্দিষ্ট করে প্রতিটি জেলার সদরে একটি করে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করে। ঐ ৬১টি জেলার ৬১ জন সেশন জজকে তাঁদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সেসব ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা এবং স্ব স্ব এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার লাভের সুযোগ গ্রহণের অভিপ্রায়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় নানান প্রভাবশালী মহল "সন্ত্রাসী" বলে চিহ্নিত করে হাজার হাজার লোকের নামের তালিকা তৈরি করে ওপর মহলে পাঠায়। বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশের সুযোগকে ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য সেইসব তালিকা তৈরি করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সে ধরনের তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতেও দেওয়া হয়। মহল বিশেষ, সেসব তালিকার প্রেক্ষিতে থানায় থানায় "সন্ত্রাসীদের" বিরুদ্ধে কেস রেজিস্ট্রিরও চেষ্টা করে। পুলিশ প্রশাসন কোন কোন এলাকায় অনেককে গ্রেফতারও করে। রাতের অন্ধকারে পুলিশ ঝটিকা তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত তালিকাভুক্ত বেশীর ভাগ লোকই ছিলো বিরোধী দলগুলোর বিভিন্ন সমর্থক বা অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মী।

২০০। ১৮ই অক্টোবর (১৯৯২) তারিখ সকালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বঙ্গবন্ধুর শেষ সন্তান শেখ রাসেলের ২৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'শেখ রাসেল শিশু-কিশোর পরিষদ' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠা তনয়া, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, "১৯৭৫-এর পনেরই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, শেখ রাসেল এবং অন্যান্যের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী খুনীদের বিচার করতেই হবে।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "এক দেশে দু'ধরনের আইন চলতে পারে না। দেশে যে আইন আছে, তাতে একজন মানুষ তার আপনজন হত্যার বিচার চাইতে পারে। কিন্তু আজ দেশের সংবিধানে এমন একটি কালো আইন সংযোজন করা হয়েছে যার ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা, রাসেল হত্যাসহ ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে সংঘটিত কোনও হত্যাকাণ্ডের বিচার পাওয়া থেকে অনেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।" তাঁর ঐ ভাষণের এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা দুঃখ-ভারাক্রান্ত স্বরে শহীদ শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণ করে বলেন, "দেশের একজন নাগরিক হয়েও আমি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমি আমার বাবা, মা আর ভাইদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার পর্যন্ত চাইতে পারি না। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীরা আজও অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" তাদেরকে বিচার প্রক্রিয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে বলেই দেশে একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তাঁর ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, "আজ দেশের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এর কারণ, হত্যাকারীদের বিচার হচ্ছে না।" তারপর, বিএনপি সরকারকে অবিলম্বে ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ বাতিল বিল (১৯৯১) পাস করার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা যখন সংসদে এ বিল উত্থাপন করি, তখন সরকারী দল (বিএনপি) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, তাঁরা এতে সমর্থন জানাবেন। কিন্তু সরকার এখনও তা পাস করেনি। বিএনপি আমাদের সংগে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে।" পরিশেষে, শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, "ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫)" যদি বাতিল করা না হয়, তাহলে প্রয়োজনে আমরা সংসদকে অচল করে দেবো। ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমরা বর্তমান (পঞ্চম) সংসদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। (তাই) ন্যায় বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই (বর্তমান) সংসদকে অচল করা হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০১। সেপ্টেম্বর (১৯৯২)-এর শেষের দিক থেকে ভারত সরকারের নির্দেশে সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা এবং সে দেশের বিহার ও আসামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের গ্রেফতার করে তাদেরকে সে দেশে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নাগরিক বলে দাবি করে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা না করেই একতরফা-ভাবে বাংলাদেশ-ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত পথে জোরপূর্বক অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে থাকে। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সেই অন্যায় ক্রিয়াকলাপের কেবল প্রতিবাদ করা ছাড়া তা বন্ধ করতে ভারত সরকারকে বাধ্য বা রাজি করাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর (১৯৯২)-এর মাঝামাঝি সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলের অনেক সদস্য ভারতের ঐ অন্যায় 'পুশব্যাকের' প্রশ্নের ওপর আলোচনার দাবি জানালে তা সংসদের আলোচনার জন্য একটি পৃথক বিশেষ বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়।

২০২। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে ভারতীয় ঐ 'পুশ-ব্যাক' বিষয়ের ওপর প্রায় এক ঘন্টা ভাষণ দেন। শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের শুরুতে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, প্রথমে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। জাতীয় সংষদের কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে যে সভা হয় সে সভা অনুসারে কথা ছিলো (যে, 'পুশ-ব্যাক' ইস্যুর ওপর) তিন ঘন্টা আলোচনা হবে। সরকারী দলের পক্ষ থেকে এক ঘন্টা ও বিরোধী দলের দু'ঘন্টা আলোচনায় অংশ নেয়া হবে। কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে যে সিদ্ধান্ত (গৃহীত) হয়, সে মোতাবেক সংসদ চলে, সংসদ চলা উচিত। লক্ষ্য করলাম যে, কালকের আলোচনা দীর্ঘ হলো, কিন্তু একটি পর্যায়ে আপনি সংসদ মুলতবি করে চলে গেলেন। কি কারণে (আলোচনা) কালকে শেষ হলো না, বিষয়টি এখনও বিরোধী দলের কাছে বোধগম্য নয়। ভবিষ্যতে, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।"

২০৩। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় ঐ 'পুশ-ব্যাক' বিষয়ের ওপর প্রদত্ত ভাষণে তারপর বলেন, "মাননীয় স্পীকার, যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি (তা) ভারতীয় ভাষায় 'অপারেশন পুশ-ব্যাক', বাংলাদেশের ভাষায় 'পুশ-ইন'। আজকে বাংলাদেশের সীমান্তে একটা অশান্ত এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটাশুধু ভারতীয় সাইডে নয়, আমাদের সারা বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা—বার্মা (মায়ানমার) সীমান্ত ও ভারত সীমান্ত—উভয় দিকেই একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রয়েছে। সেজন্য আমরা সত্যই অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। ভারতে বসবাসকারী বহু নরনারীকে বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে জোর করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অমানবিকও বটে এবং সে কারণে আমরা মনে করি যে, আজকে আমাদের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। দু'প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যে বন্ধুত্বসুলভ সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারতো, এ পরিস্থিতি তার পরিপন্থী বলে আমরা মনে করি।"

২০৪। ২০শে আক্টাবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক' বিষয়ের ওপর প্রদত্ত ভাষণের আর এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে (সংসদের সরকারী দলের উপনেতা) জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব, তাঁদের পূর্ববর্তী সরকার অর্থাৎ এরশাদ সরকারের আমলের একটা যুক্ত ইশতেহারের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তবে, সেখানে একটু ভাষা ও শব্দের তারতম্য আছে, কারণ সেখানে বলা হয়েছে 'ইললিগ্যাল মুভমেন্ট' আর আমাদের বর্তমান (বিএনপি) সরকার (ভারতের সঙ্গে) যে যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন 'ইললিগ্যাল ইমিগ্রান্ট'। 'ইললিগ্যাল ইমিগ্রেশন' আর 'ইললিগ্যাল মুভমেন্ট' এক নয়।"

২০৫। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখার সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, "মাননীয় স্পীকার, সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই উভয় দেশের মানুষের আসা-যাওয়া চলেছে। বহু নরনারী বাংলাদেশ থেকে ভারতে, ভারত থেকে বাংলাদেশে চলাচল করেছে। উভয় দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসও করেছে। মাননীয় স্পীকার, আপনি নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন এবং আমি বর্তমান সরকারকেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৭১ সালে যারা শরণার্থী হয়ে (ভারতে) গিয়েছিলো, দেশ স্বাধীন হবার পর (তৎকালীন) আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ২৬শে মার্চ (১৯৭১)-এর পূর্বে যারা ভারতে গমন করেছে, আমরা তাদের গ্রহণ করবো না। ২৬শে মার্চ (১৯৭১)-এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ফলে যারা (সে সময়) দেশত্যাগ করেছে, শরণার্থী হয়েছে, তারা কেবল বাংলাদেশের নাগরিক হবে। আমরা মনে করি (যে), যারা শরণার্থী হয়েছিলো তারা দেশে ফিরে এসেছে এবং এরপর থেকে এদেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিলো। এই ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক' বা বাংলাদেশের 'পুশ-ইন' ঘটনার পূর্বে অবৈধভাবে বা বেআইনীভাবে (ভারতে) কোন অনুপ্রবেশের কথা সরকার আমাদের জানায়নি। আমরাও এ বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি। ভারতে এভাবে এতো অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে কথাও আমরা জানিনি। আজকে সেটা যদি হয়ে থাকে, (তাহলে) আমার প্রশ্ন থাকবে ভারত সরকারের কাছে যে, তাদের (ভারতের) সীমান্ত রক্ষীবাহিনী আছে। যদি বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে থাকে, তাহলে তাদের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী নিশ্চয়ই (সে ব্যাপারে) আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো। তারা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একতরফাভাবে হাজার হাজার নরনারীকে বলপূর্বক বাংলাদেশে প্রেরণের চেষ্টা কেন করছে এবং এটাকে আমরা কখনই সংগত বলে মনে করি না। বরং, এই পরিস্থিতি আজকে একটা অশান্ত অবস্থা ও সীমান্তে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। তবে, এ বিষয়ে একটি ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী (সংসদে) যে ভাষণ দিয়েছেন, তার পঞ্চম নম্বর প্যারাটি আমি উল্লেখ করতে চাই।"

২০৬। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তারপর বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আপনিও লক্ষ্য করবেন এবং বর্তমান (বিএনপি) সরকারকেও আমি বিষয়টি লক্ষ্য করতে অনুরোধ করবো। এখানে তিনি (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সত্তরের (১৯৭০-এর) শেষার্ধে ...।' আজকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি কি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রী? বাংলাদেশের স্বাধীনতা কবে হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ কবে হয়েছে তা কি (বর্তমান) পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন? আজকে তিনি বলেছেন, 'স্বাধীনতার পরে সত্তরের (১৯৭০-এর) শেষার্ধে'। অথচ, ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীনতায় আদৌ বিশ্বাসী কি-না—অবশ্য তিনি তো মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন না—বোধ হয় (তিনি) দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না, সে প্রশ্ন আজকে আমি রাখছি। আজ আমার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি-না, (পররাষ্ট্রমন্ত্রীর) এই কথার মধ্যে আমরা সেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।"

২০৭। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক' বিষয়ের ওপর ভাষণ দানকালে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকের বর্তমান (বিএনপি) সরকার ভারতের এই 'পুশ-ব্যাক অপারেশন' বা বাংলাদেশের 'পুশ-ইন' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। (সংসদে সরকারী দলের উপনেতা) বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব নিজেই বলেছেন যে, ভারতের বহু পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছে। এটা বাস্তব। আমরাও জানি যে, ভারতের বহু পত্র-পত্রিকা যতদূর সম্ভব (এ ঘটনার) শুরু থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমিও তাহলে প্রশ্ন করি যে, ভারতের পত্র-পত্রিকা যখন উদ্বেগ প্রকাশ করলো, যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় (বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ভাষায়) এডিটরিয়াল লিখলো, তখন বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং (ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী) দিল্লীতে আমাদের যে কূটনৈতিক মিশন রয়েছে, তারা কি ঘুমিয়ে ছিলেন? সেটাও (বিএনপি) সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করি। তখন কেন তাঁরা পদক্ষেপ নেননি? তখন তাদের কোন উদ্বেগ আমরা কেন দেখিনি? সে প্রশ্ন আমিও রাখছি। আমাদের (বিএনপি সরকারের) পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির এই ১১ নম্বর প্যারাতে আছে যে, 'ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে' বিরাটাকারে বিরূপ প্রচারণার মধ্য দিয়ে গত ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে ১৩২ জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় বাংলাভাষী নাগরিককে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয় এবং এই ১৩২ জনকে বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছিলো। তাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অস্বীকার করেনি।"

২০৮। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক' বিষয়ের ওপর নির্ধারিত আলোচনায় সুদীর্ঘ বক্তব্য প্রদানকালে আরও বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে (বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত) যে যুক্ত ইশতেহার নিয়ে কথা হচ্ছে তার ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে লেখা আছে ঃ 'Taking into account the problems being caused due to large scale illegal immigration of people across their borders, they (India and Bangladesh Governments) expressed their determination to stop the illegal movement of people across the border'। এখানে লক্ষ্য করবেন 'across the border' 'আর এখানে চলে আসছে' 'across the border by all possible means including the strengthening of existing arrangements and mutual cooperation in this regard'। আমি প্রশ্ন করি; আজকে (বিএনপি সরকারের) প্রধান মন্ত্রী (সংসদে উপস্থিত) নেই; আমি আশা করেছিলাম আজকে প্রধান মন্ত্রী এখানে থাকবেন। কারণ, আমার প্রশ্ন আমি তাঁকেই করতে পারি এবং কেন তিনি (সংসদে) উপস্থিত নেই সে প্রশ্নও আমি রেখে যাচ্ছি। আমার প্রশ্ন এই যে, 'large scale' এটা বলতে তাঁরা কি বোঝান? এবং 'ইললিগ্যাল ইমিগ্রেশন'-এর ব্যাখ্যা তাঁর (প্রধান মন্ত্রীর) কাছে চাই। এবং এই যে 'large scale' (কথা) তারও ব্যাখ্যা চাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে, 'arrangements–এই arrangements'–এ তাঁরা কি করে এসেছেন? এই ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে যে বিষয়টি লক্ষণীয় যে, তাঁরা কিন্তু (সেসব ব্যাপারে) কোন সময় নির্ধারণ করেননি। যেখানে আমরা দাবি করছি (যে), স্বাধীনতার এই ২০ বছরে—যারা শরণার্থী হয়ে (ভারতে) গিয়েছিলো বা (ভারত থেকে) ফেরত আসছে (তাদের ছাড়া)—এ ধরনের কোন পরিস্থিতি ছিলো না। আজকে এই ১১ (নম্বর) অনুচ্ছেদে আপনি লক্ষ্য করবেন (যে), সেখানে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তাহলে প্রশ্ন (এই যে), সেই আটচল্লিশ (১৯৪৮) সাল থেকে এ পর্যন্ত সময় তাঁরা ধরেছেন কি-না। সেটাও আমাদের একটা প্রশ্ন রয়ে গেলো। সরকারের কাছে প্রশ্ন (এই যে), আজকে জাতি এই উদ্বেগজনক অবস্থায় পড়েছে কেন? এবং এই অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো? এই অবস্থা যে সৃষ্টি হয়েছে এখানে বাংলাদেশ সরকার কেন সময়মত (প্রয়োজনীয় কার্যকর) পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি?"

২০৯। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় 'পুশব্যাক অপারেশন' বিষয়ের ওপর ভাষণদানকালে আরও বলেন, "আজকে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রধান মন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বেগম খালেদা জিয়া) ভারত সফর করলেন. (ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত) যুক্ত ইশতেহার হলো এবং সেখানে কি লেখা হয়েছে (তা) আপনারা দেখেছেন এবং তারপরেই এই ('পুশ-ব্যাক অপারেশন'-এর) সমস্যার সৃষ্টি হলো। এটা অত্যন্ত রহস্যজনক বলেই আমরা মনে করি। আজকেও প্রধান মন্ত্রী (সংসদে) অনুপস্থিত। কাজেই. তাঁর (প্রধান মন্ত্রীর) (ভারত) সফরের পরেই এই পরিস্থিতি যে তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং এই কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা সংসদকে জানাতে চাই যে. প্রধান মন্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া) সংসদে উপস্থিত না থেকে এই পরিস্থিতির কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না, আজ জাতির কাছে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি আশা করবো (যে), বিএনপি (সরকার)-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী—যেহেতু প্রধান মন্ত্রী (সংসদে) উপস্থিত নেই—এই যে বিপুল সংখ্যক লোক (ভারতে) অনুপ্রবেশ করেছে এবং এই 'large scale'-এর ব্যাখ্যা তাঁরা সংসদকে দেবেন। এই বিপুল সংখ্যক লোক (ভারতে) প্রবেশ করেছে. এর কি তথ্যাদি. কি প্রমাণাদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে, তার ব্যাখ্যা আমি সংসদে (পেশ করার) দাবি করছি এবং এটা সংসদের একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। বর্তমান (বিএনপি) সরকারের প্রধান মন্ত্রী ভারত সফরকালে স্বীকার করে এসেছেন যে. ইললিগ্যাল মুভমেন্ট হয়েছে। তার প্রমাণ বিবিসি-এর সাউথ এশিয়া সার্ভের ৩০-০৯-৯২ তারিখের ভাষ্যে স্পষ্ট। (ঐ ভাষ্যে বলা হয়েছে) ঃ 'The Bangladesh authority says that very few of its nationals are living illegally in India' অর্থাৎ বিএনপি সরকার নিজে স্বীকার করে এসেছেন যে, বাংলাদেশী ন্যাশনাল ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। এটা বাংলাদেশ সরকারই স্বীকার করে এসেছে। আমাদের প্রশ্ন (এই যে). দেশের ভেতরে এসে তাঁরা (যা) অস্বীকার করেছেন, আর ভারতে গিয়ে তাঁরা (তা) স্বীকার করে এসেছেন কেন? রহস্যটা কি?"

২১০। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক অপারেশন'-এর ওপর তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে আরও বলেন. "মাননীয় স্পীকার. বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কিন্তু আমার মনে হয় (যে). এই স্বাধীনতার ২০ বছরে আজকের বিএনপি সরকার বাংলাদেশকে একটা কূটনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ধরনের কূটনৈতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনদিন ঘটেনি। এই সঙ্গে আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করি (যে),—তিনি যে স্বীকার করে এসেছেন—কবে, কত তারিখে, কিভাবে কারা (ভারতে) গিয়েছে, তার কোন তথ্য তাঁর কাছে কি-না? ভারতে গিয়ে কূটনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী নতি স্বীকার করে এসেছেন এবং (তাতে) বাংলাদেশের সম্মান ক্ষুণ্ন করে এসেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিপুল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী বা লোক ভারতে রয়েছেন, তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে এই ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে পাওয়া যায় যে, প্রধান মন্ত্রী ভারত সরকারকে আশ্বাসও দিয়ে এসেছেন। এই আভাসটাও আমরা ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ ভালোভাবে পড়লে দেখতে পাই।" উক্ত ভাষণে শেখ হাসিনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আরও বলেন, "আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ভারত সরকার (অবশ্য সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট পেয়েছি) আমাদের সীমান্ত বরাবর ভারতীয় এলাকায় ২৮৮৪ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ এবং ৮৮৬ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করবে এবং আরও অনেক ধরনের বাধা সৃষ্টি করবার তারা চেষ্টা করছে। আজকে আমার প্রশ্ন, এই সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া—এটা (বাংলাদেশের) প্রধান মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে ভারত সরকার করছে কি-না? এসব ব্যাপারে এই যুক্ত ইশতেহারে একটা সহযোগিতার আভাস রয়েছে, যা বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বলে আমরা মনে করি। সেই সঙ্গে আমি বিএনপি সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখছি (যে), যুক্ত ইশতেহারে যা করেছেন আর পত্রিকায় যা দিয়েছেন, (তার বাইরে) গোপনে আর কি কি চুক্তি আপনারা করে এসেছেন, আর কতো কনসেশন দেবেন?, কনসেশন দেবার যে আভাস বা স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছেন, আজকে বাংলাদেশের জনগণ তা আপনাদের কাছে জানতে চায় যে কারণে আজকে বাংলাদেশ সীমান্তে এই অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।"

২১১। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক অপারেশন'-এর ওপর প্রদত্ত তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজ কথা বললে অনেক কথা আসে। তিন বিঘা করিডোডের কথা সরকার বলেছেন। তিন বিঘা করিডোর? আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং (শ্রীমতী) ইন্দিরা গান্ধী যে চুক্তি করেছিলেন তাতে (এই নিশ্চয়তা) ছিলো যে, তিন বিঘা করিডোরের একটা স্থায়ী সুবন্দোবস্ত হবে। কিন্তু আজকে সেখানে সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী সুবন্দোবস্ত হয়নি। আপনি জানেন (যে), সেখানে (মাত্র) কয়েকটি ঘন্টা নির্দিষ্ট করা আছে (এবং) সেই ঘন্টানুযায়ী (তিনবিঘা করিডোর পথে বাংলাদেশের) লোকজন যাতায়াত করতে পারে। সেখানে পূর্ণ অধিকার বাংলাদেশ পায়নি। কাজেই, এটা নিয়ে খুব বেশী বড়াই করবার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।" উক্ত ভাষণে শেখ হাসিনা তারপর বলেন, "আজকে ফারাক্কা (গঙ্গা নদী)-এর পানি নিয়ে কথা। এই যুক্ত ইশতেহারে আমাদের (বিএনপি সরকারের) পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, আমি মনে করি সেখানে ফারাক্কা অর্থাৎ গঙ্গার পানি বন্টনের ক্ষেত্রেও যতটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিলো, সেই গুরুত্ব তাঁরা দিতে পারেননি। বরং, তার সঙ্গে তিস্তা এবং অন্যান্য নদী মিলিয়ে ফেলে গঙ্গার পানি বন্টনের গুরুত্ব তাঁরা নষ্ট করেছেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর সময় এই ফারাক্কা নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল সেখানে (নিশ্চয়তা) ছিল (যে), ৪৪ হাজার কিউসেক পানি বাংলাদেশ পাবে। শুধু তাই নয়। শুষ্ক মৌসুমে যদি পানি কমও হয়, তাহলে তার ৮০ ভাগ পানি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পাবে। ভারত পাক আর না পাক, বাংলাদেশ তার ৮০ ভাগ পাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, এই সেফটি ক্লজটি সেই চুক্তিতে ছিলো, যা বর্তমানে নেই, মাননীয় স্পীকার। আমরা ৪৪ হাজার কিউসেক পানি এনেছিলাম। তাঁরা ২৫ হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(কিউসেক)-এর জন্য কান্নাকাটি করেও এক ফোঁটা পানিও আনতে পারেনি। দিল্লী থেকে প্রধান মন্ত্রী এক ঘটি গঙ্গার জলও আনেননি বাংলাদেশের মানুষের জন্য।"

২১২। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক অপারেশন' বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনায় তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। বাংলার মানুষের যে কোন দুঃসময়ে মানুষের পাশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছিলো। এই আওয়ামী লীগ সংগঠনই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের স্বাধীনতা এনেছে। আজ বাংলাদেশের দু'টি সীমান্তে যখন অশান্ত পরিবেশ এবং যার কারণ হচ্ছে বর্তমান সরকার, আজ তাঁদেরই অযোগ্যতা, অদক্ষতা, অব্যবস্থার কারণে এই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।" তারপর, শেখ হাসিনা আরও বলেন, "আজ আরও একটি বিষয় (সংসদে সরকারী দলের উপনেতা) বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব বলেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা নাকি ১৯৭৩-৭৪-এর। আজ আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই (যে), ১৯৭৩-৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে যায়নি। গিয়েছে ১৯৭৭-৭৮ সালে যখন জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন, তখনই এই জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে সেটা ছিলো যে, তখন উপজাতীয়রা উপজাতীয় হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছিলো। তারা তাদের কালচারাল অটোনমি চেয়েছিলো। সেটা (এর ব্যাপারে) পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র লারমার সঙ্গে চুক্তি হয় এবং আমাদের (তৎকালীন) সরকারের সঙ্গে তিনি যোগদান করেন। তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়ে গিয়েছিলো।"

২১৩। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক অপারেশন'-এর বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনায় ভাষণদানকালে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ওপর আরও আলোকপাত করে বলেন, "পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর (দেশে) সামরিক শাসন জারি হয় এবং মিলিটারী ডিক্টেটর ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে, অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তখন থেকেই বহু চাকমা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এটা নিশ্চয়ই বর্তমান সরকার স্বীকার করবেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাবার জন্য, মাননীয় স্পীকার, আমরা এর রাজনৈতিক সমাধান করতে চেয়েছি। আমরা বার বার দাবি জানিয়েছি (যে), তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক স্থায়ী সমাধানে আসতে হবে। কিন্তু সেখানে, আমরা জানি, নানান জটিলতা, নানান খেলা এবং এখনও বহু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেটা সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে যার দৃষ্টান্ত 'লোগাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাকাণ্ড', যে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট একতরফাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আজ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা আর যাই হোক, বাংলাদেশের সচেতন মানুষ কোনদিনই মেনে নেবে না। কাজেই (সংসদে সরকারী দলীয়) উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব যা বলেছেন মোটেই তা সঠিক তথ্য বলে মেনে নেয়া যায় না।"

২১৪। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক অপারেশন' বিষয়ের ওপর পুনরায় আরও কিছু মন্তব্য করে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আজকে আমি একটি কথাই বলতে চাই যে, এই যুক্ত ইশতেহার যার ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই, আমার সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকবে (যে), এই ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ যে কোনভাবে হোক বাতিল করতে হবে। সীমান্তে ভারত থেকে আর একটি নাগরিকও যেন 'পুশ-ব্যাক' করা না হয় বা বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে 'পুশ-ইন' করা না হয়, তার জন্য সরকারকে যথাযথ বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সম্মানজনকভাবে সমাধান করতে হবে। সরকার যদি এটা করতে ব্যর্থ হয়, তার দায়-দায়িত্ব বর্তমান (বিএনপি) সরকারকে নিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। বিএনপি সরকারের বালখিল্যতা বা তাঁদের রাষ্ট্র চালানোর অব্যবস্থা ও অযোগ্যতার কারণে বাংলাদেশের মানুষ তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারাবে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তা কোনদিন মেনে নেবে না। বাংলাদেশের জনগণ কোনদিন তা মেনে নেবে না। মেনে নিতে পারে না।"

২১৫। ২০শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে সংসদে ভারতীয় 'পুশ-ব্যাক অপারেশন'-এর বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনায় তাঁর ভাষণ শেষ করে ঐ উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো সংসদের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন ঃ "(১) যেহেতু আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে ভারতের একতরফা 'পুশ-ব্যাক অপারেশন'-এর কারণে বাংলাদেশ সীমান্তে এক জটিল ও অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে 'পুশ-ইন' করার ফলে নারী-পুরুষ-শিশুদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেহেতু এই সংসদ (ভারত সরকারের) এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে। (২) যেহেতু গত ২৮শে মে (১৯৯২) তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের স্বীকৃত যুক্ত ইশতেহারের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী ও দেশের জন্য অসম্মানজনক এবং উক্ত অনুচ্ছেদ বর্তমান সৃষ্ট পরিস্থিতির মূল কারণ, সেহেতু এই সংসদ যুক্ত ইশতেহারের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ এই সংসদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমত ব্যক্ত করছে। (৩) এই সংসদ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে সম্মানজনকভাবে এই সমস্যা সমাধান করার অভিমত ব্যক্ত করছে। (৪) ভারত যাতে আর কোন বাংলা ভাষাভাষী নাগরিককে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'পুশ-ইন' করাতে না পারে, তার জন্য এই সংসদ বাংলাদেশ সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য এবং ভারতকে 'পুশ-ব্যাক' বন্ধ করবার আহ্বান জানাচ্ছে।" কিন্তু শেখ হাসিনার এসব প্রস্তাব সংসদে সরকারী দল বিএনপি-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়।

২১৬। ২৭শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২) জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় তা সাংসদদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য। ঐদিন ঐ বিলটির ওপর আলোচনার সময় সংসদে সরকারী দল ও আওয়ামী লীগসহ অন্য সকল বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। সংসদে আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দল ঐ বিলটি সংসদে উপস্থাপন করায় বিএনপি সরকারের, বিশেষ করে, সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করে। ঐ বিলটি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক, বাকবিতণ্ডা চলার এক পর্যায়ে সংসদের বিরোধী দলগুলোর কতিপয় সদস্য বিলটির প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন বিধি-বিধান, ধারা-উপধারা, সেটি সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধান পরিপন্থী ও লংঘনীয় কি-না ইত্যাদি বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার নিমিত্তে সংসদের বিশেষ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করে। তা ছাড়াও, ঐ বিলটির কতিপয় বিধিবিধান ও ধারা-উপধারা ক্ষেত্রভেদে প্রত্যাহার ও সংশোধনের জন্যও সংসদের বিরোধী দলগুলোর কতিপয় সদস্য প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু সরকারী দল বিএনপি-এর সাংসদরা সেসব প্রস্তাব কণ্ঠ ভোটে নাকচ করে দেন। ঠিক ঐ পর্যায়ে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর), গণতন্ত্রী পার্টি ও জাসদ (সিরাজ)-এর সাংসদরা ঐ 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' বিলটিকে কালাকানুন, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ও মানবতাবিরোধী বলে অভিহিত করে সংসদ থেকে একযোগে ওয়াক আউট করেন। ঐদিন অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর (১৯৯২) তারিখ থেকে ৬ই নভেম্বর (১৯৯২) তারিখ রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে সংসদের সপ্তম অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, জাসদ (সিরাজ) ও ন্যাপ (মোজাফফর) সংসদ অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখে। তবে, ৩রা নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে সিপিবি-এর সাংসদরা সংসদে ফিরে যান।

২১৭। ১লা নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে বিএনপি সরকার 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন বিল (১৯৯২)'-এর সামান্য কিছু সংশোধন করে বিলটির অনুমোদনের জন্যে আনুষ্ঠানিক-ভাবে সংসদে প্রস্তাব রাখলে তা বিএনপি-এর সাংসদদের কণ্ঠভোটে পাস হয়। সেদিন ঐ বিলটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসের সময় তার প্রতিবাদ জানিয়ে জামাতে ইসলামীর সাংসদরা ও ইসলামী ঐক্যজোটের একমাত্র সাংসদ সংসদ থেকে ওয়াক আউট করলেও তাঁরা সংসদের সপ্তম অধিবেশনে যোগদান অব্যাহত রাখেন। বিএনপি সরকার ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন' অধ্যাদেশ (১৯৯২)-এ যে সামান্য কিছু সংশোধন করে তার অন্যতম হচ্ছে, শিরোনাম সংশোধন করে 'সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন' শিরোনাম রাখা। দ্বিতীয়ত, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জারিকৃত 'নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ (১৯৯২)'-এর ১৪ নং ধারা মোতাবেক 'আপীল ট্রাইব্যুনাল' গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে তার এখতিয়ার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। তৃতীয়ত, ঐ বিলটির ১ নম্বর ধারায় ২ নম্বর উপধারা সংযোজন করে তাতে বলা হয় ঃ "এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং সংসদ কর্তৃক ইহার মেয়াদ বর্ধিত করা না হইলে এই আইন ২ বছরের জন্য বলবৎ থাকিবে। এই আইনের মেয়াদকাল উক্তরূপ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।" ১লা নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে বিএনপি সরকার কর্তৃক পাসকৃত ঐ 'সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন' বিল (১৯৯২)-টি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ৬ই নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের সাথে সাথেই 'সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন' বিল (১৯৯২) আইনে পরিণত হয় এবং ঐ আইনটি জনসাধারণের অবগতির জন্য ৬ই নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে সরকারী 'বাংলাদেশ গেজেটে' প্রকাশ করা হয়।

২১৮। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একদিনব্যাপী (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত) 'তিন (৮, ৭ ও ৫ দলীয়) জোটের (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের) রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা। সুদীর্ঘ ৫ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ আলোচনা সভা দুটি পর্বে বিভক্ত ছিলো। ঐ সভার প্রথম পর্বে সভাপতিত করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর আহবায়ক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি-মণ্ডলীর তৎকালীন অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ডক্টর কামাল হোসেন। প্রথম পর্বের আলোচনায় অংশ নেন সিপিবি-এর সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, ন্যাপের পংকজ ভট্টাচার্য, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, গণআজাদী লীগের আলহাজ্ব আবদুস সামাদ ও মোহাম্মদ সামসুদ্দোহা, এমপি। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কবি বেগম সুফিয়া কামাল, বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, ডঃ আনিসুজ্জামান, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হক চৌধুরী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ফয়েজ আহমদ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামালউদ্দিন হোসেন, প্রাক্তন বিচারপতি কে. এম. সোবহান, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, জাসদ (ইনু)-এর সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, যুবলীগ নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টু, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা আয়েশা খানম, গণতান্ত্রিক পার্টির অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেন, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অপর প্রাক্তন সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব প্রমুখ।

২১৯। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বলেন, "যে জনতা গণআন্দোলন করলেন, গণঅভ্যুত্থান ঘটালেন তাঁদের আশা-আকাঙক্ষা তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়িত হলো না। (বিএনপি) সরকার ও বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ) উভয়েই সংসদে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ব্যর্থ।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ বলেন, "(বিএনপি) সরকার ও বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)-এ যাঁরা আছেন তাঁদের মুখে 'দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে' বা 'দেশ বিকিয়ে দেয়া হচ্ছে' এ ধরনের শ্লোগান ও পাল্টা শ্লোগান আর ভালো লাগে না। জনগণ তাঁদের কাছ থেকে আর এসব শ্লোগান শুনতে চান না। জনগণের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, প্রভৃতি পূরণের উপযোগী সম্যক্ জ্ঞান, উপলব্ধি, সচেতনতা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে তাঁরা (জনগণ) জানতে চান।"

২২০। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় কবি বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, "বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষ একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ছাত্র-যুবক, পেশাজীবী, কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, সবাই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। আর আজ স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর ছাত্রদের হাতে অস্ত্র, এতো এসিড কোথা থেকে এসেছে? নিরস্ত্র যেসব হাত একদিন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো, সেই হাতগুলোই আজ অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়।" কবি বেগম সুফিয়া কামাল আরও বলেন, "আজকেও আমরা নিশ্চিন্ত নই, নিরাপত্তাবোধ করি না, সন্তানকে খাওয়াতে পারি না। আশ্রয় নেই, বস্ত্র নেই। সোনার বাংলার সেই মানুষ আছে, সেই মাটিও আছে। কিন্তু (আজ) সোনা ফলছে না কেন? নব্বুইতে (১৯৯০ সালে) আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম, প্রয়োজন হলে আবারও রাস্তায় নামবো। জনতার হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উত্থান-পতন।" কবি বেগম সুফিয়া কামাল মুক্তিকামী মানুষকে পরজীবীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২১। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন বলেন, "তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়নে (বিএনপি) সরকার ও সংসদে বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ) যৌথভাবে ও এককভাবে জনগণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারী দল (বিএনপি) একক-ভাবে সেটা করছে না। কিন্তু সংসদে বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)-এর তাদের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিতে বাধাটা কোথায়?" তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন বলেন, "বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি দিয়েই এরশাদ নয় বছর শাসন চালিয়েছেন। এরপর বিএনপি সরকার সেই প্রচলিত আইনে দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারেননি। ২ বছর বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল রাখলেন। এরপর নতুন ('সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন') আইন প্রণয়ন করলেন। এর অর্থ হচ্ছে ২ বছরে সন্ত্রাস দমনে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে। (এই) ব্যর্থতার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন নয়—গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে ব্যর্থতার জন্য (বিএনপি) সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়।"

২২২। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রাক্তন বিচারপতি কে. এম. সোবহান বলেন, "সংসদে সরকারী ও বিরোধী দল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে 'মার্ক টাইম' করছে—সামনে এগুচ্ছে না। একে অন্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে (১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের ওয়াদা থেকে সরকারী (বিএনপি) দল অনেক দূরে চলে গেছে। মৌলবাদী ও ফ্যাসিবাদীদের হাতে নির্ভরশীল হয়েছে সরকারী দল। ঘাতক গোলাম আযমের বিচার তো হয়-ই নি, উপরন্তু ২৪ জন বরেণ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে (ঐ) ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা কিভাবে চলতে পারে? ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে (বিএনপি) সরকারকে বাধ্য করতে হবে জাতির কাছে দেয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য।"

২২৩। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় (বাংলাদেশ) আইনজীবী সমিতিসমূহের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক শামসুল হক চৌধুরী বলেন, "তিন জোটের রূপরেখা প্রণয়নকারীদের ক্রেডিট নেয়া-দেয়ার কিছু নেই। আমাদের আরও অনেকদূর যেতে হবে। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, (বিএনপি) সরকার ও বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)-এর উভয় নেত্রীরই 'ব্যক্তিগত ডিক্টেটরশীপে'র প্রতি আগ্রহ বেশী। আমরা তা বন্ধ করতে পারিনি। ভবিষ্যতে, সংসদের কাছে নয়, জনগণের কাছে জবাবদিহিতার কথা বলতে হবে। তাহলে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যা খুশী তাই সংসদে পাস করানো যাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২৪। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম' আয়োজিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার সময় 'বাংলাদেশ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটে'র ফয়েজ আহমদ বলেন, "বিএনপি ক্ষমতায় যাবার শুরুতেই তিন জোটের (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখের) ঘোষণার শর্ত ভংগ করেছে। তারা সরকার গঠনে স্বাধীনতাবিরোধী হানাদার বাহিনীর দোসর জামাতের সহযোগিতা-সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছে।" উক্ত আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের অধিকার আজ ক্ষমতাসীন নেতানেত্রীর পকেট ও আঁচলের মধ্যে বন্দী। এই শৃংখল থেকে মুক্ত হবার জন্য যুব-ছাত্র সমাজকে আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" ঐ আলোচনা সভায় জাসদ (ইনু)-এর সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু তাঁর বক্তব্যে বলেন, "ক্ষমতাসীনরা গদী রক্ষার জন্য তাদের ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাসী নরঘাতকদের লেলিয়ে দিচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে জাতি সংসদের কাছে কিছু সুস্পষ্ট পদক্ষেপ চাচ্ছে। কিন্তু (বর্তমান) সংসদ তা (দিতে) পারছে না। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার মানে এই নয় যে, রাজাকাররা হালাল হয়। (পক্ষান্তরে), আবার খালেদা জিয়ার ব্যর্থতা অবৈধ স্বৈরাচারী এরশাদকে হালাল করে না বা ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানকে নাজায়েজ করে না।"

২২৫। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম' আয়োজিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় যুব লীগ নেতা মোস্তফা মহসিন মন্টু তাঁর বক্তব্যে বলেন, "যে স্বৈরাচারের ট্রাক আন্দোলনকারীদের ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনের চেষ্টা দেখলে লজ্জা হয়। (বিএনপি) সরকার ও বিরোধী দলের আত্মকলহ, দম্ভ, অহমিকা আজ গোটা জাতিকে গ্রাস করেছে। (জাতীয়) সংসদ নির্বিকার। কেবল এমপিদের বেতন-ভাতা ও ডিউটি ফ্রি গাড়ির সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নে তাঁরা একমত হন। এই ক্রান্তিলগ্নে রাজনৈতিক শূন্যতায় নীরবতা জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।" ঐ আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব তাঁর বক্তব্যে বলেন, "যে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে (১৯৯০ সালে স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী) আন্দোলন করেছিলাম, (বিএনপি) সরকার ও বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তা পূরণ করতে পারেনি। সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই একে অন্যকে কেবল দোষারোপই করে যাচ্ছে। জনগণ সরকারী (বিএনপি) দলকে কালাকানুন (সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইন) পাসের জন্য আর বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)-কে সংসদে না বসে বাইরে থাকার জন্য নির্বাচিত করেনি। যদি গণতন্ত্র এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে আবারও পথে নামবো। (সংসদে) বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)-এর নেত্রী গণঅভ্যুত্থানের অগ্রণীদের (তাঁর) সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেন। আবার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বৈরাচারের পক্ষে যারা ছিল তাদের ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবন'-এ ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেন। (তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি) প্রয়োজনে আবারও নূর হোসেন-ফাত্তাহ হবো।"

২২৬। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম' আয়োজিত 'তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভার দ্বিতীয় পর্বে সভাপতির ভাষণে 'ফোরাম'-এর আহ্বায়ক ডঃ কামাল হোসেন বলেন, "আজকের স্থবির ও অসুস্থ পরিবেশে জনগণ হতাশা ও আস্থাহীনতায় ভুগছে। সকল পেশাজীবীরই গণতান্ত্রিক পরিবেশে জাতিকে কিছু দিতে হয়। কিন্তু তারা তা দিতে পারছে না। কারণ, সেই সুস্থ পরিবেশ নেই। (আর) সুস্থ পরিবেশ না পেলেই জনগণ রাজপথে নামেন। (জাতীয়) সংসদে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা—তাঁরা সেই পরিবেশ রচনা করবেন। আজ সেই প্রত্যাশার ভিত্তিতেই ঐক্যের পক্ষে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। যখনই জাতি বৃহৎ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তখনই বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠেছে। (আর) এই ঐক্যের দ্বারাই এক মূল ধারার সূচনা হয়।" তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে (বিএনপি কর্তৃক) বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতির কঠোর সমালোচনা করে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, "ইতিহাস বিকৃত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই। আমাদের ইতিহাস গর্বের ইতিহাস এবং অনুপ্রেরণার উৎস। ঐক্যের ধারা—এই মূল ধারায় আমাদের ইতিহাস ও (১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" তাঁর সভাপতির ভাষণের আর এক পর্যায়ে ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ঘটা গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ করে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, "১৯৯০-এর আন্দোলন মুখর সেই দিনে তিন জোটের রূপরেখা ও ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিলো—দেশের মানুষ আশান্বিত হয়েছিলো। (ঐ) ঐক্যের মধ্যেই শক্তির সৃষ্টি হয়েছিলো প্রবলভাবে। আমাদের জাতীয় জীবনে অনেকবারই সুযোগ এসেছে, আবার আমরা তা হারিয়েছি। (তাই) এবারের (১৯৯২ সালের) ১৯শে নভেম্বরের শপথ হোক যে, আমরা আমাদের আর কোন সুযোগকেই হারাতে দেবো না।"

২২৭। ৩০শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখ সোমবার প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে রাজধানী ঢাকার মন্ত্রীপাড়ার ৩০ নম্বর হেয়ার রোডে নির্মাণাধীন বাড়িটির চলমান নির্মাণ কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ঐ বাড়িটির নির্মাণ কাজ লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমলে ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে শুরু হয়। রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবন হিসেবে ব্যবহারে সে সময়ের প্রাক্কলিত ৭ কোটি ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ঐ বাড়িটির নির্মাণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ঐ বাড়িটির নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এই বিবেচনায় যে, ইতিমধ্যে সেটির নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছিলো। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে গৃহীত সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ব প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যেই ঐ বাড়িটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব সরাসরি পূর্ত মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পণ করা হয়। ১৯৯২ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় পেশকৃত পূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ঐ বাড়িটির নির্মাণ কাজের সে সময়ের প্রকৃত ব্যয় পূর্ব প্রাক্কলিত অর্থের অংককে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে গেছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঐ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০শে নভেম্বর (১৯৯২) তারিখে সরকার হেয়ার রোডের ঐ বাড়িটির আরও অতিরিক্ত নির্মাণ কাজ তক্ষণি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সংগে সে ব্যাপারে কোন অনিয়ম হয়েছে কি-না সে ব্যাপারে তদন্ত এবং হয়ে থাকলে, সে অননুমোদিত অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয়ের জন্য কে বা কারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২২৮। ১১ই ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে চট্টগাম শহরের পুরাতন সার্কিট হাউস প্রাংগণে আয়োজিত 'বিজয় মেলা স্মৃতিচারণ' অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, সংসদ সদস্য ও বিএনপি-এর একজন বিশিষ্ট নেতা লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন বলেন, "জামাতে-ই-ইসলামী একটি ফ্যাসিবাদী শক্তি। এদের নিষিদ্ধ করতে হবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এই অশুভ শক্তিকে নিষিদ্ধ করার দাবির বিরোধিতা করতে পারি না।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন বলেন, "শেখ মুজিবের অবদান ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা বা তাঁকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। শেখ মুজিব চিরদিন শেখ মুজিবই থাকবেন।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন "জয় বাংলা" শ্লোগান দেন এবং তিনি এই শ্লোগানকে (১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের অহংকার বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তিনি তাঁর বক্তৃতার আর এক পর্যায়ে ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন।

২২৯। ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে দৈনিক আজকের কাগজে 'প্রশাসনে স্থবিরতা বাড়ছেঃ অযোগ্যতার কারণে অনেক (সরকারী) কর্মকর্তা নয়া কর্মস্থলে যোগ দিতে পারছে না' শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়ঃ "সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিবসহ সচিবালয় এবং এর বাইরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদানের পক্ষে-বিপক্ষের বিতর্ক গত দশ মাসেও শেষ হয়নি। ফলে, প্রশাসনিক স্থবিরতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদোন্নতিপ্রাপ্তদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানে পোস্টিং দিলেও সেসব স্থানে পদ শূন্য না থাকায় সংশ্লিষ্ট পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে যোগ দিতে পারছেন না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পদে অনভিজ্ঞ হওয়ায় কাজে যোগ দিতে পারছেন না।" তারপর কারও নাম উল্লেখ না করে সচিবালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায় বলে ঐ সংবাদে আরও বলা হয়ঃ "যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০৮ জনের মধ্যে অধিকাংশকেই স্বজনপ্রীতির কারণে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। কোনও যোগ্যতা নেই, মন্ত্রীর আত্মীয় এই একমাত্র যোগ্যতায় অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গত দশ মাসে এসব বিচ্ছিন্ন বিতর্কিত বক্তব্যগুলো উচ্চারিত হতে হতে এখন তা বড় ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত করেছে, যে কারণে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের যুগ্ম-সচিব পদে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিরা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে শিথিলতা দেখা দিয়েছে।"

২৩০। ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখ দৈনিক আজকের কাগজে 'প্রশাসনে স্থবিরতাঃ অযোগ্যতার কারণে অনেক কর্মকর্তা নয়া কর্মস্থলে যোগ দিতে পারছে না' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে আরও বলা হয়ঃ "অজ্ঞাত কারণে ৪ জন বাংগালী সিএসপিকে যুগ্ম-সচিব করা হয়েছে। এ ৪ জন হলেন, আবদুল মান্নান (৪৫৮), শফিকুল ইসলাম (৪৬২), জানিবুল হক (৭৭৮) ও মাহমুদুর রাজা চৌধুরী। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পরীক্ষায় অংশ নেয়ার শাস্তি হিসেবে এঁরা ১৯৭৪ সাল থেকে চাকুরিতে ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন। অথচ, পদোন্নতি দেয়ার সময় এই ৪ জনকে ১৯৭০ সালের ইপিসিএস হিসেবে ইন্টারভিউ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে এই ৪ জনকে পদোন্নতি দিতে গিয়ে সকল রীতিনীতি ভেংগে ১৯৬৯-৭০ সালের ব্যাচের ৪২ জন ইপিসিএসকেও অনেক সিনিয়র কর্মকর্তাদের অতিক্রম করে যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। একই অভিযোগ রয়েছে আশরাফ (৮০০)-এর ক্ষেত্রে। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছেন যাঁদের ৬/৭ বছরের বাৎসরিক গোপনীয় অনুবেদন (প্রতিবেদন) নেই। আবার কেউ কেউ ১৯৭০-এর ইপিসিএস, ১৯৮৫-তে উপ-সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত। পদোন্নতি-প্রাপ্ত এসব কর্মকর্তাদের কেউ মন্ত্রী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের আত্মীয়, ভাগিনা বা স্বজন। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এসব অভিযোগ অবহিত হওয়ার পর তা নিরসনের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।"

২৩১। ২০শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'খাল খনন কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জিত হয়নিঃ দুর্নীতি অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত' শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় ঃ "গত ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে খাল খনন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বিলম্বে কর্মসূচী শুরু, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন, গমের সাময়িক অভাব, প্রকল্প চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনে বিলম্ব, দুর্নীতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে, স্বেচ্ছাশ্রমের অভাবে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। গত ২৮শে নভেম্বর (১৯৯২) প্রধান মন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত ১৯৯২-৯৩ সালে খাল খনন কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। ঐ বৈঠকে জানানো হয় যে, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে খাল খনন কর্মসূচীতে স্বেচ্ছাশ্রম ও গমের আনুপাতিক হার (রর্টধম) ছিল ৭৫ঃ২৫। কর্মসূচীর জন্য গত বছরে স্বেচ্ছাশ্রম ও গমের আনুপাতিক হার (রর্টধম) ৫০ঃ৫০ নির্ধারণ করা হয়। তবে, গত বছর প্রকৃত স্বেচ্ছাশ্রমের অংশ ছিল ৩৩ ভাগ। ১৯৯২-৯৩ সালে খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাশ্রম ও গমের আনুপাতিক হার (ratio) নির্ধারণ প্রশ্নে উল্লেখ করা হয় যে, খাল খনন কর্মসূচী একটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব আশা করা যেতে পারে। ১৯৯১-৯২ সালের খাল খনন কর্মসূচীর সে আন্দোলন বিভিন্ন কারণে গড়ে ওঠেনি। ফলে, স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে, এতে হতোদ্যম হওয়ার কারণ নেই বা খাল খনন কর্মসূচীতে স্বেচ্ছাশ্রমের অংশ হ্রাসের কোন প্রয়োজন নেই। (ঐ) সভায় (আরও) উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯১-৯২ সালে মোট গৃহীত প্রকল্পের (খাল খনন) সংখ্যা ছিল ৩৬৩টি। এ সময়ে ১ শ' ভাগ সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা হচ্ছে ১৯৯টি। খননকৃত খালের মোট দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৯৩৭ দশমিক ১৭ কিলোমিটার। মাটি খনন হয়েছে ১ দশমিক ৫৬ কোটি ঘন মিটার। গম বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯ হাজার ৯১৪ মেট্রিক টন। ব্যয় হয়েছে ১৬ হাজার ৬৭৭ দশমিক ৫৯ মেট্রিক টন। (অতঃপর), সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, গত অর্থ বছরে (১৯৯১-৯২) যেসব প্রকল্পের অগ্রগতি ৬০ ভাগের নিচে তার কারণ অনুসন্ধান করে অসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ চলতি বছর (১৯৯২-৯৩) নতুন প্রকল্পের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাপ্ত করতে হবে।"

২৩২। ২০শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'খাল খনন কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জিত হয়নি ঃ দুর্নীতি অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে আরও বলা হয় ঃ "(২৮শে নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত) সভায় জানানো হয় যে, চলতি ১৯৯২-৯৩ সালে খাল খনন কর্মসূচীর অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পগুলো জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষণের শেষ সময় ছিলো ৩১শে অক্টোবর (১৯৯২)। সবগুলো জেলা থেকে এখনও প্রকল্প প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সেলে পৌঁছেনি। ৬১টি জেলা হতে এ পর্যন্ত মোট ৪৭০টি প্রকল্প পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৪৪৪টি খাল এবং ২৬টি পুকুর খনন সংক্রান্ত প্রকল্প। উদ্ভূত অবস্থায় সভায় প্রকল্প গ্রহণের সময় ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৯২) পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কেবল খাস মজা পুকুর পুনরায় খনন ও পানি সংরক্ষণের জন্য বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প খাল খনন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কাটা খালের পাড়ে গাছ লাগানোর কার্যক্রমও গ্রহণ করা যাবে। এছাড়া খাল খনন কর্মসূচী আরও উৎসাহিত করার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে স্বর্ণের মেডেল প্রদানের সিদ্ধান্তও (ঐ) সভায় নেওয়া হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩৩। ২৪-২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন'-এর ১৯৯২-এর দু'দিনব্যাপী সম্মেলন উপলক্ষে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে ঢাকায় ইনস্টিটিউশনের প্রধান মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সাবেক সচিব ও 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন'-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এস. এম আল-হোসাইনী। উক্ত সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। মূল নিবন্ধের ওপর আলোচনায় বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন (জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের) সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রকৌশলী ডঃ আর. এ. গণি, দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, ডেসার তৎকালীন চেয়ারম্যান এস. টি. এস. মাহমুদ ও পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া (লেখক)। উপরোল্লিখিত ঐ সেমিনারের সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন তিতাসের তরুণ প্রকৌশলী-ব্যবস্থাপক ওসমান গণি, ঢাকা চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের তৎকালীন সচিব এস. এম. এ. হাকিম, প্রকৌশলী মাহবুব-উল হক, প্রকৌশলী আবুল হায়াত প্রমুখ।

২৩৪। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন আয়োজিত 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, "বিগত ৩৫ বৎসরের উন্নয়নের অর্থনীতি ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, সমাজ ও মানুষের সর্বতোমুখী উন্নতিকে আগাইয়া নিবার মত চিন্তা ও প্রচেষ্টা এদেশে নাই। চিন্তা ও মননের দারিদ্র্যহেতু ভিন্নদেশী উন্নয়ন চিন্তার ব্যর্থ অনুকরণ এখানে চলিতেছে। বিকেন্দ্রীকরণের অসফলতা, মানুষের হাতে জীবন-জীবিকা নির্মাণের বাস্তব অধিকারের অনুপস্থিতি, স্থানীয় পরিকল্পনার অনুপস্থিতি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরে ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশ অনগ্রসর। শিল্প-বণিক সমিতিসহ নানান চাপদাতাগোষ্ঠী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখিতেছে। কিন্তু নব্য শিল্পপতি, বণিকশ্রেণী দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের কোন পথ রচনা করিতেছে না। রাজনৈতিক দলের কাছে অযাচিত সুবিধার খোঁজে শ্রমিকেরা সাধারণের স্বার্থ-বিরোধী কর্মে লিপ্ত। সাংবাদিকেরা অনেকে বিদেশে চাকুরী, ঋণ সন্ধান, 'রাজউকের' জমির জন্য পেশার দৃঢ়তা জলাঞ্জলি দিতেছেন। বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবীর দায়িত্ব পালন অকুণ্ঠ নয়। সজ্ঞান উন্নয়ন চর্চাই আমাদের এ অন্ধকার হইতে মুক্তি দিতে পারে।"

২৩৫। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন' আয়োজিত 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধের ওপর বক্তব্য রাখার এক পর্যায়ে প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী প্রকৌশলী ডঃ আর. এ. গণি বর্তমান (বিএনপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের উৎপাদন বিমুখ আমদানীশুল্কমনস্ক আমদানী নীতি ও অলস রিজার্ভের অর্থনীতির সমালোচনা করেন।

২৩৬। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন' আয়োজিত 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধের ওপর বক্তব্য রাখার প্রারম্ভে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বলেন, "স্বাধীন দেশে উন্নয়ন চর্চা ও উন্নয়ন ধারায় সর্বস্তরের ব্যক্তি মানুষের সমষ্টিগত উদ্যমকে যুক্ত করার জন্যই আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আইনের শাসনের জন্য সংগ্রাম করেছি।" তারপর ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন উন্নয়নের জন্য চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভ্রান্ত কর্মকৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "হঠাৎ করে কিছু লোক এসে উন্নয়ন দেবার কথা শোনালে উন্নতি আসে না, তা প্রমাণিত হয়েছে। আইন, শিক্ষা, শ্রম, শিল্প-বাণিজ্যের দিক হতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় অবস্থা পরিবর্তনের জন্য একত্র হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সার্বজনীনতা লাভ করে। আইনের শাসন ও উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মতোই চিন্তার স্থিতিশীলতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণ, চেম্বারের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজনীয় হলেও ব্যক্তিকেন্দ্রীক শাসনে তা গড়ে উঠতে পারেনি। বিকেন্দ্রীকরণ ও এক ব্যক্তির শাসন একত্রে অগ্রসর হতে পারে না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা চাপিয়ে দিয়েও অগ্রগতি কিছু ঘটেনি। ক্ষমতায় কে গেলো না গেলো তা গণতন্ত্রের একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে না। গণতন্ত্র ও উন্নয়নে জনগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়াই গণতন্ত্রের লক্ষ্য।"

২৩৭। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন' আয়োজিত 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধের ওপর বক্তব্য রাখার আর এক পর্যায়ে শিল্পাঙ্গনে বিরাজমান নৈরাজ্যের জন্য, সত্যিকার ট্রেড ইউনিয়নের অভাবের জন্য, শ্রমিক সংগঠনের ওপর রাজনৈতিক দলের প্রভাবকে দায়ী করে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বলেন, "উৎপাদনে মালিকের মুনাফা খানিকটা থাকলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে জাতীয় স্বার্থ আছে। তাই, শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থের সংঘাতের মধ্যে শিল্পের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে বিবেচনায় রাখতে হবে। মালিকেরা শোষক, শ্রমিকেরা সব ভালো—তা সত্য নয়।" তারপর অবাধ উদ্যমের ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বলেন, "আমলা দ্বারা শিল্প পরিচালনা কোনভাবেই জনকল্যাণ নিশ্চিত করে না। আবার বেসরকারী খাতের ওপরেও রাষ্ট্রের ভূমিকা সংরক্ষিত থাকা উচিত। এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারী শাসনে চেম্বারগুলোর ভূমিকা পর্যন্ত বিকৃত হয়েছে।" তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে বুদ্ধিবৃত্তি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিন্তা-চৈতন্যে স্বৈরাচার আমলের ঝোঁক ও প্রবণতা তখনও অব্যাহত থাকার সমালোচনা করে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবির সাথে দূত হওয়া, দূতাবাসে চাকুরী লাভ, ব্যবসায়ী হবার জন্য ঘুরে বেড়ানো অসংগত।"

২৩৮। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন' আয়োজিত 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বিগত পৌনে দু'শত বছরের উন্নয়ন চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রয়োগিক ইতিহাসের প্রতি ইংগিত করে বলেন, "বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের গুণাবলী ও আচরণ, বিচারালয়স্বীকৃত আইনগত অধিকারের পরিধি, সম্পত্তির ওপর অধিকার, লোকপ্রশাসনের প্রশিক্ষণের মান বাড়িয়েছে; কিন্তু সিভিল সার্ভিসের নিরপেক্ষতা ও কর্মানুরাগের ক্ষেত্রে শোচনীয় অবনতি ঘটেছে। মন্ত্রী নোট না রেখে ফাইল দিলে সাবেক সেকশন অফিসার ও বর্তমান সহকারী সচিবদের কাছে তা মাসের পর মাস পড়ে থাকে। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপার থাকলে তদবিরে তা ধামাচাপা পড়ে। সহকারী সচিব দৃশ্যত ব্যস্তভাব দেখালেও তিনি কি কাজ করেন সবাই জানেন।" তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের আর এক পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, "বিদেশে যে ডাক্তার জ্বরে বেঘোর আপন বাচ্চা ঘরে ফেলে রেখে হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেন, এদেশে বলা-কওয়া ছাড়াই তাঁদেরই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন অনুপস্থিত থাকেন। মাসের শেষে পুরা মাসের হাজিরা দেখিয়ে সিভিল সার্জেনের সাথে দেখা করে যান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষকদের মধ্যে হেডমাস্টারসহ ৩ জন 'নিজেদের যোগসাজশে' গরহাজির থাকেন। থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে পাকাপাকি ব্যবস্থাও তাঁরা করে নেন। জন-প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান থাকলে এমন অব্যবস্থা দেখা দিতো না।" তারপর, নিজেকে আশাবাদী হিসেবে বর্ণনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "তবুও, শিক্ষায়, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো উন্নয়ন মডেলে, আখতার হামিদ খানের 'কুমিল্লা পদ্ধতিতে' কিছু অগ্রগতি হয়েছে।"

২৩৯। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯২) তারিখে 'বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন' আয়োজিত 'বাংলাদেশে উন্নয়ন চর্চা' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে প্রকৌশলী এস. এম. আল-হোসাইনী বলেন, "পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। অর্থনীতি পরনির্ভরতায় বিষণ্ণ। বিদেশী সাহায্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১১ শতাংশ থেকে সাড়ে ৬ শতাংশে নেমেছে। বিনিয়োগ কমছে। পণ্যোৎপাদন খাতে দশকব্যাপী বন্ধ্যাত্ব স্থায়ী হয়ে আছে। সরকারের ভূমিকায় জনগণ দ্বিধান্বিত। শিল্পায়নসহ নানান ক্ষেত্রে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। রাজনৈতিক দলগুলো একযোগে কিছু করবে, তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। জনসংখ্যাকে পহেলা নম্বর সমস্যা বলায় কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। এখন শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।"

২৪০। ২৭শে জানায়ারী (১৯৯৩) তারিখে রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, বিভাগীয় দুটো শহর খুলনা ও রাজশাহী, এই চারটির সিটি কর্পোরেশন বাদে দেশের অন্যান্য জেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের পৌরসভাগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ইতিপূর্বে ১৯৯২ সালের ৯ নম্বর আইনের মাধ্যমে 'পৌরসভা অর্ডিন্যান্স (১৯৭৭)'-এর সংশোধন করেন। এই 'পৌরসভা সংশোধন আইন (১৯৯২)'-এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি পৌরসভার মেয়াদ পূর্বের ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছরে বর্ধিত করা হয়। প্রতিটি পৌরসভার প্রধান, 'চেয়ারম্যান' সেই পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের সার্বজনীন সরাসরি ভোটে এবং 'কমিশনার-দের' তাঁদের স্ব স্ব আসনের জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটারদের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত করার বিধি-বিধান রয়েছে ১৯৭৭ সালের 'পৌরসভা অর্ডিন্যান্স'-এ। 'পৌরসভা সংশোধন আইন (১৯৯২)'-এ ঐ সমস্ত বিধি-বিধানের কোন সংশোধন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে দেশে যেখানে জাতীয় পর্যায়ে সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী প্রধান বা সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী জাতীয় সংসদে সাংসদদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন-ভোটে নির্বাচিত হন, সেখানে ক্ষুদ্র দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী 'পৌরসভার' চেয়ারম্যানদের ১৯৯১-এর ১৫ই সেপ্টেম্বরপূর্ব রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির ব্যবস্থায় নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা কেন রাখা হলো সে সম্পর্কে নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, ভোটারদের সরাসরি ভোটে পৌরসভার 'চেয়ারম্যানদের' নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থায় উক্ত পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রচুর অর্থকড়ি ও সময়-শক্তি ব্যয় করতে হয়। সে কারণে এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের অনেকের মধ্যে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতার উদ্রেক হওয়ার আশংকা থাকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। 'পৌরসভা' সংস্থার ব্যাপারে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে। তা হচ্ছে পৌরসভায় মহিলাদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যক সংরক্ষিত 'মহিলা কমিশনার' মনোনীত করার বিষয়টি। দেশে যখন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপ দানের বিষয়টি সার্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়েছে, সেখানে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক সংরক্ষিত 'মহিলা কমিশনার' পদে মনোনয়ন প্রদান করা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের রীতিনীতি ও চিন্তা-চেতনাপরিপন্থী। এছাড়াও, সংসদীয় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতির বহুদলীয় সার্বজনীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনোনয়ন দান প্রথাটি বেখাপ্পা, বেমানান। উপরন্তু এটা একটি স্বৈরাচারী বিধি-ব্যবস্থাও বটে। 'পৌরসভাসহ যে কোন গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় শুধু মহিলা কেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীর প্রতিনিধিত্ব নানান কারণে প্রয়োজন। তারা যে এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে অনেক সহায়ক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে, তাঁদের অবশ্যই এসব সংস্থার সার্বজনীন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত কমিশনারদের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত কমিশনারবৃন্দ কর্তৃক যাঁরা এসব সংস্থায় বা প্রতিষ্ঠানে মহিলা বিষয়ে কিংবা বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ে সহায়তা বা উপদেশ-পরামর্শ প্রদানের জন্যে নির্বাচিত হবেন তাঁদের 'পরামর্শক বা উপদেষ্টা কমিশনার' হিসেবে অভিহিত করা যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। এখানে আরও একটি শর্ত আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। তা হচ্ছে এই যে, যেহেতু তাঁরা মহিলা বিষয়ে কিংবা বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ে পরামর্শক-উপদেষ্টা কিংবা বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালনের জন্য নির্বাচিত হবেন, সেহেতু তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকাসহ কোন না কোন বিশেষ বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

২৪১। ১৯৯২ সালে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার দেশের ৬৪টি জেলার 'জেলা পরিষদ', উপজেলা (বর্তমান থানা) পর্যায়ে 'উপজেলা পরিষদ' ও গ্রাম পর্যায়ে 'ইউনিয়ন পরিষদ'-এর ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ও পর্যালোচনা করা দেশের তথা জনগণের স্বার্থে শুধু সমীচীন ও যুক্তিযুক্তই নয়, আবশ্যকীয়ও বটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত 'পৌরসভা', 'জেলা পরিষদ', 'উপজেলা (বর্তমানে থানা) পরিষদ' ও 'ইউনিয়ন পরিষদ'-গুলো সার্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গঠিত হওয়া উচিত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হওয়া উচিত স্ব স্ব নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা-স্বাস্থ্যপরিচর্যা, গণপূর্ত কর্মকাণ্ড, গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মৎস্য, পশু, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমাজসেবা-মূলক কর্মকাণ্ড, ক্রীড়া-খেলাধূলার আয়োজন-অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন, শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়ন, আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, আইন-শৃংখলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ইত্যাদির দেখাশোনা ও দায়িত্ব পালন করা। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলের শেষার্ধে গ্রাম পর্যায়ে 'গ্রাম-পঞ্চায়েত', মহকুমা পর্যায়ে 'তেহসিল' ও জেলা পর্যায়ে 'জেলা বোর্ডে'র প্রবর্তন করা হয়েছিলো। কিন্তু সেগুলোর প্রধান কাজ ছিলো ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ রক্ষা, যথা: খাজনা-রাজস্ব, ট্যাক্স, বিভিন্ন লেভী, টোল ইত্যাদি আদায় করা এবং স্ব স্ব এলাকায় আইন-শৃংখলা রক্ষায় সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। জনসেবা-সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদির উন্নয়নে বৃটিশ শাসন আমলে সেসব প্রতিষ্ঠানের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো না বললেই চলে। সর্বোপরি, বৃটিশ আমলে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন না। তাঁদের অনেকে ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা এবং অবশিষ্টরা হতেন সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত।

২৪২। পাকিস্তানী শাসন আমলে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র আদেশ (১৯৫৯)'-এর মাধ্যমে সীমিত গণতন্ত্রসহ গ্রাম পর্যায়ে 'ইউনিয়ন পরিষদ', মহকুমা পর্যায়ে 'তেহসিল কাউন্সিল', জেলা পর্যায়ে 'জেলা কাউন্সিল' ও বিভাগীয় পর্যায়ে 'বিভাগীয় কাউন্সিল'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ চার স্তরের 'স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় একমাত্র ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হতেন। জেনারেল আইয়ুব খানের 'বুনিয়াদি (বেসিক) গণতন্ত্রকে' সীমিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা হতো এই কারণে যে, জনগণের সার্বজনীন ভোটে নয়, কেবল 'ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রের রাষ্টপতি, 'কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট (পরিষদ বা সংসদ)'- এর সদস্যরা এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রদেশগুলোর 'প্রাদেশিক এ্যাসেমব্লী (পরিষদ বা সংসদ)'-এর সদস্যরা নির্বাচিত হতেন। 'তেহসিল কাউন্সিল', 'জেলা কাউন্সিল' ও 'বিভাগীয় কাউন্সিল'-এর প্রধানসহ অনেক সদস্য ছিলেন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সরকারী কর্মকর্তা এবং অবশিষ্টরা ছিলেন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি। সেসব কাউন্সিল (বা পরিষদ)-কে কিছু কিছু জনসেবা-সমাজসেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দেখাশোনা ও পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু সেসবের অন্যান্য ভূমিকা ছিলো বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে সৃষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও ভূমিকার প্রায় অনুরূপ। উল্লেখ্য, সেসব প্রতিষ্ঠানের মেয়াদকাল ৫ বছর নির্ধারিত ছিলো।

২৪৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসন আমলে ১৯৭৩ সালের 'রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশ' -এর মাধ্যমে দেশের ৬০টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরের মাধ্যমে: (১) গ্রাম পর্যায়ে জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও ৯ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'ইউনিয়ন পরিষদ': (২) থানা পর্যায়ে 'থানা পরিষদ' এবং (৩) জেলা পর্যায়ে 'জেলা পরিষদ' গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সেসব পরিষদের মেয়াদকাল এবং ভূমিকা ও দায়িত্ব ছিল আইয়ুব খানের আমলে ১৯৫৯ সালে প্রবর্তিত 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' অর্ডার (১৯৫৯)-এ উল্লিখিত ভূমিকা ও দায়িত্বের ঠিক অনুরূপ। তাঁর শাসন আমলের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীতে বাংলাদেশে জনগণের (প্রাপ্ত বয়স্কের) সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি ও এক দলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকারগুলোকে স্ব স্ব নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা-স্বাস্থ্যপরিচর্যা, গণপূর্ত কর্মকাণ্ড, গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মৎস্য, পশু, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন, স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড, ক্রীড়া-খেলাধূলার ব্যবস্থা-আয়োজন-অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন, শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশ, আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, আইন-শৃংখলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ইত্যাদির সংগঠনের ও দেখাশোনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করার কথা তাঁর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তব্য, বক্তৃতা ও ভাষণে বলেছিলেন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরুও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালে 'রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশ (১৯৭৩)'-এর মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্ট 'ইউনিয়ন পরিষদ', 'থানা পরিষদ' ও 'জেলা পরিষদ'-এর প্রধানকে সংশ্লিষ্ট পরিষদের (ভোটাধিকারী) সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে ক্ষমতা (বা পদ) থেকে অপসারণ করার বিধি-বিধান ছিল, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী প্রশাসকের কার্যনির্বাহী আদেশ বলে নয়।

২৪৪। তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের গোড়ার দিকে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৭৬)' জারির মাধ্যমে 'ইউনিয়ন পরিষদ', 'থানা পরিষদ' ও 'জেলা পরিষদ'-এর মেয়াদকাল ৫ বছরে অপরিবর্তিত রেখে অন্যান্য অনেক বিধিবিধানের সংশোধন করা হয়। সেসব সংশোধন মোতাবেক 'ইউনিয়ন পরিষদ'-এর কাঠামো এবং দায়িত্ব ও ক্ষমতার বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়। প্রথমত, পূর্বতন 'ইউনিয়ন পরিষদ'-এর ভাইস চেয়ারম্যানের পদ বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭৬-এর 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশেও' 'ইউনিয়ন পরিষদ'-এর চেয়ারম্যানদের পূর্বের মতোই প্রতিটি ইউনিয়ন-এ বসবাসরত জনগণের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে এবং ৯ জন সদস্যের ৯টি পৃথক ওয়ার্ডের জনগণের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধি-বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে, ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে' 'ইউনিয়ন পরিষদে' সরকার অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসক কর্তৃক ২ জন মহিলা ও ২ জন কৃষক সদস্য মনোনীত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'ইউনিয়ন পরিষদসহ' যে কোন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে মহিলা বিষয়ের জন্য মহিলাসহ আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ জাতীয় মনোনীত ব্যক্তিদের সেসব প্রতিষ্ঠানে ভোট দানকারী সদস্যের পদমর্যাদা প্রদান করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়াও, এ জাতীয় মনোনীত মহিলাসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে বেসরকারী কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের প্রথা রাখা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তা সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রের রীতিনীতিপরিপন্থী। এ জাতীয় মহিলা ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলা ও বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। পরিশেষে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে' 'ইউনিয়ন পরিষদে'র ওপর ৪০টি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো রাজস্ব আদায়, গণপূর্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি'র মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কিছু ছোটখাটো অপরাধের বিচার সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা। 'ইউনিয়ন পরিষদে'র আয়ের উৎস ছিলো, ১৯৫৯ সালের 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র আদেশে' উল্লিখিত ঠিক একই উৎস ও উপায়সমূহ।

২৪৫। ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে' 'থানা পরিষদ', পদাধিকারবলে সাবডিভিশনাল অফিসারকে চেয়ারম্যান, সার্কেল অফিসারকে ভাইসচেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট থানার সকল 'ইউনিয়ন পরিষদে'র চেয়ারম্যানদের সদস্য করে গঠন করার বিধি-বিধান রাখা হয়। থানার ইউনিয়ন পরিষদগুলোর উন্নয়ন প্লানের ভিত্তিতে থানার উন্নয়ন প্লান প্রস্তুতকরণ, থানার ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান এবং (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক অর্পিত বা প্রদত্ত কোন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করা 'থানা পরিষদ'-এর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো। এসব ছাড়াও, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও থানার 'ইউনিয়ন পরিষদগুলোর' কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানও 'থানা পরিষদে'র দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পদাধিকার বলে 'সাবডিভিশনাল অফিসার' কর্তৃক 'থানা পরিষদ'কে প্রদত্ত যাবতীয় কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিলো ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে'। 'থানা পরিষদে'র সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত এর সাধারণ সভায় অথবা এর বিভিন্ন কমিটির সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করার বিধি বিধান ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে' রাখা হয়। উল্লেখ্য, 'থানা পরিষদে'র কোন রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ছিলো না। (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানই ছিলো এর ফান্ডের একমাত্র উৎস।

২৪৬। ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে' 'জেলা পরিষদ' জেলার নির্দিষ্ট সংখ্যক এলাকার জনগণের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, সরকার কিংবা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীত মহিলা সদস্য এবং পদাধিকারবলে জেলার কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা ও কতিপয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গের সমন্বয়ে গঠন করার বিধি-বিধান রাখা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক 'জেলা পরিষদে'র চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানের জেলা পরিষদের নির্বাচিত ও মহিলা সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে কখনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তার পরিবর্তে জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং অপর একজন সরকারী কর্মকর্তা (যথা: সহকারী গ্রাম উন্নয়ন পরিচালক অথবা সহকারী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালক) জেলা পরিষদের যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। 'জেলা পরিষদে'র ওপর মোট ৯৭টি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছিলো। সেগুলোর মধ্যে কিছু ছিলো বাধ্যতামূলক এবং অবশিষ্টাংশ ঐচ্ছিক। জেলা পরিষদকে জেলার সকল স্থানীয় পরিষদ, মিউনিসিপ্যাল সংস্থা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করার বিধি-বিধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা হয়েছিলো ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে'। ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ' মোতাবেক উল্লেখযোগ্য প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো জেলার পাঠাগার, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, সেতু, বাগান, খেলার মাঠ, রেস্ট হাউস ইত্যাদির নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত করা। জেলা পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস ছিলো (কেন্দ্রীয়) সরকারের অনুদান, বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স, লেভী, টোল ইত্যাদি।

২৪৭। জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৭১)'-এর এক সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার'-এর প্রবর্তন করা হয়। প্রতিটি গ্রামের ২ জন মহিলাসহ ১১ জন সদস্য ও একজন 'গ্রামপ্রধানের' সমন্বয়ে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকারে'র 'গ্রামপ্রধান ও সদস্যদের' একটি সভায় গ্রামের উপস্থিত জনগণের সমঝোতা অথবা ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা ছিলো। 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকারে'র সদস্যদের এমনভাবে নির্বাচন করার কথা ছিলো যাতে গ্রামের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম, সমর্থ ও যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে এক সামরিক আইন আদেশ বলে ঐ 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

২৪৮। ১৯৮২ সালে দেশের জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত সরকারকে সংবিধান লংঘনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তার তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস)' অধ্যাদেশ (১৯৮২) জারির মাধ্যমে দেশের থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিটগুলোকে 'উপজেলা' (Sub-District) নামকরণ করে 'উপজেলা পরিষদ' গঠন এবং পূর্বতন থানা প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। ঐ অধ্যাদেশে পূর্বতন প্রতিটি থানা দফতরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত দফতরগুলোর কর্মকাণ্ড একটিমাত্র প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে সেসব সুসমন্বিতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান রাখা হয়। তার ফলে, পূর্বতন থানার প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষা, শিক্ষা, পূর্ত কর্মকাণ্ড, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষি এবং মৎস্য ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, চিকিৎসা-স্বাস্থ্যপরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড দেখাশোনা ও পরিচালনার দায়িত্ব 'উপজেলা পরিষদ' এবং 'উপজেলা প্রশাসনের' ওপর কিছু কিছু ভাগাভাগি আর অবশিষ্টাংশ সংযুক্তভাবে ন্যস্ত করা হয়। একই সংগে, 'উপজেলা পরিষদে'র চেয়ারম্যানকে প্রশাসনিক ও অর্থ-সম্পর্কিত ব্যাপারে অত্যধিক ব্যাপক কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। উপরোল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও, ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে'র বিভিন্ন বিধি-বিধান বলে দেশের প্রতিটি পূর্বতন থানা দফতরে সর্বনিম্ন স্তরের বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রণালী হিসেবে বিচারালয় প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, দেশের 'থানা ইউনিট'গুলোর 'উপজেলা' নামকরণে বিশেষ আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, থানার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পুলিশ স্টেশন'। তাছাড়া 'থানা' নাম উচ্চারণে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের একরূপ 'গন্ধ' পাওয়া যায়, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্মৃতি মানসপটে জেগে ওঠে। উপরন্তু ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে প্রতিটি উপজেলায় একাধিক পুলিশ স্টেশন (থানা) অথবা পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হতে পারে। তবে, 'উপজেলা পরিষদে'র ভোটাধিকারী সদস্য মনোনয়নের বিষয়টি গণতন্ত্রের রীতিনীতিপরিপন্থী। সোজা ভাষায় অগণতান্ত্রিক। কিন্তু সামরিক সরকারের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাটাই যে স্বাভাবিক, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া 'উপজেলা পরিষদে'র মনোনীত সদস্যদের জন্য কোন ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কোনরূপ শর্ত না রাখা বিশেষভাবে আপত্তিকর। যাহোক, ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে'র মাধ্যমে 'উপজেলা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা এবং তার চেয়ারম্যানকে প্রশাসনিক ও অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অত্যধিক ব্যাপক কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রদানের পেছনে তৎকালীন মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থাকলেও উপজেলা ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও সেসবের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও কার্যকর করার যে অনেক সুযোগ-সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়েছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৪৯। ১৯৮৩ সালে তৎকালীন সামরিক জান্তার নেতা সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ' জারির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি 'ইউনিয়ন পরিষদ'কে কিছু অতিরিক্ত প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনে'র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার 'জেলা পরিষদে'র পুনর্বিন্যাস করে সেসবের ওপর কিছু অতিরিক্ত প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পুনর্বিন্যস্ত 'ইউনিয়ন পরিষদে' ভোটাধিকারী সদস্যের এবং 'জেলা পরিষদে' কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা ও সদস্যের মনোনয়ন দানের বিষয়টি যে গণতন্ত্রের রীতিনীতির পরিপন্থী ছিলো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়াও মনোনীত সদস্যদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার শর্ত আরোপ না করার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে আপত্তিকর।

২৫০। ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে'র বিধি-বিধান অনুযায়ী 'ইউনিয়ন পরিষদ' সম্মিলিতভাবে ছিলো সকল ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইউনিয়ন পরিষদ' ১ জন চেয়ারম্যান এবং সরকার কিংবা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ৩ জন মহিলা সদস্যসহ ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিলো ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে'। ঐ অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসারে প্রতিটি 'ইউনিয়ন পরিষদে'র চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নির্দিষ্ট সারা এলাকায় বসবাসকারী ভোটারদের এবং ৯ জন সদস্যের সে ইউনিয়নের ৩টি পৃথক ওয়ার্ডে বসবাসকারী ভোটারদের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিটি থেকে ৩ জন করে সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ' মোতাবেক 'ইউনিয়ন পরিষদে'র মেয়াদকাল ছিলো ৩ বছর।

২৫১। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে 'ইউনিয়ন পরিষদে'র ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহকে নিম্নোল্লিখিত ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ (১) পৌর (civic) সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য; (২) আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য; (৩) রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা; (৪) উন্নয়নমূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং (৫) (কেন্দ্রীয়) সরকার ও 'উপজেলা পরিষদ' কর্তৃক হস্তান্তরিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদিও ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে' ৩৮টি পৌর সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ রয়েছে, তবে সেখানে 'ইউনিয়ন পরিষদ'কে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করতে বিশেষভাবে বলা হয়ঃ (ক) আইন-শৃঙ্খলা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান; (খ) বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্যে কৃষি, বৃক্ষ ও বন-সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ, শিক্ষা, চিকিৎসা-স্বাস্থ্যপরিচর্যা, কুটিরশিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির উন্নয়নে 'উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন; (ঘ) পরিবার পরিকল্পনার উন্নতি; (ঙ) উপজেলা কর্তৃক যেসব উন্নয়ন প্রকল্প হস্তান্তর করা হবে, সেসবের বাস্তবায়ন; (চ) স্থানীয় সম্পদ-উপায়াদির যোজন ও তার ব্যবহার; (ছ) সরকারী সম্পত্তি যেমন, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইনসমূহের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; (জ) ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিদর্শন-পুনঃরীক্ষণ এবং সেসব সম্পর্কে 'উপজেলা পরিষদ'কে মতামত-সুপারিশ প্রদান; (ঝ) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা-শৌচাগার স্থাপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিতকরণ; (ঞ) মানুষের জন্ম, মৃত্যু, ভিক্ষুক ও নিঃস্বদের নিবন্ধিকরণ; (ট) সর্বপ্রকার লোক-গণনা, আদমশুমারির পরিচালনা ইত্যাদি। ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে' উল্লিখিত দায়িত ও কর্তব্যসহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও এজেন্সী কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে 'ইউনিয়ন পরিষদ'কে আরও অনেক অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন সনদপত্র জারিকরণ, ব্যাপারী বা পরিবেশক নির্বাচন, ত্রাণ কার্য সম্পাদন, ধার-দেনা-ঋণের ব্যাপারে ছাড়পত্র প্রদান, চিকিৎসার ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান, সালিশী আদালতে না পাঠিয়ে বিভিন্ন ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদ সম্পর্কিত বিষয়ের নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদি অতিরিক্ত কার্যাদির দায়িত্বও 'ইউনিয়ন পরিষদ'কে পালন করতে হয়।

২৫২। ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে'র সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান মোতাবেক 'উপজেলা পরিষদ' (১) একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, (২) প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে উপজেলার এখতিয়ারভুক্ত সকল 'ইউনিয়ন পরিষদে'র চেয়ারম্যানবৃন্দ, (৩) উপজেলায় বসবাসরতদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ জন মহিলা সদস্য, (৪) উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন অফিসে কর্মরত অফিসারদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক বিনির্দিষ্ট ভোট দান ক্ষমতার অধিকারবিহীন পদ হেতু সদস্য, (৫) উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান এবং (৬) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য ও উপযুক্ত পুরুষ ব্যক্তিদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক একজন মনোনীত পুরুষ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। 'উপজেলা পরিষদে'র সকল 'প্রতিনিধি সদস্য' এবং সরকার কিংবা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য 'উপজেলা পরিষদে'র (সাধারণ) সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগ অর্থাৎ ভোট প্রদান করতে পারেন। ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে'র সংশিষ্ট বিধি-বিধান মোতাবেক 'উপজেলার চেয়ারম্যান', উপজেলার এখতিয়ারভুক্ত ও বিনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও পদস্থ উপজেলা প্রশাসনের 'প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা', 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' (UNO), উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশ' অনুযায়ী 'উপজেলা পরিষদে'র মেয়াদকাল ছিলো ৫ বছর।

২৫৩। ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে' উল্লিখিত 'প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি' অনুসারে দেশের প্রতিটি 'উপজেলা' (পূর্বের থানা) একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র বা ইউনিটে পরিণত হয়। ঐ নতুন ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি 'উপজেলা পরিষদ' একটি 'সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান' হিসেবে পরিগণিত হয়। এক অর্থে 'উপজেলা সদর' প্রশাসনের অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (Pivot) হিসেবে পূর্বতন জেলা প্রশাসনের প্রতিস্থাপকে পরিণত হয় ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে'র মাধ্যমে। পূর্বে জেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতো, ঐ নতুন ব্যবস্থায় তার অনেক দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা 'উপজেলা পরিষদ' এবং উপজেলা প্রশাসনের ওপর অর্পিত হয়।

২৫৪। 'উপজেলা পরিষদ' ও 'উপজেলা প্রশাসন' ব্যবস্থায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক 'সংরক্ষিত বিষয়াদি' এবং (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক 'হস্তান্তরিত বিষয়াদি'। 'উপজেলা পরিষদ' ও 'উপজেলা প্রশাসন' ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয সরকার কর্তৃক 'সংরক্ষিত বিষয়াদির' মধ্যে নিম্নোল্লিখিত দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (১) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা; (২) দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা; (৩) কেন্দ্রীয় রাজস্ব, যেমন আয়কর, শুল্ক, অন্তঃশুল্ক (আবগারী), ভূমি-উন্নয়ন কর, বিক্রয় কর ইত্যাদির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা; (৪) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ-রক্ষণ; (৫) ভারী শিল্প স্থাপন; (৬) একাধিক জেলার জলসেচ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা; (৭) খনিজ সম্পদের উন্নয়ন ও আহরণ; (৮) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ; (৯) প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থাপনা; (১০) আধুনিক হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সংগে সংযুক্ত হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা; (১১) আন্তঃজেলা ও আন্তঃউপজেলা যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা; (১২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং (১৩) জাতীয় যাবতীয় পরিসংখ্যান সংকলন ইত্যাদি।

২৫৫। (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক 'উপজেলা পরিষদ' এবং 'উপজেলা প্রশাসন'-এর ওপর 'স্থানান্তরিত বিষয়াদির' মধ্যে নিম্নোল্লিখিত দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (১) সম্প্রসারণ সেবা, প্রসম্ভার (Input) সেবা ও জলসেচসহ কৃষি সম্পর্কিত কর্মসূচি; (২) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা; (৩) উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ, প্রসূতি-শিশু হাসপাতাল (MCH) ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেবাসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি; (৪) গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য-বিধান কর্মসূচি; (৫) গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচি; (৬) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি; (৭) ভালনারাবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ইনস্টিটিউশনাল গ্রুপ ফিডিং (IGF) ইত্যাদিসহ সমূহ দুর্ঘটনায় ত্রাণকার্য; (৮) সমবায় ও সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং (৯) মৎস্য ও পশু সম্পদের উন্নয়ন ইত্যাদি।

২৫৬। ১৯৮২ সালের 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশে'র মাধ্যমে (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক 'উপজেলা পরিষদ' এবং 'উপজেলা প্রশাসনে'র ওপর 'স্থানান্তরিত' উপরোল্লিখিত বিষয়াদির তালিকা থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, 'উপজেলা পরিষদে'র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হয় তার এখতিয়ারভুক্ত ও বিনির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, সে সবের উন্নতি ও বাস্তবায়ন করা। স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্প ও কৃষির সমৃদ্ধি এবং স্থানীয় কর্ম সংস্থান ও চাকুরির ব্যবস্থা করার দায়িত্বও অর্পিত হয় 'উপজেলা পরিষদ' এবং 'উপজেলা প্রশাসনের' ওপর। 'বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন প্লানে'র অর্থ সংস্থানে (কেন্দ্রীয়) সরকার প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর 'থোক (অর্থ)' বরাদ্দ করে। (কেন্দ্রীয়) সরকারের যথাক্রমে 'পরিকল্পনা কমিশন' ও 'স্থানীয় সরকার বিভাগ' 'উপজেলা'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে এবং সেসব বাস্তবায়নে উপজেলা কর্তৃপক্ষসমূহকে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা ও কার্যকরী নির্দেশ প্রদান করে। উন্নয়নমূলক কার্যাদির দ্রুত বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানে 'বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন প্লান' (AUDP) অনুমোদনের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা 'উপজেলা পরিষদে'র ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতিপূর্বে, পূর্বতন 'থানা পরিষদ প্লান' পরীক্ষা ও অনুমোদনের ক্ষমতা ছিলো 'জেলা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষে'র ওপর ন্যস্ত। এ সমস্ত উন্নয়নমূলক 'স্থানান্তরিত বিষয়ে'র ব্যাপার ছাড়াও, (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক 'সংরক্ষিত বিষয়াদির' ব্যাপারে জড়িত উপজেলা সদরে পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের 'উপজেলা পরিষদে'র নিকট জবাবদিহি করা হয়। সর্বোপরি, 'উপজেলা পরিষদ'কে সেসব কর্মকর্তার কাছ থেকে তাদের স্ব স্ব কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিবেদন, তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অফিস পরিদর্শন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যে কোন গাফলতি ও অবহেলা সম্পর্কে (কেন্দ্রীয়) সরকারের নিকট রিপোর্ট করার অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়।

২৫৭। ১৯৮৮ সালের 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনে' 'জেলা পরিষদ' (১) জেলার নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, (২) জেলার 'উপজেলা পরিষদ' ও 'পৌরসভা-সমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, (৩) নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীত পুরুষ সদস্য, (৪) নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীত মহিলা সদস্য এবং (৫) জেলার ডেপুটি কমিশনারসহ জেলা পর্যায়ের কতিপয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। 'জেলা পরিষদে'র চেয়ারম্যান পদে সরকার কর্তৃক নিয়োগ দানের বিধি-বিধান রাখা হয়। 'জেলা পরিষদে'র কার্যকাল ছিলো ৩ বছর। ১৯৮৮ সালের 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ)' আইনে, 'জেলা পরিষদে'র ওপর ১২টি 'বাধ্যতামূলক' এবং ৬৯টি 'ঐচ্ছিক' দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়। 'জেলা পরিষদে'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তার এখতিয়ার ও আওতাভুক্ত এলাকার উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, সেসবের অগ্রগতি সাধন ও বাস্তবায়ন করা। জেলা পরিষদের 'বাধ্যতামূলক বিষয়াদির' মধ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (১) জেলার উন্নয়ন তৎপরতার ও কর্মকাণ্ডের সমীক্ষা করা; (২) 'উপজেলা পরিষদ'গুলোর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করা এবং 'উপজেলা পরিষদসমূহের' ও 'জেলা পরিষদে'র হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা; (৩) পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা; (৪) (কেন্দ্রীয়) সরকারের কিংবা উপজেলা পরিষদের কিংবা পৌরসভার এখতিয়ার-আওতাভুক্ত অথবা সেসবের জন্য সংরক্ষিত নয় এমন সব রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, সেসবের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধন করা; (৫) জনসাধারণের ব্যবহার্যে বৃক্ষরোপণ ও রাস্তার পাশের বৃক্ষরাজির সংরক্ষণ করা; (৬) জনসাধারণের ব্যবহার্যে উদ্যান, খেলাধূলার মাঠ ও খোলা জায়গার উন্নতি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষণাবেক্ষণ করা; (৭) (কেন্দ্রীয়) সরকার, উপজেলা অথবা পৌরসভা কর্তৃক রক্ষিত নয় এমন সব 'ফেরিঘাটের' ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা; (৮) 'ডাক বাংলা' ও বিশ্রামাগার স্থাপন ও সেসবের রক্ষণাবেক্ষণ করা; (৯) উপজেলা পরিষদকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং সর্বপ্রকার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা এবং (১০) (কেন্দ্রীয়) সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা। জেলা পরিষদের 'ঐচ্ছিক বিষয়াদির' মধ্যে নিম্নোল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ছিল উল্লেখযোগ্যঃ জেলার এখতিয়ার ও আওতাভুক্ত এলাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধান করা। অধিকন্তু, জেলা পরিষদ গবাদি পশু, হাস-মুরগী পালন, কুটির শিল্প, হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

২৫৮। উপরোল্লিখিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্ব স্ব এখতিয়ার ও আওতাভুক্ত এলাকার ভৌত অবকাঠামো এবং পরিবেশসহ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে 'পৌরসভা', 'জেলা পরিষদ', 'উপজেলা পরিষদ' ও 'ইউনিয়ন পরিষদে'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণে এসব 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা' যে অপরিহার্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 'জেলা পরিষদে'র সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং 'পৌরসভার' সীমিত এলাকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বাইরে দেশের বিপুল (সংখ্যাগরিষ্ঠ) জনগণের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে 'ইউনিয়ন পরিষদ' এবং 'উপজেলা (বা থানা) পরিষদ' ব্যবস্থা অপরিহার্য। বিশেষ করে, 'উপজেলা (বা থানা) পরিষদ' দেশের বিপুল (সংখ্যাগরিষ্ঠ) জনগণের সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (Pivot) হিসেবে মূল্যবান সুদূরপ্রসারী ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একান্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্য। কিন্তু অতীব পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, জনগণের সার্বজনীন ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার (বিএনপি) সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৯১)' এবং 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৯২)' জারির মাধ্যমে (অর্থাৎ কলমের এক খোঁচায়) যথাক্রমে পূর্বতন 'ইউনিয়ন পরিষদ' ও পূর্বতন 'উপজেলা পরিষদ' বিলুপ্ত করে। 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৯১)' জারির মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার পূর্বতন 'ইউনিয়ন পরিষদে'র পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করে। পক্ষান্তরে, 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৯২)' জারির মাধ্যমে পূর্বতন 'উপজেলা পরিষদ' স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করা হয় এবং পূর্বতন 'উপজেলা' প্রশাসনিক এলাকার নামকরণ করা হয় 'থানা' হিসেবে। এই শেষোক্ত কাজটি অত্যন্ত হাস্যকর যার কারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের মতো অনুন্নত (কোমলভাবে অভিহিত উন্নয়নশীল) দেশের অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর বিষয় এই যে, দেশের নেতা-নেত্রীগণ গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি আওড়ান, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপ দানের প্রয়াসে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে চিৎকার করে বুক ফাটান, কিন্তু কার্যত করেন তার উল্টোটা অর্থাৎ অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কর্তৃক 'ইউনিয়ন পরিষদ' এবং 'উপজেলা পরিষদ' বিলুপ্তি ঘোষণা সংক্রান্ত কার্যাদি নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক। সোজা কথায় স্বৈরতান্ত্রিক। দেশের আপামর জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থেই 'উপজেলা পরিষদ' ও 'উপজেলা প্রশাসন' ব্যবস্থা একদিন না একদিন দেশে সুদৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। বোধ হয় সেদিন আর বেশী দূরে নয়।

২৫৯। জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার শুধু 'ইউনিয়ন পরিষদ' পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস এবং 'উপজেলা পরিষদ' ও 'উপজেলা প্রশাসন' ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ (১৯৯১)' জারির মাধ্যমে বেআইনী ও স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় 'পৌরসভাগুলোও' বিলুপ্ত করে সেসবের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করে। তাছাড়াও, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার এক 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৯৩)' জারির মাধ্যমে এবং বেআইনী ও স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় 'জেলা পরিষদ' বিলুপ্ত করে সেসবের পরিচালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করে। যাহোক, ১৯৯২ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়কালে দেশের পুনর্বিন্যস্ত 'ইউনিয়ন পরিষদে'র এবং ১৯৯৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে 'পৌরসভাগুলো'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। খামখেয়ালী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দেশের 'পৌরসভা' ও 'ইউনিয়ন পরিষদ'-এর বিলুপ্তি, পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন এবং 'উপজেলা পরিষদ' ও 'উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা'র স্থায়ীভাবে বিলুপ্তিকরণ এবং পরবর্তীতে তাকে মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত 'থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি' দ্বারা প্রতিস্থাপন ইত্যাদি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতন্ত্রায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান সম্পন করা হয়েছে কি? আসলে হয়নি। এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয়, যথা: 'পৌরসভা'য় ও 'ইউনিয়ন পরিষদে' এখনও পূর্বের মতো নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য এবং 'থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির' সকল সদস্যকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত করার বিধি-বিধান ও ব্যবস্থা কোনমতেই গণতন্ত্রের রীতিনীতিসম্মত নয়। এসব ব্যবস্থার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং স্বৈরতান্ত্রিক মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের প্রতিফলন। উপরন্তু, স্বৈরতান্ত্রিকভাবে এসবের বিলুপ্তি এবং পরবর্তীতে এসবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় অর্থ, সম্পদাদি ও জনবলের অনর্থক-অযথা সময়-শক্তির অপব্যয় ও অপব্যবহার করা হয়।

২৬০। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ইতিপূর্বে জারিকৃত 'স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৯৩)' একটি বিল হিসেবে ৪ঠা জুলাই (১৯৯৩) তারিখে জাতীয় সংসদে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্যে সংসদে উপস্থাপন করে। কিন্তু সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর ঐ বিলের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের তীব্র বিরোধিতা এবং সরকারী দলের সাংসদদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধের কারণে তা সংসদের বিশেষ কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সেই (জেলা পরিষদ) বিলটি এখনও সংসদের বিশেষ কমিটির ডীপ ফ্রীজে হিমায়িত অবস্থায় রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কর্তৃক বহু পূর্বে গঠিত 'স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশনে'র সে ব্যাপারে পেশকৃত মতামত-সুপারিশসম্বলিত প্রতিবেদনের আলোকে ঐ 'জেলা পরিষদ বিল (১৯৯৩)' প্রণীত হয়। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদনে 'জেলা পরিষদে'র ক্ষেত্রে বলা হয়ঃ "জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন নির্বাচিত। জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি থানা থেকে সংশ্লিষ্ট থানার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক দু'জন নির্বাচিত প্রতিনিধি সদস্য এবং জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গ কর্তৃক নির্বাচিত ৩ জন মহিলা সদস্যার সমন্বয়ে 'জেলা পরিষদ' গঠিত হবে। তবে শর্ত এই যে, কোন একটি থানা থেকে একাধিক মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন না। 'জেলা পরিষদে'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন জেলার অন্তর্ভুক্ত 'গ্রাম সভার' সদস্য-সদস্যা এবং ইউনিয়ন পরিষদ-সমূহের সকল চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যার সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যাপকভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে।" 'জেলা পরিষদ' সদস্যদের নির্বাচনের এই পদ্ধতি যে মনোনয়ন দানের প্রথার তুলনায় অধিকতর গণতান্ত্রিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে 'জেলা পরিষদে'র সদস্য পদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের জন্য আবশ্যিকভাবে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন। একই সংগে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের জন্যও ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা একান্ত আবশ্যক। অনুরূপভাবে, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত আরোপ করে থানার প্রতিটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের একজন সদস্য/সদস্যা নির্বাচিত করা যেতে পারে। একই সংগে 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র চেয়ারম্যান পদে, নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা একান্ত আবশ্যক। 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র চেয়ারম্যান উপজেলা বা থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং 'উপজেলা বা থানার পরিষদে'র নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করা যেতে পারে। 'জেলা পরিষদে'র বেলায় 'স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিটি' আরও সুপারিশ করেঃ "জেলার অন্তর্গত 'পৌরসভাসমূহের' চেয়ারম্যানগণ এবং জেলা পরিষদের প্রয়োজনানুসারে জেলার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণ জেলা পরিষদের সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার সকল সংসদ সদস্য-সদস্যা 'জেলা পরিষদে'র 'উপদেষ্টা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। 'জেলা পরিষদে'র কার্যকাল হবে ৫ বছর।"

২৬১। উপরোল্লিখিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমত, পূর্বে উল্লিখিত অপরিহার্যতার কারণে 'ইউনিয়ন পরিষদ', 'উপজেলা বা থানা পরিষদ', 'জেলা পরিষদ', 'পৌরসভা', 'সিটি কর্পোরেশন' ইত্যাদি স্থানীয় সরকার-সমূহের চেয়ারম্যানদের নির্বাচন ব্যবস্থাও বর্তমান সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার প্রধান নির্বাচন ব্যবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত। এটা যে সম্ভব, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং তা বাস্তবায়ন করা একান্ত দরকার। বর্তমানে যেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে 'স্থানীয় সরকার' পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির নির্বাচন-কাঠামো রাখা কোনমতেই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং, প্রতিটি 'ইউনিয়ন পরিষদে'র চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের, 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র চেয়ারম্যান 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র নির্বাচিত সদস্যদের, 'জেলা পরিষদে'র চেয়ারম্যান 'জেলা পরিষদে'র নির্বাচিত সদস্যদের, 'পৌরসভা'র চেয়ারম্যান পৌরসভার নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের এবং 'সিটি কর্পোরেশনে'র মেয়র 'সিটি কর্পোরেশনে'র নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলে, যে কোন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানের এবং যে কোন সিটি মেয়রের পদ যে কোন কারণে শূন্য হলে তা রাষ্ট্রপতির পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল অর্থ-সম্পদ ও জনবলের সময়-শক্তি ব্যয়ে নতুন করে নির্বাচিত করার প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট পরিষদ কিংবা সভা কিংবা কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে স্বল্প সময় ও ব্যয়ে তার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে পারবেন। তারপর, পরবর্তীতে কেবল সংশ্লিষ্ট সদস্য কিংবা ওয়ার্ড কমিশনারের পদে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যা অতি অল্প সময়, অল্প ব্যয়ে ও অতি সহজেই সম্ভব। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা, সুস্থ গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের স্বার্থে এই শর্ত আরোপ করা যেতে পারে যে, এসব 'স্থানীয় সরকার' প্রধানদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত ভোটাধিকারী সদস্যদের কেবল 'দুই-তৃতীয়াংশ' সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে অপসারণ করা যাবে, কোন অবস্থাতেই সরকারের কার্যনির্বাহী আদেশে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬২। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, যে কোনও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে কোন রকম সদস্য মনোনীত করার ব্যবস্থা রাখা গণতন্ত্রের রীতিনীতিপরিপন্থী। সুতরাং, নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাসহ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসেবে, কিন্তু সদস্য হিসেবে নয়, 'ইউনিয়ন পরিষদে' ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত সদস্যদের, 'উপজেলা বা থানা পরিষদে' উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত সদস্যদের, 'জেলা পরিষদে' জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত সদস্যদের, 'পৌরসভা'য় পৌরসভার চেয়ারম্যানসহ ওয়ার্ড কমিশনারদের এবং 'সিটি কর্পোরেশনে' সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ ওয়ার্ড কমিশনারদের ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করা অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত হবে। যে কোন গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য এরূপভাবে নির্বাচিত উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে সে প্রতিষ্ঠানের 'উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করতে হবে যে, এসব উপদেষ্টা বা পরামর্শক পদের নির্বাচনে মহিলাসহ যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁদের আবশ্যিকভাবে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ ন্যূনতম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শেষ ও তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে জাতীয় সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্ট 'উপজেলা বা থানা পরিষদ' এবং 'জেলা পরিষদে'র কর্মকাণ্ডের সংগে সম্পৃক্ত করা। এটা করা অতি সহজ। 'জেলা পরিষদে'র প্রস্তাবিত উপদেষ্টা কমিটিতে জেলার সাংসদগণ কখনো উপদেষ্টা হিসেবে, আবার কখনো জাতীয় সংসদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ঐ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। একই নীতি ও পদ্ধতি 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র উপদেষ্টা কমিটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা যেতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, 'জেলা পরিষদে'র চেয়ারম্যান এবং 'উপজেলা বা থানা পরিষদে'র চেয়ারম্যান স্ব স্ব পদাধিকার বলে যথাক্রমে প্রস্তাবিত 'জেলা পরিষদ উপদেষ্টা কমিটি' এবং 'উপজেলা বা থানা পরিষদ উপদেষ্টা কমিটির' ভাইস-চেয়ারম্যান হবেন। পরিশেষে বলা যায় যে, ঠিক এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপদান করা যায়। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় 'স্থানীয় সরকার পর্যায়' অর্থাৎ দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো দলগতভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। যদি 'স্থানীয় সরকার' পর্যায়ের নির্বাচনগুলোয় রাজনৈতিক দলগুলোর দলগতভাবে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ও প্রবর্তন করা হয়, তাহলে প্রস্তাবিত 'ইউনিয়ন পরিষদ উপদেষ্টা কমিটি', 'উপজেলা বা থানা পরিষদ উপদেষ্টা কমিটি', 'জেলা পরিষদ উপদেষ্টা কমিটি', 'পৌরসভা উপদেষ্টা কমিটি' এবং 'সিটি কর্পোরেশন উপদেষ্টা কমিটির', উপদেষ্টা বা পরামর্শক সদস্যদের দলগুলোর সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অথবা তার আওতা ও এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় মোট প্রাপ্ত সাধারণ ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যে গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপদান এবং দেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন-উন্নতি ও কল্যাণের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

২৬৩। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)-এর বার্ষিক 'মানব উন্নয়ন' প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বলা হয়ঃ "বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কার্যত কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরিমাণ ছিল হতাশাব্যঞ্জক। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা মোটেই পূরণ হয়নি।" ইউএনডিপি-এর ঐ প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ঃ "প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে দেশজ সঞ্চয়ে স্বল্পতা। সরকারী খাতে বিনিয়োগের ব্যর্থতা ও গণভোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় মধ্যমেয়াদী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। আশির দশকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বহু রং চড়ানো প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও, কোন প্রকার উন্নতি হয়নি। বরং, আপেক্ষিক ও চরম দারিদ্র্যের পরিমাণ অপ্রতিহত গতিতে বেড়েই চলেছে।" ইউএনডিপি-এর ঐ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের কাঠামোগত সামঞ্জস্য কর্মসূচীর পরিমাপের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখিয়ে বলা হয় ঃ "বিগত কয়েক বছরে কৃষিখাতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে উদার আমদানি নীতি। তবে, কৃষিতে শস্য বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব হয়নি। কয়েকটি খাতে শিল্পোৎপাদন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কম সংস্থান বেড়েছে। কিন্তু আমদানি উদারকরণের ফলে আমদানিজাত দ্রব্যের দাম কমলেও উৎপাদনে সংরক্ষণ না থাকায় রুগ্ন শিল্পের পরিমাণ বেড়েছে। মুদ্রা বিনিময় কঠোর হবার কারণে তৈরী পোশাক রফতানির কিছুটা উন্নতি হলেও, অস্থিতিশীল চাহিদার কারণে পাটজাত দ্রব্য মার খাচ্ছে। গত দশকের রফতানি প্রবণতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, অপ্রচলিত খাতে রফতানি বেড়েছে। অবদমিত দেশজ চাহিদার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটা অর্থনীতির গতিহীনতাকে প্রমাণিত করে। সরকারী খাতের অগ্রগতি হয়নি। বাজেটের কোনও লক্ষ্যেই শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।"

২৬৪। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত ইউএনডিপি-এর ঐ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের কাঠামোগত সামঞ্জস্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্যে দায়ী কারণগুলো উল্লেখ করে বলা হয় ঃ "(বাংলাদেশের) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিবৃতি ছিলো না। কাঠামোগত সামঞ্জস্য কর্মসূচীর লক্ষ্য বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। দারিদ্র্য বিমোচনকে কেন্দ্রীয়ভাবে বিবেচনা করা হয়নি এবং এজন্যে সামষ্টিক আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সরবরাহে নেতিবাচক আয় প্রতিফলের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে যেখানে সরকারী খাত বেসরকারী খাতের চেয়ে অধিক দক্ষ, সেখানে বেসরকারী খাত বিফল হয়েছে। বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদারকরণ দেশজ উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করেছে। দেশজ চাহিদার অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

২৬৫। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত ইউএনডিপি-এর ঐ প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ঃ "বিগত ২৫ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিলো মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিলো ২১০ মার্কিন ডলার। একই সময়ে চীন, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৮ শতাংশ, ৪.৪ শতাংশ ও ৭.১ শতাংশ। ১৯৮১-৮২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ১.৭ শতাংশ নেতিবাচক। বিগত দশকে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমেছে, শিল্প খাতের অবদান সামান্য বেড়েছে এবং সেবা খাতের অবদান প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দশকে ভোগ বেড়েছে কিন্তু বিনিয়োগ কমেছে। ১৯৮০ সালে ভোগ ছিল ৯৬ শতাংশ, ১৯৯০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৯৭ শতাংশ। পক্ষান্তরে, বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১০ শতাংশ হয়েছে। রফতানি প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রচলিত পণ্যের পরিমাণ ১৯৮০ সালে ছিলো ৭৪ শতাংশ এবং অপ্রচলিত পণ্যের অংশ ছিলো ২৫ শতাংশ। ১৯৯০ সালে এসে প্রচলিত পণ্য (পাট ও চা)-এর অংশ দাঁড়িয়েছে ২২.৮ শতাংশে এবং অপ্রচলিত পণ্যের অংশ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে। আমদানি প্রবণতায় ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু কাঁচামালের পরিমাণ কমেছে। বিগত দশকে শ্রমবাজারে নারী শ্রমিকের প্রবেশের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৮০ সালে যার পরিমাণ ছিলো মাত্র ০.৯ শতাংশ, ১৯৯০ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২১ শতাংশে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫.৯ শতাংশ হারে ভূমিহীনের পরিমাণ বাড়ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের অবদান বেড়েছে।"

২৬৬। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য জনাব হারুন মোল্লার মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়। এই আসনের নির্বাচনে মোট ১৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু এই উপনির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদার এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীনের মধ্যে। ঐ উপনির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ সময় ছিলো ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) রাত বারোটা পর্যন্ত। নির্বাচনী প্রচারের সময়কালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা ঐ নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত অনেক সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্যে জনগণের প্রতি আকুল আবেদন জানান। এমনকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী ঐ এলাকার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষে ভোট প্রদানের অনুরোধ জানান। অপরদিকে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও দলের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী ও নেতা ঐ নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত অনেক সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং বিএনপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে জনগণের প্রতি আকুল আবেদন জানান। তা ছাড়াও, ঐ নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে, মিরপুর ও পল্লবী আবাসিক এলাকা দুটোয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও দলের অনেক শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী ও নেতা নির্বাচন প্রচারণা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের বিএনপি প্রার্থীকে ভোটদানের অনুরোধ জানান। প্রধান মন্ত্রীসহ তাঁর মন্ত্রিপরিষদের অনেক সিনিয়র মন্ত্রী ঐ নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন এলাকায় নানান প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দেন এবং নানান স্কুল-মাদ্রাসা, ধর্মীয়, সমাজ-সেবামূলক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য নগদ অর্থসহ প্রকল্পের অনুমোদন-মঞ্জুরী ঘোষণা করেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঐ নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সময়কালে বিএনপি সরকারের মন্ত্রীরা সরকারী যানবাহন ও সুযোগ-সুবিধাদি ব্যবহার করেন অকল্পনীয় বেপরোয়াভাবে। সেসবের মাধ্যমে যে দলীয় কাজে বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদ-সুবিধাদির অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

২৬৭। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) বুধবার সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্ত ও মোটামুটি শান্তিপূণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। তবে, ভোট গণনার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারের নিশ্চিত বিজয়ের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠলে, কন্ট্রোল রুম থেকে নির্বাচন কমিশনকে ভোট গণনার ফলাফল জানানো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আকস্মিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে সরকারী বার্তা সংস্থা ও প্রচার মাধ্যম মারফত বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পরে, সে ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ সাংবাদিকদের দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "আমার অফিস থেকে রেডিও-টিভিকে নির্বাচনের কোন ফলাফল সরবরাহ করা হয়নি।" আরও পরে, গভীর রাতে দৈনিক বাংলার বাণী প্রতিনিধি ঐ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, নির্বাচন কমিশনের এক অত্যন্ত দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, "রেডিও ও টিভি কোথা থেকে নির্বাচনের ফলাফল পেয়েছে এবং কিভাবে তা প্রচার করেছে সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন রেডিও-টিভি কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। এছাড়া কিভাবে রেডিও-টিভি নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে উপনির্বাচনের ফলাফল প্রচার করলো, তা নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে দেখছে।" নির্বাচন কমিশনের ঐ সূত্রে আরও বলা হয়, "(৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩) বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় রিটার্নিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসারের অফিসে সকল প্রার্থী বা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে উপনির্বাচনের বেসরকারী ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।"

২৬৮। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ভোট গণনা সংক্রান্ত ব্যাপার এবং সে সময়ে রিটার্নিং অফিসারের মিরপুরস্থ কন্ট্রোল রুমের আশেপাশে ঘটা ঘটনা সম্পর্কে অনেক তথ্য ও বিবরণ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে পরিবেশিত ও প্রকাশিত হয়। সেসব ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্য ও বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ মিরপুর গোল চক্করস্থ রিটার্নিং অফিসারের কন্ট্রোল রুম থেকে মোট ১১৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে জানানোর পর রহস্যজনক কারণে ভোট গণনার ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে জানানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় ৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ভোট ছিলো ৪৯ হাজার ৪৪২ এবং বিএনপি প্রার্থীর ৫০ হাজার ৬৭৮। ইতিমধ্যে, ঐ কন্ট্রোল রুম থেকে নির্বাচন কমিশনকে ভোট গণনার ফলাফল জানানো বন্ধ করে কন্ট্রোল রুমের কর্মকর্তারা ভোটের কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে পুরানো ঢাকার ডিসির অফিসে চলে যাবার উদ্যোগ নিলে, বিক্ষুব্ধ জনতা কন্ট্রোল রুম ঘেরাও করে এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দাবি জানায়। সে সময় ঢাকার পুলিশ কমিশনার রকিবুল হুদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং শেষ পর্যন্ত গুলিবর্ষণ করে। তাতে দু'জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তারপর, মিডিয়া ক্যু ও পুলিশের গুলির প্রতিবাদে মিরপুরের পথে পথে প্রতিবাদী জনতার ঢল নামে।

২৬৯। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারের নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল মিরপুর সাত নম্বর থেকে গোল চক্কর অভিমুখে রওনা হয়। সে সময় বিএনপির সমর্থকরা তাদের ধাওয়া করে। তখন কামাল আহমদ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে পাল্টা ধাওয়া করা হলে বিএনপির সমর্থকরা পিছু হটে যায়। ঠিক ঐ সময় পুলিশ দল আওয়ামী লীগের মিছিলে আক্রমণ করে। আওয়ামী লীগের মিছিলে নেতৃত্ব দানকারী কামাল আহমদ মজুমদার কর্মী-সমর্থকদের শান্ত করে নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম অভিমুখে রওনা হন। সে পর্যায়ে পুলিশ আওয়ামী লীগ মিছিলে আবারও আক্রমণ ও লাঠিচার্জ করে। তখন পুলিশের সাথে মিছিলকারীদের ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলতে থাকে। সে সময় মিরপুরের গোলচক্কর থেকে মিরপুর এগারো নম্বর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচনী ক্যাম্প এলাকা জুড়ে রহস্যজনক কারণে রাস্তার ও আবাসিক এলাকার বৈদ্যুতিক বাতি নিভে যায়। গোটা এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে অন্ধকারে ফেলে পুলিশ তখন এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ করে। এক পর্যায়ে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। ব্যাপক কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেও পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে ব্যর্থ হয়। মিরপুর গোলচক্কর জুড়ে তখন চলে খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশ এ পর্যায়ে কাঁদানে গ্যাসসহ গুলিবর্ষণ করতে থাকে। তখন পুলিশের গুলিতে রিকশাচালক ফজলুর রহমান, সাইদুল হক, কামাল ও আনোয়ার নামে ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়। ফজলুর রহমানকে সিএমএইচ হাসপাতালে এবং আনোয়ারকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের খবর ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার জনতা সেখানে জড়ো হয়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তখন বৃষ্টির মতো রাবার বুলেট, গুলিবর্ষণ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে মিরপুরের গোল চক্করের চারপাশের কয়েক মাইলব্যাপী এলাকায় পুলিশের সঙ্গে চলতে থাকে জনতার সংঘর্ষ। এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা রাস্তার বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছপালা ফেলে মিরপুরের ১১ নম্বর সড়কে ব্যারিকেড দেয়। বড় বড় গজারীর লাকড়ি ও টায়ার দিয়ে রাস্তায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সে সময় মিরপুরের গোল চক্করের চারপাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

২৭০। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ আসনের উপ-নির্বাচনে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি, ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা, ভোটগ্রহণ কালে নির্বাচন কমিশনসহ কয়েকটি ভোট পরিদর্শকদলের ভোটদান ও ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ এবং ঘটনা সম্পর্কেও অনেক তথ্য ও বিবরণ পরদিন বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়। নির্বাচনের দিন ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের অন্তর্ভুক্ত সারা এলাকায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন উপলক্ষে মিরপুর থানা ও উত্তরা থানার হরিরামপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঐ নির্বাচনী এলাকার ১১৭টি ভোটকেন্দ্রসহ পুরো নির্বাচনী এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শান্তি-শৃংখলা রক্ষার লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক বিডিআর, পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা হয়। ভোটকেন্দ্রে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্টসহ সংশ্লিষ্টদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। ভোটারদের ভোটার নম্বর স্লিপ দিয়ে সহযোগিতার জন্য প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ভোটকেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। সারা নির্বাচনী এলাকায় সকাল ৭টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটগ্রহণ চলাকালে ১০টি ভিজিলেন্স টীম ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করে। তাছাড়াও, নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা, সংসদ সদস্য, বিদেশী কূটনীতিক ও দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনী এলাকার অনেক ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

২৭১। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের সারা এলাকায় সকাল ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষ ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। ভোটদানের জন্য প্রচুর মহিলা ভোটারের আগমন ঘটে। সকাল ১১টা পর্যন্ত মিরপুর ১ নম্বর সেকশনে উপশহর প্রাথমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যালয়, ৭ নম্বর সেকশনে শহীদ স্মৃতি বিদ্যালয়, ১৩ নম্বর সেকশনে হাজী আলী হোসেন বিদ্যালয়, ১৪ নম্বর সেকশনে রোটারী হাই স্কুল, ১১ নম্বর সেকশনে জাতীয় একাডেমী, সেনপাড়া আদর্শ বিদ্যালয়, কাজীপাড়া মাদ্রাসা, মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিদ্যাপীঠ, প্যারাডাইস কিন্ডার গার্টেন, নন-লোকাল ফ্রি স্কুল এবং বাউনিয়া বাঁধ এলাকার ভোটকেন্দ্রসমূহে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট গৃহীত হয়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটকেন্দ্রগুলোর বাইরে অপেক্ষমাণ ভোটারের লাইন দীর্ঘ হবার পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রগুলোয় ভোটারদের ভোট প্রদানের গতি মন্থর হয়ে যায়।

২৭২। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের এলাকায় ভোট গ্রহণ চলাকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সকাল ৮টায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আদর্শ বিদ্যাপীঠে স্থাপিত ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, "নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করবার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।" তারপর, বিকেল ১টার দিকে মিরপুর ৭ নম্বর সেকশনে শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের অদূরে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটার স্লিপ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষমাণ কয়েকজন মহিলা ভোটারকে বিএনপি প্রার্থীর সমর্থক একদল তরুণ তাদের পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে 'ধানের শীষে ভোট দিন' ব্যাজ পরিহিতি তরুণেরা মারমুখী হয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্প আক্রমণ ও ভাংচুর করে। সে সময় দু'জন মহিলা আহত হয়। ঐ ঘটনার সময় ঐ স্থানে এক রাউন্ড পিস্তলের ফাঁকা গুলি বর্ষিত ও একটি পটকা বিস্ফোরিত হয়। ঐ ঘটনার আকস্মিকতায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ক্যাম্প কর্মীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে বিএনপি কর্মীরা আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ক্যাম্প কর্মীদের ধাওয়া করে ঐ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ঐ সময় সেখানে কিছুক্ষণ ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। পরবর্তীতে, আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ক্যাম্পে হামলাকারীরা পার্শ্ববর্তী জাতীয় পার্টির প্রার্থীর ক্যাম্পে হামলা চালালে সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। ঘটনাস্থলে বিডিআর উপস্থিত হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

২৭৩। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলাকালে ১০টার দিকে ঢাকা মহানগর বিএনপির সভাপতি ও সংসদ সদস্য লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী সদলবলে উপরোল্লিখিত মহিলা ভোটকেন্দ্রটিতে পরিদর্শনে এলে ঐ ভোটকেন্দ্রের অদূরে অবস্থানরত জনতা তাঁদের উদ্দেশ্যে উচ্চ স্বরে টিপ্পনী কাটতে থাকলে তিনি (মীর শওকত আলী) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে কর্তব্যরত বিডিআর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। বেলা ২টার সময় ৪টি মাইক্রোবাসসহ ৬টি গাড়ির বহরযোগে দলীয় কর্মী (গুণ্ডা-মাস্তান) সমভিব্যাহারে ঢাকা মহানগর বিএনপির সভাপতি ও সংসদ সদস্য লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী এবং বিএনপির সালাউদ্দিন আহমেদ এমপি শহীদ স্মৃতি বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আসেন। তাঁরা প্রায় ১৫ মিনিট ঐ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন। বেলা আড়াইটার দিকে ঐ কেন্দ্রের সামনে একটি মাইক্রোবাস (নম্বর ঢাকা মেট্রো জ-৫৫২৬) জনতার বাধার মুখে অন্যত্র চলে যায়। ঐ মাইক্রোবাসের আরোহীরা 'ধানের শীষে ভোট দিন' ব্যাজ পরিহিত ছিলো। ঐ ভোটকেন্দ্রে 'জাল ভোট' দেওয়ার সময় আকলিমা ও জাহানারা নাম্নী দুই তরুণীকে গ্রেফতার করা হয়। শহীদ স্মৃতি বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিস্ট্রেট ১ জন 'জাল ভোট' প্রদানকারিণীকে ৫০ টাকা জরিমানা করেন। মিরপুর ন্যাশনাল বাংলা হাই স্কুল ভোটকেন্দ্রে 'জাল ভোট' প্রদানের সময় ১৭ জনকে আটক করা হয়। কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের সময় পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে কিছুটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। গাবতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে মহিলা ও পুরুষ ভোটকক্ষ দু'টোয় অনেক ভোটার এক সাথে ভোট দেন। ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের অন্তর্গত এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই বিএনপি সরকারী দলের একাধিক সংসদ সদস্য ও নেতার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে, সরকারী দল বিএনপির এমপিবৃন্দের এক একজনের সঙ্গে তাঁর একাধিক সহযোগীদের অনেক ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

২৭৪। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালে সকাল আনুমানিক ৮টায় মিরপুর আদর্শ স্কুল ভোটকেন্দ্রে বিএনপির সংসদ সদস্য ও তৎকালীন 'ডাকসু'র ভিপি আমানউল্লাহ আমানের নেতৃত্বে বিএনপির (গুণ্ডা-মাস্তান) কর্মী-সমর্থকরা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। সে সময় সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ ও দলের বিশিষ্ট নেতা মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বাধা দেয়। পরে, পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। বেলা প্রায় সোয়া এগারোটায় মিরপুর কলেজ ভোটকেন্দ্রে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি মিলে 'জাল ভোট' দেওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে মহিলাদের অনেক 'জাল ভোট' প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। ঐ ভোটকেন্দ্রে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন বিএনপি মনোনীত মেয়র, সংসদ সদস্য ও বিএনপির যুব অঙ্গদল 'যুবদলে'র সভাপতি মীর্জা আব্বাসের নেতৃত্বে বিএনপি সারাক্ষণ আধিপত্য বজায় রাখে। সকাল প্রায় সাড়ে এগারোটায় আদর্শ বিদ্যানিকেতন ভোটকেন্দ্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া চলে। 'জাল ভোট' প্রদানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার পর দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সকাল থেকে গাবতলী, লালকুঠি, কল্যাণপুর ও পল্লবীর বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে বিএনপির আমানউল্লাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমান এমপি, সংসদ সদস্য ও তৎকালীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মনোনীত মেয়র ও যুবদল সভাপতি মীর্জা আব্বাস, ঢাকা নগর বিএনপির সভাপতি ও সংসদ সদস্য লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী এবং বিএনপির সংসদ সদস্য সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে বিএনপি একক আধিপত্য বজায় রাখে। সেসব ভোটকেন্দ্রগুলোয় আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সকাল থেকেই কোণঠাসা করে রাখা হয়। শেরে বাংলা প্রাইমারী স্কুল ভোটকেন্দ্রে একজন বিএনপি নেতা দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে সেখানে বিএনপির প্রভাব ও আধিপত্য সুদৃঢ় রাখে।

২৭৫। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণকালে, বেলা আনুমানিক একটায় কাজীপাড়া মাদ্রাসা ভোটকেন্দে আওয়ামী লীগের ভোটারদের ভোট দানে বাধা এবং আওয়ামী লীগের এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয় বিএনপির গুণ্ডা-মাস্তানরা। সেখানে আওয়ামী লীগের আলহাজ্ব মকবুল হোসেন বিএনপির সন্ত্রাসী তৎপরতায় বাধা দিলে তাঁকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। বিএনপির গুণ্ডা-মাস্তানরা তাঁকে (আলহাজ্ব মকবুল হোসেনকে) অনেকক্ষণ পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করে। বিএনপির গুণ্ডা-মাস্তানরা আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ধাওয়া করে পিছু হটিয়ে দেয়। সেখানে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে থাকলে ঢাকার দাঙ্গা পুলিশের ডিসি জনাব বারী সাংবাদিকদের তাড়া দেয় এবং তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। বিএনপির গুণ্ডা-মাস্তানরা 'ধর ধর' বলে আওয়ামী লীগের আলহাজ্ব মকবুল হোসেনকে ঘিরে রাখার সময় পুলিশ সেখানে গিয়ে হুইসেল দিতে থাকে। সে সময় বিএনপির একজন গুণ্ডা-মাস্তান সরদার একজন পুলিশ সার্জেন্টকে বলতে থাকে, "শালারে আমাদের কাছে দিয়ে দিন।" ঐ ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ভোট প্রদানের হিড়িক লক্ষ্য করে বিএনপির গুণ্ডা-মাস্তানরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সে সময় খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা সেখানে যেতে থাকে এবং বিএনপির লোকদের ধাওয়া দিলে তারা পিছু হটে যায়। পুলিশ সেখানে গিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ধাওয়া দিয়ে তাদের নিরপেক্ষতার অবস্থান থেকে সরে যায়। তার কিছুক্ষণ পর, খবর পেয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ ও আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মোহাম্মদ নাসিম ঐ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। তারপর, সেখানে যায় ঢাকা বিএনপির সভাপতি ও সংসদ সদস্য লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে প্রায় ১২টি গাড়ি বোঝাই বিএনপি কর্মী ও গুণ্ডা-মাস্তান বাহিনী। আওয়ামী লীগের দুর্গ বলে অভিহিত কাজীপাড়ার মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে বেলা ১টায় সংঘর্ষ বাধার পর প্রায় আধ ঘন্টা পর পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। ততক্ষণে, বিএনপির উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। তারপর, সেখানে ভোটারদের উপস্থিতি একেবারেই কমে যায়। বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিলো নগণ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭৬। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা) পরস্পরবিরোধী সংবাদ সরবরাহ করে, যা রেডিও ও টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। ঐ দিন রাত ১০টা ১০ মিনিটে বাসস ঐ উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী তাঁর নিকটতম আওয়ামী লীগ প্রার্থীর চেয়ে ৩৮০৩ ভোটে বিজয়ী হবার সংবাদ 'ক্রীড' করে। বাসস ঐ খবর প্রচারের ঠিক ২০ মিনিট পর নির্বাচন সংক্রান্ত আর একটি পরস্পরবিরোধী খবর পরিবেশন করে। রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে 'ক্রীড' করা ঐ খবরে নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং অফিসারের বরাত দিয়ে বলা হয়, "ভোট গণনা চলছে।" বাসস-এর একটি নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল সূত্রে জানানো হয় যে, ঐ রিপোর্ট দুটোর প্রণেতা ছিলেন বাসস-এর চীফ রিপোর্টার গিয়াস কামাল চৌধুরী নিজেই। রাত ১টা ৭ মিনিটে বাসস বিএনপি প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমদের বরাত দিয়ে জানায় যে, বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন প্রায় ৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। তার ২২ মিনিট আগে ইউএনবি (ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ) একই সূত্রের বরাত দিয়ে জানায় যে, বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন ২,৬৮৪ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।

২৭৭। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা)-এর বরাত দিয়ে সরকারী রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হবার পর সে রাতেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "আমরা ভোট ডাকাতি ও ভোট কারচুপির জন্য এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপিকে নিয়ে এক সাথে আন্দোলন করেছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিলো জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করা। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে আমরা সে সময় বিরোধী দলীয় সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের বিএনপি সরকার সেইসব অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে আজ এক ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে।"

২৭৮। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ বিকেল সাড়ে চারটায় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণের পঁচিশ ঘন্টা পর প্রবল আপত্তি, তুমুল বাক-বিতণ্ডা ও হৈচৈয়ের মাঝে ঐ (জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকা ১৯০, ঢাকা-১১ অর্থাৎ মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তাতে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীনকে ২৫৯২ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। রিটার্নিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব বদিউর রহমান ঘোষিত ঐ ফলাফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন ৮০,১২৭ ভোট এবং তাঁর নিকটতম আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদার ৭৭,৫৩৫ ভোট পান। জাতীয় পার্টির প্রার্থী জনাব বেলাল হোসেন ৭,০৬২ ভোট পেয়ে তৃতীয় হন। সরকারীভাবে সে উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় ঐ অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে রিটার্নিং অফিসার বলেন, "মিরপুরে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে গত বুধবার (৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে) এখানে সব ফলাফল আনা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল যোগ করে আজ সরকারীভাবে ঘোষণা করছি।" তারপর, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ফলাফল পাওয়ার আগে এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষণা করার অনেক আগেই সরকারী বার্তা সংস্থা বাসস কর্তক এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিএনপি প্রার্থীর জয় লাভের খবর প্রচার সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, রিটার্নিং অফিসার জনাব বদিউর রহমান বলেন যে, তিনি সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না এবং নির্বাচন কমিশনও সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। মিরপুরের উপনির্বাচনে মিডিয়া ক্যু করা হয়েছে, সাংবাদিকদের সে অভিযোগের জবাবে রিটার্নিং অফিসার জনাব বদিউর রহমান বলেন, "এটা ঠিক নয়। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে (সম্পন্ন) হয়েছে।"

২৭৯। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ বিকেল সাড়ে চারটায় রিটার্নিং অফিসার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব বদিউর রহমান সংসদের নির্বাচনী এলাকা ১৯০ (ঢাকা-১১, মিরপুর)-এর উপনির্বাচনের ফলাফল ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আনুষ্ঠানিক ও সরকারীভাবে ঘোষণার সময় সেখানে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ও হৈ চৈ হয়। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পূর্বে সেখানে বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন, তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট বিএনপি সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমদ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র, সংসদ সদস্য ও বিএনপি'র যুব অঙ্গদল 'যুবদলের' সভাপতি মীর্জা আব্বাস এবং বিএনপি সংসদ সদস্য ও তৎকালীন 'ডাকসুর' ভিপি আমানুল্লাহ আমান সে সম্মেলনকক্ষে উপস্থিতি হন। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদার, তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য খ. ম. জাহাঙ্গীর, আওয়ামী লীগ নেতা মোজাফফর হোসেন পল্টু এবং আওয়ামী লীগের ব্যারিস্টার কে. এস. নবীও সেখানে উপস্থিত হন। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতি নিলে খ. ম. জাহাংগীর তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলেন। তিনি (খ. ম. জাহাংগীর) বলেন, "আমাদের লিখিত আপত্তি রয়েছে। ফলাফল ঘোষণার পূর্বে আমাদের লিখিত আপত্তি গ্রহণ করতে হবে।" কিন্তু রিটার্নিং অফিসার সেই আপত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সে সময় বিএনপি নেতৃবৃন্দ রিটার্নিং অফিসারকে প্রবলভাবে সমর্থন করেন। রিটার্নিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসারের অসম্মতির মুখে জনাব খ. ম. জাহাংগীর ও জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রবল আপত্তি ব্যক্ত করে বলেন, "জনগণের রায় হাইজ্যাক করা হয়েছে। মিডিয়া ক্যু হয়েছে। জনগণের রায় (প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্ধ্যাকালীন অফিস) সুগন্ধায় বসে পাল্টানো হয়েছে। সাজানো এই ফলাফল আমরা মানতে পারি না, মানি না।" সে সময় সরকারী বিএনপি দলের নেতৃবৃন্দও পাল্টা বক্তব্য রাখেন, হৈ চৈ করেন। প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা ও উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেই রিটার্নিং অফিসার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব বদিউর রহমান ঐ উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সকল প্রার্থীদের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেন। তাঁদের লিখিত আপত্তি গ্রহণে অসম্মতি জানালে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মৌখিকভাবে তাদের প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে জনাব খ. ম. জাহাংগীর, জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু ও কামাল আহমদ মজুমদার ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে লিখিত আপত্তি জমা দেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তখন তাঁর কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। অতএব, তাঁর একান্ত সহকারী আওয়ামী লীগের ঐ লিখিত আপত্তি গ্রহণ করেন।

২৮০। রিটার্নিং অফিসার উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র থেকে নিয়ে আসা ফলাফলের মধ্যে ৭৮টি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল টেব্যুলেশন হওয়ার পর্যায়ে ঢাকার পুলিশ কমিশনার মীর্জা রকিবুল হুদার সেখানে উপস্থিতির পর ভোট গণনার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা, হলে রিটার্নিং অফিসার বলেন, "ও এসেছিলো, এটা ঠিক। এসে আমার পাশের রুমেই ওয়্যারলেস সেট নিয়ে বসে।" তারপর ঢাকার পুলিশ কমিশনার রকিবুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের অজ্ঞাতে অবৈধভাবে ও আইন লংঘন করে ব্যালট পেপার নিয়ে আসা সম্পর্কে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলে রিটার্নিং অফিসার তাঁর জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলেন, "নির্বাচন সুষ্ঠুভাবেই (সম্পন্ন) হয়েছে। আপত্তি থাকলে জনাব খ. ম. জাহাংগীর তা গত বুধবার (৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের রাতে)-ই জানাতে পারতেন।"

২৮১। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম 'মিরপুর উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে পারছে না' মর্মে যে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তার ওপর আলোচনার অনুমতি দিলে, সংসদে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে বিরোধী দলীয় এবং সরকার দলীয় বিএনপি সাংসদদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ, বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক হয়। ঐ বিতর্কে বিরোধী এবং সরকারী বিএনপি দলের ১৬ জন সংসদ সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। বিতর্কে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "(বিএনপি) সরকার মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে জনগণের রায় কেড়ে নিয়েছে।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন যে, নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো ৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তাঁদের (আওয়ামী লীগের) কোন আপত্তি নেই। তাই তিনি বাকি ৩৯টি ভোটকেন্দ্রের পুনঃনির্বাচন দাবি করেন। তারপর শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, "৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের পর কেন নির্বাচন কমিশনের কাছে আর ফলাফল পৌঁছানো হয় না? কেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফলাফল জানার জন্য মিরপুরে যেতে হয়? কেন নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হয়নি? সংবিধানপ্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের অধিকার কেন হরণ করা হয়েছে? নির্বাচন কমিশনের কাছে ফলাফল পাঠানো কেন বন্ধ হলো? আগেই কেন (রাষ্ট্রীয়) গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ফলাফল দেয়া হয়? নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার (ঢাকার পুলিশ কমিশনার) রকিবুল হুদা কোথায় পেলেন? প্রতিনিধিদের বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে (ঢাকার) ডিসির সাথে রকিবুল হুদা কি আলাপ করেছেন?" এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য বিএনপি সরকারের কাছে দাবি জানানোর পর শেখ হাসিনা বলেন, "নির্বাচন কমিশন মিরপুরে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন (অনুষ্ঠান) করার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভা ডেকেছিলেন। (নির্বাচন) কমিশন রাজনৈতিক দলের (প্রতিনিধিদের) সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেছিলো। আমার পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিলো নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য নির্বাচন কমিশন যে ধরনের সহযোগিতা চাইবে তা দেয়ার জন্যে। কিন্তু (ঐ) প্রতিনিধি সভায় বিএনপির পক্ষ থেকে সেই রকম ওয়াদা দেওয়া হয়নি। (তখন) বিএনপি প্রতিনিধি (নির্বাচন) কমিশনকে বলে এসেছিলেন যে, তাঁর নেত্রীর অনুমতি প্রয়োজন। (কিন্তু) বিএনপি নেত্রীর অনুমতি পাওয়া যায়নি। ফলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। কি উদ্দেশ্যে সেদিন নির্বাচন কমিশনকে কমিটি গঠন করতে দেওয়া হয়নি?"

২৮২। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের বিভ্রান্তিকর ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে ঘোষণার ব্যাপার নিয়ে সংসদে যে আলোচনা-বিতর্ক হয় তার ওপর বক্তব্য রাখার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "(নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণায়) মিডিয়া ক্যু হয়েছে। পাঁচ রকমের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যখন ১১৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৭৮টির ফলাফল পেয়েছে, তখন একটি বেসরকারী সংস্থার বরাত দিয়ে টেলিভিশন সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছে। এটাকে মিডিয়া ক্যু ছাড়া আর কি বলা যাবে? এর আগে বরিশাল, ভোলা, (ঢাকা শহরের) ধানমণ্ডি, গুলশানে উপনির্বাচন হয়েছে। সেখানেও প্রচুর অনিয়ম করা হয়েছে। এমন কি (ঢাকার) সিটি কলেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটকেন্দ্রে আমাদেরকে মাত্র ১৬টি ভোট দেওয়া হয়েছিলো। তবুও, জাতির স্বার্থে সেই নির্বাচনের রায় আমরা মেনে নিয়েছিলাম। গতকাল (বিএনপি) সরকার যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তা জাতির কাছে প্রকাশ পেয়েছে। সরকারের কারচুপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে (প্রধান) নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সরকার নির্বাচনের রায় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য (ঢাকার) পুলিশ কমিশনার রকিবুল হুদাকে ব্যবহার করেছে। এ রকিবুল হুদা ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী (তারিখে) চট্টগ্রামে ৭০ জনকে হত্যা করেছিলো। মিরপুর (উপ) নির্বাচনে বিএনপি জাতীয় পার্টির দোসরকে মনোনয়ন দিয়েছিলো। এর মধ্য দিয়ে জনগণ আপোসহীন নেত্রীর রূপ দেখেছে। একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের ২৫ হাজার ভোটে জেতার পরিকল্পনা ছিলো। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই রকিবুল হুদাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জনগণ সজাগ ছিলো বলেই তাঁদের সেই পরিকল্পনা পুরোটা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র এনেছি। আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করতে চাই। মিরপুরের (উপ) নির্বাচনে বিএনপি হেরে গেলে ক্ষমতা চলে যেতো না। আবার আওয়ামী লীগ জয় লাভ করলেও ক্ষমতা পেতো না। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় (যে), যার জন্যে স্বৈরাচারের পতন ঘটালাম, সেই স্বৈরাচারের পথ ধরে বর্তমান (বিএনপি) সরকার মিডিয়া ক্যু করে জনগণের আশা-আকাংক্ষাকে পদদলিত করেছে। (মিরপুরের) (উপ) নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্যে প্রধান মন্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া তাঁর) ফ্রান্স সফর বাতিল করেছেন। অথচ, ফ্রান্সে আমাদের বন্যা সমস্যা নিয়ে আলোচনার কথা ছিলো। প্রধান মন্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া) বন্যার মতো জাতীয় সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে (উপ) নির্বাচনে প্রভাব সৃষ্টির জন্য (ফ্রান্স) সফর বাতিল করেছেন।"

২৮৩। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের বিভ্রান্তিকর ফলাফল ঘোষণার ব্যাপার নিয়ে সংসদে বিতর্কের সূত্রপাত করে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, "গত বুধবার (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩) জাতীয় সংসদের মিরপুর আসনের উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ থাকার কথা। বুধবার রাত ১০টায় বার্তা সংস্থা ইউএনবি নির্বাচনের ফলাফল প্রচারকালে জানায় যে, বিএনপি প্রার্থী ৩৮০৩ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন থেকে কোন ফলাফলই ঘোষণা করা হয়নি। এতেই বোঝা যায় (যে,) বর্তমান বিএনপি সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। এখানেই শেষ নয়। রাত ১০টা ১০ মিনিটে সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস নির্বাচন কমিশনের কোনরূপ সূত্র ছাড়াই খবর প্রচার করে যে, বিএনপি প্রার্থী প্রায় ৩ হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে। এর ২৫ মিনিটে পর বাসস অপর এক খবরে জানায় যে, (তখনও) ভোট গণনা চলছে। এসব বিভ্রান্তিকর খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "আমার অফিস থেকে নির্বাচনের কোন ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি।" তারপর, শেখ সেলিম বলেন, "নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা ছাড়া কোত্থেকে, কিভাবে ও কোন্ পথে ফলাফল আসলো এ প্রশ্ন সকলের মনে জাগা স্বাভাবিক।" রেডিও-টিভিতে এসব বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন সম্পর্কে শেখ সেলিম বলেন, "রেডিও, টিভি দেশের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ। কোন (রাজনৈতিক) দল বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। নিজের দলের স্বার্থানুকূলে যা খুশী প্রকাশ বা প্রচার করার অধিকার কারও নেই। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বহু রক্ত ঝরেছে। বিগত স্বৈরাচার আমলের মতো আর একটি ভোট ডাকাত শাসনকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য জনগণ ত্যাগ স্বীকার করেনি।"

২৮৪। সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম আরও বলেন, "নির্বাচনে জনগণের প্রদত্ত রায়কে সংরক্ষণের পরিবর্তে এভাবে হাইজ্যাক করা হলে, দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না। তাই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনাটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। আজ অর্জিত গণতন্ত্রকে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে বাধা সৃষ্টিতে (এক) অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্র চলছে। একে আমাদের রুখতে হবে। গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনী প্রহসন করে দেশ ও জাতিকে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না। বুধবারের বাসস পরিবেশিত নির্বাচনী ফলাফল ও আজকের (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখের) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।" তারপর, শেখ সেলিম অভিযোগ করে বলেন, "বুধবার (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখ) রাতে ঢাকার মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার নির্বাচন কন্ট্রোলরুমে ঢুকে অন্যান্য সকল (নির্বাচনী) এজেন্টকে বলপূর্বক বের করে দিয়ে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে গোপনে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠক করেছেন। ফলে, রাতে নির্বাচন কমিশন কোন ফলাফল ঘোষণা করতে পারেনি। (উপ) নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব বিস্তারে প্রধান মন্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া)-এর সচিব কামাল সিদ্দিকীও ইন্ধন যুগিয়েছেন। (উপ) নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ১৮শ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেও, ফলাফল ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে (বিএনপি) সরকারের পরাজয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরশাদ ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। জনগণের রায়কে পদদলিত করে নিজেদের অনুকূলে আনার পরিণতিও হবে এরশাদের মতোই।"

২৮৫। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ সন্ধ্যায় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুবিধাদির অপব্যবহার করে বিএনপি প্রার্থীর অনুকূলে নেওয়া হয়েছে, আওয়ামী লীগের এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল সংসদে বলেন, "বিরোধী দল, যে নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে না, সেই নির্বাচনই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে অভিযোগ করে থাকে।" তারপর সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল বলেন, "মিরপুর উপনির্বাচন যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। দেশে সূচিত গণতান্ত্রিক ধারায় গোটা দেশবাসী যখন সাড়া দিয়েছে, আমাদেরকে সম্মিলিতিভাবে তা ধরে রাখতে হবে।" সরকারী দল জিতলেই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, আর বিরোধী দল জিতলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, বিরোধী দল এই ঢালাও মন্তব্য করে থাকে—একথা উল্লেখ করে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল বলেন, "১৯৯১-এর (সংসদ) নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বলে দেশে-বিদেশে সর্বত্র স্বীকৃতি পায়। তখনও, বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)-এর নেত্রী 'সূক্ষ্ম কারচুপি' প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ সৎ প্রশাসন হিসেবে আলাদা সত্তায় ও বৈশিষ্ট্যে বিশ্বব্যাপী আজ নন্দিত ও স্বীকৃত। গতকাল বুধবার (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখ)-এর নির্বাচনও এই নির্বাচন কমিশনই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছে। সরকারী ক্ষমতায় থেকে বিএনপি কোথাও তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি।"

২৮৬। ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের বিষয়ের ওপর সংসদে বিতর্কের এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমদ নির্বাচনকে একটি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "আজ মিরপুর উপনির্বাচনকে নিয়ে এখানে প্রশ্ন উঠেছে। জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে।" তারপর তোফায়েল আহমদ বলেন, "নির্বাচন কমিশনের সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে বিরোধী দল থেকে কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি। বুধবার (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখ) বেলা ৩টা পর্যন্ত মিরপুর উপনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। ভোট গণনা শেষ না হতেই ইউএনবিকে দিয়ে তড়িঘড়ি করে রেডিও-টিভিতে নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ফলাফল ঘোষণা না করলে এবং রাতে পুলিশ কমিশনার রকিবুল হুদা যদি (মিরপুর) ১০ নম্বর গোল চক্করের রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না যেতেন, তাহলে নির্বাচন কমিশনের সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিলো তা নস্যাৎ হয়ে যেতো না। প্রধান মন্ত্রীর সচিব কামাল সিদ্দিকীর নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার কথা নয়, কেননা তিনি একজন আমলা। সুগন্ধা (প্রধান মন্ত্রীর সন্ধ্যাকালীন কার্যালয়) থেকে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করা হয়েছে। রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে ফলাফল আসা বন্ধ থাকার বিষয় এবং একটি নির্বাচনের ৪ ধরনের ফলাফল ঘোষণার ঘটনা আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনের অর্জিত বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন সম্ভব নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮৭। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুবিধাদির অপব্যবহার করে সরকারী দল বিএনপির প্রার্থীর অনুকূলে নেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের সে অভিযোগের প্রতিবাদ করে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "নির্বাচনের ফলাফলে কোন কারচুপির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনে কোন অভিযোগ করেনি। তাই ঘোষিত ফলাফল বৈধ এবং তা সকলকে গ্রহণ করতে হবে।" নির্বাচনের ফলাফল মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে সরকারী দল বিএনপি প্রার্থীর অনুকূলে ঘোষণা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের এই অভিযোগের জবাবে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য। বিশ্বের সকল দেশে নির্বাচনের ফলাফল বেসরকারী সংস্থার বরাত দিয়ে রেডিও-টিভিতে প্রচারের রেওয়াজ স্বীকৃত। এক্ষেত্রে সরকারের মিডিয়া কোন ব্যতিক্রম করেনি।"

২৮৮। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) উপনির্বাচনের বিষয়ের ওপর সংসদে আলোচনায় অংশ নিয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কয়েকটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেন, "জেলা প্রশাসক সাধারণত এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হয়ে থাকেন। কিন্তু এই উপনির্বাচনে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে।" তারপর মোহাম্মদ নাসিম আরও বলেন, "প্রধান মন্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া) এই উপনির্বাচনের কারণে সরকারী ঘোষণা দিয়ে নির্ধারিত বিদেশ সফরে যাননি। এই উপনির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছেন। তাই তা বানচালের চেষ্টা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। স্বৈরাচারী সরকার মিডিয়া ক্যুর জন্ম দিয়েছিলো আর আবার একজন নেত্রীর সময়ে সেই মিডিয়া ক্যু করা হয়েছে। তা না হলে, বিএনপি (সরকারের) টিভি কোন্ উৎসাহে নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ফলাফল আগাম ঘোষণা করলো? এর একটি মাত্রই উদ্দেশ্য যাতে আগামীতে নির্বাচন কমিশন আর নিরপেক্ষভাবে ফলাফল না দিতে পারে।" তারপর মিরপুর উপনির্বাচনের ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "(মিরপুর নির্বাচনী এলাকার) ১৬টি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ (প্রার্থীর) এজেন্টদের রেজাল্ট শীট দেয়া হয়নি। জোর করে তাদের (ভোটকেন্দ্র থেকে) বের করে দেওয়া হয়েছে।" তাই, মোহাম্মদ নাসিম মিরপুর নির্বাচনী এলাকার ঐ ১৬টি ভোট কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন দাবি করেন।

২৮৯। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুবিধাদির অপব্যবহার করে সরকারী দল বিএনপি প্রার্থীর অনুকূলে নেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের এই অভিযোগের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সংসদে বলেন, "আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিলো যে, ২৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী জিতবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি বলছি (যে), এবারই প্রথম রেডিও-টিভিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। ইউএনবির খবরটি টিভি কেন প্রচার করলো তার জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। আমি নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিনি। (বিগত) পৌরসভার নির্বাচনে এক ভোটের ব্যবধানে আমাদের সমর্থিত প্রার্থীর পরাজয় মেনে নিয়েছি।"

২৯০। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ওপর সংসদে আলোচনার এক পর্যায়ে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, "গণতন্ত্র আজ এক বিরাট সংকটের সম্মুখীন। মিরপুর আসনের নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী ছিলো। আমরা হেরেছি। কিন্তু কার কাছে হার স্বীকার করবো, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই নির্বাচন বিতর্কিত নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনী বিধিমালা সম্পূর্ণভাবে লংঘন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। এই (বিএনপি) সরকার ১৪৪ ধারার গণতন্ত্র চালু করেছে। আমাদের সভা-সমিতি করতে দেওয়া হয়নি। আমরা যেখানেই সভা করার ঘোষণা দিচ্ছি, সেখানেই বিএনপি অংগসংগঠন দিয়ে সভা আহ্বান করে ১৪৪ ধারা জারি করা হচ্ছে।" তারপর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরও বলেন, "অভিযোগ উঠেছে যে, নির্বাচনের ফলাফল মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে কেড়ে নেয়া হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, টেলিভিশনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি বলতে পারি যে, যতদিন বর্তমান তথ্যমন্ত্রী থাকবেন ততদিন রেডিও-টেলিভিশনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকবেই।"

২৯১। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) উপনির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রেডিও-টিভিতে ঘোষণার মাধ্যমে সরকারী দল বিএনপি প্রার্থীর অনুকূলে নেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের সে অভিযোগের জবাবে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, "(ব্যারিস্টার) মওদুদ আহমদ বলেছেন, (যে), নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। তাঁর এ বক্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। সারা জাতি জানে (যে), নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল আসার পর ঢাকার মেয়র মীর্জা আব্বাসের নেতৃত্বে বিজয় মিছিল বের করা হলে, সেই মিছিলের ওপর ব্রাশ ফায়ার করা হয়। কাদের সিদ্দিকী, সৈয়দ আবুল হোসেন ও আ. স. ম. ফিরোজের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কক্ষে হামলা চালানো হয়। বোমাবাজি করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। পুলিশ না গেলে রিটার্নিং অফিসার ফলাফল প্রকাশ করতে পারতো কিনা তাতে সন্দেহ আছে।"

২৯২। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ওপর সংসদে আলোচনার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আ. স. ম. ফিরোজ বলেন, "(রাত) ৯টা ৩০ মিনিটে (ঢাকার) ডিসি যখন ফলাফল প্রকাশ করছিলেন, তখন একজন এসবির লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোট নিচ্ছিলেন।হঠাৎ করে এসবির লোকটি সেখান থেকে চলে যায়। এর ৪০ মিনিট পর (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ) কমিশনার রকিবুল হুদা সেখানে আসেন। এসে তিনি (রকিবুল হুদা) একটি গালি দিয়ে বলেন, 'ওরা এখানে কি চায়?' এর কিছুক্ষণ পরেই কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা শুরু হয়। তখন রকিবুল হুদা পাশের একটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে ডিসির সাথে আলাপ শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি সেই রুমে যাই। (তখন) রকিবুল হুদা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এখানে কি চান?' আমি তাঁকে বলি, 'আমি এখানে না থাকলে আপনিও থাকতে পারেন না। আপনার কি অধিকার আছে এখানে ঢোকার?' এর পর রকিবুল হুদা (প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্ধ্যাকালীন কার্যালয়) সুগন্ধার সাথে টেলিফোনে কথা বলে আমাকে গ্রেফতার করার অনুমতি চান।" তারপর আ. স. ম. ফিরোজ আরও বলেন, "১৬টি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টদেরকে স্বাক্ষর করা কপি দেয়নি। কপি না নিয়েই আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টদের (ভোটকেন্দ্র থেকে) চলে আসতে বাধ্য করা হয়েছে।"

২৯৩। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ওপর সংসদে আলোচনায় অংশ নিয়ে গণতন্ত্রী পার্টির সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে, সে বিষয়ে কেউই বিতর্ক তোলেন নি। নির্বাচন কমিশনের ৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সব কিছু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ডিএমপির কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদার নির্বাচন কন্ট্রোল রুমে অযাচিত আগমনে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতার ওপর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ঘটে যায়। এরপর স্বরাষ্ট্র ও তথ্যমন্ত্রী এর দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রতিফলনে বাধার সৃষ্টি হলে আন্দোলন ও সরকার উৎখাতের পথ সুগম হয়ে যায়।"

২৯৪। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের বিভ্রান্তিকর ফলাফল নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ঘোষণার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের আপত্তির ওপর সংসদে আলোচনার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য খ. ম. জাহাঙ্গীর বলেন, "উপনির্বাচনের ফলাফল সংগ্রহ করতে নির্বাচন কমিশন বিভ্রান্তিকর কৌশল অবলম্বন করে। ফলে, পুরো ফলাফল হাতে পাওয়া সম্ভব হয়নি। (ঐ) নির্বাচনের কারচুপি ও অনিয়ম সম্পর্কে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগমালা লিখিতভাবে দাখিল করা হয়েছে।"

২৯৫। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ওপর সংসদে আলোচনার এক পর্যায়ে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর বর্ষীয়ান সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, "মিরপুরের নির্বাচনে অসত্য ফলাফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করে গণতন্ত্রের মূলে আঘাত করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অকার্যকর করা হয়েছে। দুই হুদাই (তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং ঢাকার মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদা) দেশের গণতন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট। তথ্যমন্ত্রী একতরফাভাবে রেডিও-টেলিভিশনে অসত্য ফলাফল প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনের পর পরাজয় জেনে বিএনপি কর্মী ও প্রতিনিধিরা এলাকা থেকে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু (পুলিশ) কমিশনার রকিবুল হুদা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঢোকার পর বিএনপি'র নেতারা সেখানে আসতে থাকে।" তারপর, আবদুস সামাদ আজাদ মিরপুরের নির্বাচন ও ফলাফল ঘোষণা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য দাবি করেন।

২৯৬। সুদীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ধরে সরকারী দল ও বিরোধী দলের সাংসদদের মধ্যে মিরপুরের উপনির্বাচনে সরকারী দলের ক্ষমতার অপব্যহার ও অনিয়ম সম্পর্ক যে বাদানুবাদ, বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক চলে তার সমাপ্তি টেনে বক্তব্য রাখেন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের কৃষি এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় দু'টোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মজিদ-উল হক। সেদিন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে উপস্থিত না থাকায় এবং সংসদ উপনেতা ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিদেশে থাকায় সরকারী দলের সংসদে ভারপ্রাপ্ত উপনেতা হিসেবে তাঁকে সে সমাপনী বক্তব্য রাখতে হয়। মেজর জেনারেল (অবঃ) মজিদ উল হক বলেন, "আজ সংসদে সত্য-অসত্য নিয়ে হোলিখেলা হয়েছে।" তারপর ঐ বিতর্ককে অপতর্ক হিসেবে অভিহিত করে সরকারী দলের বিএনপির সংসদের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উপনেতা মেজর জেন্যারেল (অবঃ) মজিদ-উল হক বলেন, "আমি নিজেকে ধিকৃত মনে করি, যদি আমাকে তার ভাগ নিতে হয়। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন (যেখানে) ইতিমধ্যে বিশ্বময় শীর্ষস্থানীয় মর্যাদায় আসীন হয়েছে, (সেখানে) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চলছে। এটা শুধু দুঃখজনকই নয়, লজ্জাকর।" উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার ষড়যন্ত্র এঁটেছে এবং অশুভ শক্তির আশ্রয় নিয়েছে সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের এই অভিযোগের জবাবে তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে মজিদ-উল হক বলেন, "মিডিয়া ক্যু কি জিনিস (আমরা) জানি না। যদি ভোট ডাকাতি করতাম, তাহলে বিগত উপনির্বাচনগুলোতে (মাত্র) কয়েক শত ভোটের ব্যবধানে বিএনপির প্রার্থীরা পরাজিত হতো না। আমরা সামান্য ভোট কারচুপি করা জানি না। (প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্ধ্যাকালীন কার্যালয়) 'সুগন্ধা' থেকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে কি-না এবং কিভাবে তা হয়েছে এসব আমাদের জানা নেই। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আত্মসম্মানবোধ থাকলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত—বিরোধী দলের এ বক্তব্য অযৌক্তিক ও অসৌজন্যমূলক।" নির্বাচনের ফলাফল পূর্বনির্ধারিত, এ বক্তব্য অস্বীকার করে সংসদে সরকারী দলের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনেতা মেজর জেনারেল (অবঃ) মজিদ-উল হক তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে বলেন, "৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে আতংকিত হয়ে কারা গোলযোগ করেছে, তা মিরপুরের ভোটার ও জনগণ জানেন।" পরিশেষে, সরকারী মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল সরকারী দল বিএনপির প্রার্থীর অনুকূলে নেওয়া হয়েছে সংসদে বিরোধী দলের এই অভিযোগ অস্বীকার করে মজিদ-উল হক দাবি করেন, "(সরকারী) মিডিয়া ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফল (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত) তিন জোটের রূপরেখার অংগীকারেরই বহিঃপ্রকাশ। রেডিও-টিভির স্বাধিকারে (বিএনপি) সরকার হস্তক্ষেপ করেনি।"

২৯৭। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে জাতীয় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের অন্তর্ভুক্ত সারা এলাকায় সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঐ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে তাঁদের প্রার্থীর অনুকূলে নেওয়ার প্রতিবাদে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ঐ হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছিল। ঐ অর্ধদিবস হরতালের সময় বিক্ষুব্ধ জনতার সাথে পুলিশের দু'ঘন্টা ধরে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। নির্বিচারে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশের পাইকারী হারে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে গোটা মিরপুর এলাকা রণাংগনে পরিণত হয়। পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। গ্রেফতারও করা হয় শতাধিক ব্যক্তিকে। সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত মিরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে, মহল্লায় স্বতঃস্ফূর্ত জনতার অনেক খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। সে সময় মিরপুর ১০ নম্বর সেকশন থেকে ১২ নম্বর পল্লবী এলাকায় সকল দোকানপাট ছিলো সম্পূর্ণ বন্ধ। সেখানে কোনও যানবাহন চলাচল করেনি। সেখানের প্রধান রাস্তাঘাটগুলো ছিল ফাঁকা। মিছিলে-শ্লোগানে সারা মিরপুর এলাকা ছিলো প্রতিবাদমুখর। সেসব শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদমুখর মিছিলে সরকারী দল বিএনপির সন্ত্রাসী মাস্তান বাহিনী এবং পুলিশ উপর্যুপরি হামলা চালায়। ঐদিন সকাল প্রায় সাড়ে ৯টায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ের সম্মুখ (মিরপুর ১১ নম্বর সেকশন) থেকে ১০ নম্বর গোলচক্কর অভিমুখে একটি বিশাল শ্লোগানমুখর প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ঐ মিছিলে পুলিশ আকস্মিকভাবে হামলা চালায় এবং নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও পরে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে সে মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ জনতা আবারো একত্র হয়ে মিছিল বের করার চেষ্টা চালালে পুলিশ পুনরায় লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। তখন উত্তেজিত জনতা পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। অপরদিকে, পুলিশকেও জনতার প্রতি পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। সে সময় পুলিশ পথচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র, যাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় তাকেই গ্রেফতার করে রাস্তায় এবং পুলিশের গাড়িতে তুলে বসিয়ে রাখে। এমন কি দোকানপাট, বসতবাড়িতে প্রবেশ করেও পুলিশ যাকে পায় তাকেই গ্রেফতার করে। পুলিশের ঐ গ্রেফতার চলে পাইকারী হারে। সেই সঙ্গে উত্তেজিত জনতার সাথে চলে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ। সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে মিরপুরের ১০ নম্বর সেকশনের গোল চক্করের আশপাশের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশী সংঘর্ষ হয় মিরপুরের ১০ নম্বর সেকশন থেকে ১১ নম্বর সেকশনের রোড ধরে।

২৯৮। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে হরতাল চলাকালে বেলা প্রায় ১১টায় ব্যাপক সংখ্যক পুলিশের একটি দল উত্তেজিত জনতাকে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে করতে ঐ উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারের প্রধান নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা চালায়। প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ের প্রধান ফটক ভেঙ্গে পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে লোকজনকে বেদম প্রহার, আসবাবপত্র ভাংচুর ও গালিগালাজ করে। ঐ নির্বাচনী ক্যাম্পে টাংগানো একটি বিশালা-কৃতির বঙ্গবন্ধুর ছবিতে পুলিশ প্রথমে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে এবং পরে নীচে নামিয়ে সেটিতে অনেকক্ষণ ধরে লাথি মারে। পুলিশের মুখ থেকে তখন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সেনাদের মুখ থেকে যে ধরনের গালিগালাজ বের হতো, ঠিক অনুরূপ আধা উর্দু ও আধা বাংলায় গালিগালাজ বের হয়। সেই সঙ্গে মুখ খিস্তি করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজও করে। তাছাড়াও, পুলিশ আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারের প্রধান নির্বাচনী ক্যাম্পভবনের নিচতলা ও দোতলায় অবস্থিত সাপ্তাহিক 'দিনান্তর' পত্রিকা অফিস ভাংচুর করে। পুলিশ সেখান থেকে ৩০ জনকে ধরে বেদম প্রহার করতে করতে পুলিশের গাড়িতে তুলে নেয়। মিরপুর নির্বাচনী এলাকায় সংঘটিত ঐ সংঘর্ষের সময় পুলিশ প্রধান নির্বাচনী ক্যাম্প ছাড়াও বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ অফিস এবং নির্বাচনী ক্যাম্প ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। বেলা বারোটার দিকে উত্তপ্ত ও অশান্ত পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় বিডিআর-এর টহলের ব্যবস্থা করা হয়। বেলা প্রায় ১টার দিকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু তখনও, বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ও স্থানে লোকজনের জটলা বাধার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐদিন বিকেলে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মিরপুরে একটি বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সে জনসভায় ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মিরপুরে প্রতিদিন অর্ধদিবস হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

২৯৯। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে তাঁদের প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীনের অনুকূলে নেওয়ার তীব্র নিন্দা করে ও ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে 'গণতন্ত্রী পার্টির' সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল একটি বিবৃতি প্রদান করেন। একই দিনে আওয়ামী লীগ সমর্থক 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই)' সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জনগণের প্রদত্ত রায় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে হাইজ্যাক করার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। ঐ সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ (মিরপুর) উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত বিএনপি সরকারের পতনের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। ঐ ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা আতাউর রহমান আতা, খ.ম. হাসান কবির, আরিফ, পংকজ দেবনাথ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। একই দিনে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের (ম-ই) তৎকালীন সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম ইকবাল এক বিবৃতিতে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত মিরপুর উপনির্বাচনের ফলাফল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে বিএনপি প্রার্থীর অনুকূলে নেওয়ার ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। ছাত্র নেতৃদ্বয় রাষ্ট্রের সম্পত্তি রেডিও-টেলিভিশন ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-কর্তৃক ঐ উপনির্বাচনের মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের তীব্র নিন্দা করেন এবং বাসস-এর চীফ রিপোর্টারের পদত্যাগ দাবি করেন। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃদ্বয় ঐ বিবৃতিতে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সারা ঢাকা নগরীতে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৬ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান। তাছাড়াও 'গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য' এবং জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় নির্বাচন কমিশনকে উপেক্ষা ও বিএনপি সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে।

৩০০। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ রাত প্রায় পৌনে ৮টায় কতিপয় সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান সংসদের ঢাকা-১১ আসনের এলাকা মিরপুরের ৭ নম্বর সেকশনে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন শ্রমিক লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা বেগমকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ দেলোয়ারা বেগমকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সে সময় গুণ্ডা-মাস্তানরা জনাব তোফায়েল আহমদের বাড়ির টেলিভিশন-সহ অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট ও ভাংচুর করে। ঐসব সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তানদের তাণ্ডবলীলার সময় জনাব তোফায়েল আহমদ তাঁর বাসায় ছিলেন না। তাছাড়াও, ঐসব সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তানরা সে সময় মিরপুর ৭ নম্বর সেকশনের শ্রমিক লীগ, আওয়ামী লীগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও চার-পাঁচটি বাড়িতে হামলা, ভাংচুর এবং নারী ও শিশুদের মারধোর করে। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ সে সময় সে ব্যাপারে রহস্যময় ভূমিকা পালন করে। ঐদিন রাত ১০টা পর্যন্ত ঐসব সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তানরা মিরপুরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও জীবন নাশের হুমকি দেয়।

৩০১। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ, শুক্রবার বিকেলে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু ও কারচুপির মাধ্যমে তাদের প্রার্থীদের অনুকূলে নেওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এক জনসভার আয়োজন করে। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ জনসভায় দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুল মান্নান, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা বেগম আইভি রহমান, মহানগর আওয়ামী লীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আখতারুল আলম, এডভোকেট কামরুল ইসলাম, ডাঃ আবদুস সালাম, মকবুল আহমেদ ও কামাল আহমদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। ঐ প্রতিবাদ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, "জাতীয় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহ্মদ মজুমদার বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু বিএনপি সরকার ষড়যন্ত্র করে এই বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।" তার প্রতিবাদে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ শনিবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সারা ঢাকা নগরীতে সর্বাত্মক হরতাল পালন করার জন্য ঢাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, "নব্য স্বৈরাচার ও ভোট চোরের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। মিরপুরে ভোট কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর পর সরকারী দল এখন নির্বাচনোত্তর শ্বেত সন্ত্রাস শুরু করেছে। (মিরপুরে বসবাসকারী) আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি হামলা, ভাংচুর, গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে।" ঐ প্রতিবাদ সভা শেষে একটি মশাল মিছিল বের করা হয় যা সদরঘাটে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

৩০২। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ইতিপূর্বে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে মিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ঘোষিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন মিরপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালনের কর্মসূচী আংশিকভাবে সংশোধন করা হয়। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এম. এ. কাসেম এক বিবৃতিতে বলেন, "পবিত্র শবে-বরাতের কারণে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী সংশোধন করে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অর্ধদিবস হরতাল পালনসহ ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) পর্যন্ত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসনের সারা এলাকার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রতিদিন প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।"

৩০৩। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ শুক্রবার ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের প্রধান সমন্বয়কারী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী ও প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট দলের সংসদ সদস্য খ. ম. জাহাংগীর উপরোক্ত নির্বাচনী আসনের ১৮টি ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানান। সেসব ভোটকেন্দ্রের নম্বর ছিল ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৬, ৭৪, ৭৫, ৮৫ ও ১১০। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ঐ কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী বিধি-বিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টদেরকে নির্বাচনী ফলাফলের সত্যায়িত কপি দেওয়া হয়নি। তাছাড়াও, বিধি মোতাবেক ব্যালট পেপারের সংখ্যার সত্যায়িত কপি কোন ভোটকেন্দ্রেই দেওয়া হয়নি। উপরোক্ত সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী কামাল আহমদ মজুমদার। ঐ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য খ. ম. জাহাংগীর।

৩০৪। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, "সরকার মিরপুরের উপনির্বাচনে সংবিধান লংঘন করে নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে। সরকার নির্বাচনী আচরণ বিধিকে সম্পূর্ণভাবে লংঘন করেছে। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের মন্ত্রীদেরকে নির্বাচনের সময় কোন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী গয়েশ্বর রায়, সাদেক হোসেন খোকা, মেজর (অবঃ) মান্নানসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার রকিবুল হুদাকে নির্বাচনের দিন নির্বাচনী এলাকায় না যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের ওপর সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব দেন। কিন্তু রকিবুল হুদা সেই আদেশকে অমান্য করে নির্বাচনের দিন রাতে মিরপুর থানায় গিয়ে অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। রাত প্রায় ৮টা ১৫ মিনিটে রকিবুল হুদা মিরপুরের ১০ নম্বর গোল চক্করস্থ নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণ কক্ষে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা নির্বাচনী আইনের সম্পূর্ণ লংঘন। নির্বাচনের দিন রাত ১০টায় নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ইউএনবি সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে রেডিও-টেলিভিশনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএনপি প্রার্থীকে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা নির্বাচন কমিশনের কাজের ওপর সরকারী হস্তক্ষেপের শামিল।"

৩০৫। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত উপরোল্লিখিত সংবাদ সম্মেলনে তারপর বলা হয়, "নির্বাচনের দিন বিকেল ৫টায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান এজেন্টকে মিরপুরস্থ নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম থেকে রিটার্নিং অফিসার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ কন্ট্রোল রুমেই কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল একত্রীকরণ করা ছিলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ সময় কোন দলেরই প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্টরা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। এমন কি সেখানে রিটার্নিং অফিসারও উপস্থিত ছিলেন না। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ঢাকা কালেক্টরেট ভবন (রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়)-এ গিয়ে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের চেয়ার দুটো খালি দেখতে পান। সেখানে নির্বাচন কমিশনের জনৈক উপসচিবসহ কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাইরের লোকজনকে বসে থাকতে দেখেন। এই অবস্থায় টেলিফোনযোগে ভোটকেন্দ্র ওয়ারী শুধু 'নৌকা' (আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক) এবং 'ধানের শীষ' (বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক)-এর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা আসতে শুরু করলে, আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান এজেন্টের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তখন তিনি জানতে চান যে, ঐ ফলাফল কোথা থেকে আসছে। তখন তাঁকে জানানো হয় যে, মিরপুরস্থ নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ঐ ফলাফল আসছে। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচন এজেন্টের সন্দেহ হলে, তিনি নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিস্মিত হয়ে তাঁকে মিরপুরস্থ নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণ কক্ষে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে তাৎক্ষণিকভাবে সে ব্যাপারে মৌখিক আপত্তি জানিয়ে মিরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পথিমধ্যে আগারগাঁও পৌছার পর পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। নিরুপায় হয়ে তখন তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দ্বারস্থ হন এবং সকল ঘটনা তাঁকে খুলে বলেন। তারপর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্টকে তাঁর সংগে মিরপুরস্থ নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে যেতে বলেন এবং বিএনপি প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্টকেও তাঁর সংগে যাবার জন্য খবর দেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মিরপুরস্থ নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট দেখতে পান যে, সেখানে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত নির্বাচনী ফলাফল পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। এরই মধ্যে খবর আসে যে, টেলিভিশনে বিএনপি প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই অবস্থায় নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা না করেই সকলে মিরপুরস্থ নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ত্যাগ করেন।" ঐ সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্টের লিখিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "৪ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে কালেক্টরেট ভবনে বিকেল ৪টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট-কেন্দ্র ওয়ারী নির্বাচনী ফলাফল একত্রীকরণ করা হবে, এই মর্মে তাঁদেরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে ১৭টি পয়েন্টসম্বলিত আপত্তি উত্থাপন করে তাঁরা রিটার্নিং অফিসারের সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে জানা যায় যে, সেখানেও নির্বাচনী বিধিবিধান মোতাবেক ভোটকেন্দ্র ওয়ারী নির্বাচনী ফলাফল একত্রীকরণ করা হয়নি। শুধুমাত্র, পূর্বের তৈরী একটি নির্বাচনী ফলাফল শীট পাঠ করে শোনানো হয়।"

৩০৬। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু ও কারচুপির মাধ্যমে দলের প্রার্থীর অনুকূলে ঘোষণার প্রতিবাদে ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ শনিবার রাজধানী ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা এবং ১০ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ বুধবার সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। ঐ বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেন, "দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সমগ্র দেশবাসী স্বৈরশাসন, হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পরিবর্তে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও রক্ত দানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। ভোট ডাকাতি, ভোট কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর বিরুদ্ধে আমরা জোটবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিলো জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার পুনরুদ্ধার। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তন করা। কেননা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্বাচন অবশ্যই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে। অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ প্রতিষ্ঠা দুরাশামাত্র। সেই লক্ষ্যে আমাদের বিশ্বাস ছিলো যে, শাসনতান্ত্রিক বিধানমতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। গণতন্ত্রের চর্চা, গণতন্ত্রের বিকাশ, সমাজ ও জাতির জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। দেশবাসীর জানা আছে যে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী আচরণ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০৭। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে প্রদত্ত ঐ বিবৃতিতে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে তার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ফলাফল ঘোষণা করার পূর্বেই চক্রান্ত ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শাসকদল (বিএনপি) নির্বাচনী বিধিমালা লংঘন করার যে নজিরবিহীন অপদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, দেশের সচেতন গণতন্ত্রকামী জনগণের তার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। দেশে ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সকল বেসরকারী ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এবারের (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১, মিরপুর আসনের) উপনির্বাচনে শুধুমাত্র শাসকদল (বিএনপি)-এর প্রার্থীকে বিজয়ী করার অসৎ উদ্দেশ্যে শাসনতান্ত্রিক বিধান, নির্বাচন বিধিমালা ও প্রচলিত পদ্ধতি লংঘন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে একটি সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর (বেগম খালেদা জিয়ার সন্ধ্যাকালীন কার্যালয়) 'সুগন্ধায়' তৈরী ঐ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বিভিন্ন সংবাদপত্রে টেলিফোন করে '(সরকারী দল) বিএনপি প্রার্থী ৩ হাজার ৮শত ৩ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে' এই সংবাদ ছাপানোর নির্দেশ প্রদান করেছে। অন্যদিকে, বিএনপি প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট বার্তা সংস্থা (বাসস)-কে জানিয়েছে যে, বিএনপি প্রার্থী ২ হাজার ৬ শত ৮৪ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে। উক্ত (প্রধান) নির্বাচনী এজেন্ট, বিএনপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৭৯ হাজার ১ শত ১৮টি ভোট এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৭৬ হাজার ৪শত ৩৪টি ভোট বলে (ঐ) বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছে। অন্যদিকে, (রাষ্ট্রীয়) টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে যে, (সরকারী দল) বিএনপি প্রার্থী ৭৯ হাজার ৬ শত ৯৫টি ভোট এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৭৫ হাজার ৮ শত ৯২টি ভোট পেয়েছে। (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখ) রাত সাড়ে ১১টায় (রাষ্ট্রীয়) টেলিভিশনে প্রচারিত বাংলা সংবাদে (সংশ্লিষ্ট) ঘোষিকা বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ভোটের ব্যবধানের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে দু'বার দু'রকমভাবে প্রচার করে। অন্যদিকে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সূত্রমতে নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ অফিসারের তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী ৯৩ হাজার ৭ শত ৯৭টি এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৯০ হাজার ৬ শত ৮৪টি ভোট পেয়েছে। আবার গতকাল (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখ) বিকেলে রিটার্নিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফলে জানা যায় যে, বিএনপি প্রার্থী ৮০ হাজার ১ শত ২৭টি এবং আওয়ামী লীগ ৭৭ হাজার ৫ শত ৩৫ ভোট পেয়েছে। এসব অসংগতিপূর্ণ ফলাফল ঘোষণায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, (বিএনপি) সরকার প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ফলাফলকে স্বপক্ষে আনার জন্য নির্বাচনী ফলাফলের বিবরণী তালিকা পরিবর্তন, কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর আশ্রয় নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা সুষ্ঠু, সঠিক ও নিরপেক্ষ হয়নি। (তাই) গণতন্ত্রকামী মানুষ এই ধরনের নজিরবিহীন ঘৃণ্য কারচুপির ফলাফলকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না।"

৩০৮। ঐ বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, "আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত একথা আঁচ করতে পেরে এক পর্যায়ে (বিএনপি) সরকার (ঐ নির্বাচনী) ফলাফলকে নিজের (দলের) পক্ষে নেয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। ৭৮টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল (নির্বাচন কমিশনকে) প্রদানের পর হঠাৎ করে মিরপুরে স্থাপিত রিটার্নিং অফিসারের কন্ট্রোল রুম থেকে নির্বাচন কমিশনে ফলাফল জানানো বন্ধ করে দেয়। সরাসরি সরকার প্রধান (বেগম খালেদা জিয়া)-এর হস্তক্ষেপে এই ফলাফল পাঠানো বন্ধ হয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। কন্ট্রোল রুমে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রতিনিধিদের কাউকে ফলাফলের বিবরণী তালিকা দেখতে দেয়া হয়নি। অথচ, তাঁদের চোখের সামনে (রাষ্ট্রীয়) গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা (ঐ নির্বাচনের) ফলাফল নিয়ে চলে যায়। আওয়ামী লীগের প্রার্থীর প্রতিনিধিবৃন্দ (ঐ নির্বাচনের) ফলাফল বিবরণী দেখানোর দাবি করলে জেলা প্রশাসক (সহকারী রিটার্নিং অফিসার) তাঁদের বলেন যে, ফলাফল বিবরণীতে কিছু ভুলত্রুটি আছে, যা সংশোধন করতে হবে। এই সময়ে ঢাকার পুলিশ কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদা সেখানে যায় এবং আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের সংগে দুর্ব্যবহার করে এবং প্রধান মন্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া)-এর নির্দেশ মোতাবেক তাঁদের গ্রেফতার করার হুমকি দেয়। উক্ত রকিবুল হুদা জেলা প্রশাসককে (ঐ নির্বাচনী) রেজাল্ট শীট ও ফলাফল বিবরণী তালিকাসহ একটি কক্ষে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিনিধিদের কোনক্রমেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।"

৩০৯। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঐ বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেন, "বিধি মোতাবেক রিটার্নিং অফিসারের অফিসে (নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী) প্রার্থী ও প্রার্থীদের এজেন্টদের সামনে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সীলগালা করা প্যাকেট খুলে (ভোট) গণনার নিয়ম। সেখানে সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও মিরপুরের অস্থায়ী কন্ট্রোল রুমে বসে ফলাফল ঘোষণা করা নির্বাচনী নিয়ম লংঘন করার সামিল। নির্বাচন কমিশনের অফিসে (ঐ নির্বাচনী) ফলাফল পাঠানো বন্ধ, পূর্বাহ্নে ফলাফল বাইরে পাঠানো এবং ফলাফল পাল্টে দেওয়ার নীল নকসা বাস্তবায়নের জন্য রকিবুল হুদার আগমন, ১৬টি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর এজেন্টদের নির্বাচনী ফলাফলের তালিকা প্রদান না করা এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিনিধিদের জোরপূর্বক বাইরে রাখা, এসবই ছিলো এক গভীর পরিকল্পিত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে (ঐ) নির্বাচনের ফলাফলকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। জনগণের বিজয়কে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১০। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে প্রদত্ত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পরিশেষে বলেন, "স্বৈরাচার চলে গেলেও দেশে আজও স্বৈরাচারী পদ্ধতি বহাল আছে। স্বৈরাচারের আদলে কৌশল পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বের (এরশাদ আমলের) চর দখলের মতো বুথ দখলের পরিবর্তে আজ (প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন) বিএনপি সরকার (নির্বাচনী) ফলাফল তালিকা, রেজাল্ট শীট হাইজ্যাক এবং মিডিয়া ক্যু'র আশ্রয় নিয়েছে। এটা কোনক্রমেই সুষ্ঠ নির্বাচনের নিদর্শন হতে পারে না। মিরপুরের এই উপনির্বাচন (এরশাদের) স্বৈরাচারী নির্বাচনী ধারাকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে। এই (উপ)নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, বিএনপি সরকারের অধীনে কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সমুন্নত রাখা এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার স্বার্থে আজ দেশের সচেতন গণতন্ত্রকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে (প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি) সরকারের এই ঘৃণ্য নীল নকসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ভোট কারচুপি, (নির্বাচনী) রেজাল্ট পাল্টে দেয়া, মিডিয়া ক্যু ও (রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাদিসহ) ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদে জনগণকে সোচ্চার হতে হবে।"

৩১১। শনিবার ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) সারা (রাজধানী) ঢাকা মহানগরীতে পালিত হয় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার, মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ আহূত সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল। হরতাল চলাকালে, ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশের অতর্কিত হামলায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিমসহ বেশ ক'জন কর্মী আহত হন। তাছাড়াও, ঐদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে হরতালের সমর্থনে মিছিল ও পিকেটিং করার সময়ে পুলিশ শতাধিক ব্যক্তিকে আটক করে। পরবর্তীতে, হরতাল শেষে পুলিশ ৮ জনকে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয় যে, ঐ ৮ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। হরতাল চলাকালে, ঢাকা মহানগরীর দোকানপাট বন্ধ ছিলো। কিছু সংখ্যক রিকশা ছাড়া, অন্য সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিলো। কোনও ব্যাংকে কাজ হয়নি। রিকশা চলাচলের জন্য নিষিদ্ধ 'ভিআইপি' সড়ক দিয়েও রিকশা ও ভ্যানগাড়ি চলাচলে পুলিশ কোন বাধা দেয়নি। পুলিশ প্রহরায় কয়েকটি বিআরটিসি বাস চালানোর চেষ্টা কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দুপুর বারোটা পর্যন্ত কোনও ক্লাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস গ্যারেজ থেকে বের হয়নি। দুপুর ১২টার পর পরই বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আমীর হোসেন আমু, দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, প্রচার সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মমতাজ হোসেন, দলের মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, সহসভাপতি মুনির হোসেন খান, যুগ্ম সম্পাদক কামরুল ইসলাম, আখতারুল আলম, যুবলীগের অধ্যাপক ফজলুল হক, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা কামরুজ্জামান আনসারী, মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন এবং ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি খিজির হায়াত লিজু। ঐ হরতাল-উত্তর সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন জোরদার করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা আরও বলেন, "এ সরকারের আচরণ স্বৈরাচার এরশাদ (ও তাঁর সরকার)-এর অনুরূপ। গণতন্ত্রের পোশাকে (বিএনপি) সরকার সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। জাতীয় সংসদের (ঢাকা-১১) মিরপুর (আসনের) উপনির্বাচনে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ফলাফল পাল্টে নিজেদের (দলের) প্রার্থীকে বিজয়ী (ঘোষণা) করা তার যথার্থ প্রমাণ। তাই, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্র রক্ষায় আবার রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

৩১২। ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীতে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের পরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে প্রস্তাবে বলা হয়, "(৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত) মিরপুর উপনির্বাচনে (প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি) সরকার ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী গণতান্ত্রিক বিধিমালা লংঘন করে রেজাল্ট শীট পাল্টে দিয়ে এবং নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ভোটের ফলাফল ঘোষণার নজিরবিহীন সূক্ষ্ম কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে।" তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঐ প্রস্তাবে বলা হয়, "স্বৈরাচারের পতন হলেও স্বৈরাচারের আদলে বর্তমান নব্য স্বৈরাচার সুকৌশলে চর দখলের মতো বুথ দখলের পরিবর্তে ভোটের রেজাল্ট শীট হাইজ্যাক করে জনগণের বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া সরকারের এই 'অভিনব ভোট চুরির' প্রতিবাদে জনগণ যখন হরতালের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছিলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত জঘন্য ও নির্লজ্জভাবে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিকে পদদলিত করার লক্ষ্যে গ্রেফতার ও নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে।" (রাজধানী ঢাকার) মিরপুরে প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় এবং সরকারী মদদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতাসীন (বিএনপি) দলের সশস্ত্র গ্রুপের সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয়, "(বিএনপি) শাসকগোষ্ঠী মিরপুরে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা, অত্যাচার-নির্যাতন, পাইকারী গ্রেফতার ও হয়রানির পথ বেছে নিয়েছে।" ঐ প্রস্তাবে, ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সারা ঢাকা নগরীতে সর্বাত্মক হরতাল চলাকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশের হামলা, সেখানে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম ও ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াসহ নেতা-কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ, দলের বরিশাল জেলা শাখার কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনীর অনেক সন্ত্রাসী হামলার উল্লেখ করে সেসবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। পরিশেষে, ঐ প্রস্তাবে বলা হয়, "জনগণের অধিকার আদায়ে, ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে আওয়ামী লীগ কোনদিন পিছপা হয়নি। অত্যাচার, নিপীড়ন ও হামলা করে জনগণের অধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করা যাবে না।"

৩১৩। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'ভোরের কাগজে' "৩০ নম্বর হেয়ার রোডের বাড়ি ঃ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "(মন্ত্রীদের রাষ্ট্রীয় ভবনাদির এলাকা ঢাকার মন্ত্রীপাড়াস্থ) ৩০ নম্বর হেয়ার রোডের প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণে নির্ধারিত ব্যয় ৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে ১৩ কোটি ৬৭ লাখ হওয়ার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবার লক্ষ্যে (ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক) গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পূর্ত মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে (যে), তদন্ত কমিটির রিপোর্টে (৩০ নম্বর) হেয়ার রোডের বাড়ি নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্টভাবে কাউকে দায়ী করা হয়নি। এমন কি, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বাড়িটি নির্মাণকালে দায়িত্বরত প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশও নেই। শুধুমাত্র, বাড়িটির সামনে তিনটি ফোয়ারা নির্মাণের কথা মূল নকশায় না থাকলেও (পূর্ত) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে (সম্পন্ন) করার কথা রিপোর্টে রয়েছে এবং এই বিষয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যের মধ্যে পার্থ্যক্য লক্ষ্য করা যায়। এদিকে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্য একটি কমিটি এ ব্যাপারে তদন্ত করে আর একটি রিপোর্ট তৈরি করছে।"

৩১৪। ৯ই ফেব্রুয়ারি (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'ভোরের কাগজে' "৩০ নবম্বর হেয়ার রোডের বাড়ি ঃ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে আরও বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় ঃ "এরশাদ সরকারের আমলে ৩০ নম্বর হেয়ার রোডের বাড়িটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। বাড়িটি তৈরি করা হচ্ছিলো উপরাষ্ট্রপতি অথবা রাষ্ট্রপতির (রাষ্ট্রীয়) বাসভবন হিসেবে। (১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরে) এরশাদ সরকারের পতনের পর (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন) অস্থায়ী সরকার বাড়িটির নির্মাণকাজ যখন বন্ধ করে, তখন ইতিমধ্যেই নির্মাণকাজে ৩ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। বাড়িটি নির্মাণের কাজ পেয়েছিল 'কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কন্সট্রাকশন'। এ ছাড়া, বিভিন্ন সাব-কন্ট্রাক্টের কাজ পেয়েছিলো 'সুপরিয়র বিল্ডার্স', 'কুমিল্লা ইলেক্ট্রনিক্স' এবং 'মালেক এন্ড কোম্পানী।' বিএনপি সরকারের আমলে বাড়িটি পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু হয়। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যায় (যে), মূল নকশার সঙ্গে কাজের কোনও সঙ্গতি নেই। ১৮ হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে বাড়ি নির্মাণের কথা থাকলেও, কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়াই এই আয়তন ২৬ হাজার বর্গফুট করা হয়। এই রাজকীয় বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত পার্শ্ববর্তী একটি বাসভবন ভাঙা হয়। মোট ১৩ কোটি ৬৭ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অথচ, ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের অসঙ্গতি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদের একটি বৈঠকে এবং জাতীয় সংসদে হৈ চৈ হয়। কিন্তু কোন্ ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নির্মাণ ব্যয় ছাড়িয়ে গিয়ে (মূল ঠিকাদার) 'কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন' এই প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করেছে, তা তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও স্পষ্ট নয়। তবে, (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের) মৌখিক নির্দেশে এই কাজ করা হয়েছে বলে (তদন্ত কমিটির) রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, মৌখিক নির্দেশে কিভাবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজ করলো তা পরিষ্কার নয়।"

৩১৫। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ছিলো সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ঘোষণা করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী। সন্ত্রাসী মাস্তানদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ, পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, মিছিলের ওপর পুলিশের গাড়ি উঠিয়ে দেওয়াসহ হরতালবিরোধী সকল অপচেষ্টা সত্ত্বেও ঐদিন বুধবার রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। রাজধানী ঢাকায় হরতাল চলাকালে জনতার একটি মিছিলের ওপর পুলিশের গাড়ি উঠিয়ে দিলে চাকায় পিষ্ট হয়ে একজন নিহত এবং মাস্তানদের গুলিতে ও পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জে শতাধিক আহত হয়। আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সশস্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্তানদের গুলিতে 'যুবলীগ' কর্মী জাহাংগীর নিহত হয় এবং আহতদের মধ্যে ৮ জনকে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকার প্রধান প্রধান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল বের হয়। পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় মাস্তানরা বেপরোয়া হয়ে হরতাল বানচাল করতে বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র হামলা চালায়। সকাল থেকে কয়েক দফা আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সমাবেশে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। স্বৈরশাসক এরশাদের (১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরে) পতনের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের আমলে ইতিপূর্বে কয়েকবার হরতাল হয়েছে। কিন্তু হরতাল বানচাল করতে অবৈধ অস্ত্রধারী মাস্তানদের প্রকাশ্যে এমনি সশস্ত্র তৎপরতা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

৩১৬। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদি অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ঘোষণার প্রতিবাদে আহূত রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল চলাকালে ঢাকায় ঘটা নানান ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর পরদিনে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেসব সূত্রমতে ঐদিন হরতাল পালনকালে ঢাকায় অফিস-আদালতে কাজকর্ম, ব্যাংক লেনদেন, দোকানপাট, বিপণী বিতান, কলকারখানা ও স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিলো। ঐদিন হরতাল পালনকালে ঢাকায় কার্যত সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিলো। পুলিশ প্রহরায় কয়েকজন মন্ত্রীর গাড়ি সচিবালয় আসে। সচিবালয়ের চারপাশের রাস্তা মিছিল ও সমাবেশ মুক্ত রাখতে পুলিশ জিরো পয়েন্ট, পুরানা পল্টন, আব্দুল গণি রোড ও প্রেস ক্লাবের কোণায় ব্যারিকেড করে রাখে। সকাল ৮টা পর্যন্ত পুলিশ প্রহরায় কয়েকটি বিআরটিসি বাস চালানো হয়। তোপখানা থেকে মন্ত্রীপাড়ার ভেতর দিয়ে সেসব বাস ফার্মগেট যাতায়াত করে। গাবতলী, সায়েদাবাদ, মহাখালী প্রভৃতি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল থেকে বেলা ২টার আগে কোন বাস ছাড়েনি। বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন আটকা পড়ে। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে কোন লঞ্চ ছাড়েনি। বিমানের বিভিন্ন ফ্লাইট বিলম্বিত হয়।

৩১৭। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদের ঢাকা-১১ (মিরিপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণার প্রতিবাদে আহূত সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যেসব ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পরিবেশিত হয়। ঐসব সূত্রমতে ঐদিন সকাল ৭টা হতে ঢাকার শাহবাগ মোড় থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাপ শাহ মাজার পর্যন্ত ৭/৮টি মাইক্রোবাসে চড়ে সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীরা হরতাল বানচালের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। বাসগুলো ঘন ঘন শাহবাগ, রমনা পার্ক এলাকা, ঈদগাহ, সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব সড়ক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক, কার্জন হল, সচিবালয়ের দক্ষিণ সড়ক, নিমতলী, ফুলবাড়িয়া, টিএন্ডটি ও গুলিস্তান এলাকায় চক্কর দেয়। সকালে আওয়ামী লীগ সমাবেশে এবং বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও গুলিবর্ষণের পর দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেসব এলাকায় উল্লিখিত মাস্তান-সন্ত্রাসীরা মাইক্রোবাসগুলোতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। এক একটি গাড়ীতে ওরা ছিলো ৪ থেকে ৫ জন করে। ঐ গাড়ীগুলো যখন চলাচল করে, তখন অস্ত্রধারীরা গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে পিস্তল, কাটা রাইফেলসহ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বাইরের দিকে তাক করে রাখে। বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে হামলার পরও, সেসব গাড়ী হতে সকাল ১১টায় শাহবাগ এলাকায় ৩ রাউন্ড, কার্জন হলের সামনের রাস্তায় ১২টায় ৪ রাউন্ড, নিমতলীতে দু'বার কয়েক রাউন্ড, দুপুর সোয়া ১২টায় প্রেসক্লাবের পশ্চিম পাশে চামেরী হাউসের সামনে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে এক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। সারাক্ষণই ঢাকার উল্লিখিত স্থানসমূহে জনসাধারণ, হরতাল সমর্থনকারী এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা ঐসব অস্ত্রধারীদের প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। উল্লিখিত সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীরা যেসব গাড়ী থেকে গুলি চালায় সেগুলোর নম্বর ছিলোঃ ঢাকা মেট্রো-জ-৭৮৬৫, ঢাকা-জ-৫৫৫৬, ঢাকা মেট্রো-চ-০২-০১৯২, ঢাকা মেট্রো-চ-৫৪২৭, ঢাকা মেট্রো-চ-৪৩৭০, ঢাকা মেট্রো-চ-৫৮২৪ ও নারায়ণগঞ্জ-ব-২২।

৩১৮। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণার প্রতিবাদে আহূত সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় সকাল ৯টা ১০ মিনিটে মাস্তান-সন্ত্রাসী বাহিনী ঢাকা-চ-৯৮২৪ ও ঢাকা মেট্রো-ভ-০১৯২ নম্বরের গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ে দ্বিতীয়বার হামলা চালায়। সে সময় তারা পুলিশের সামনেই কাটা রাইফেল, পিস্তল, স্টেনগানসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করে। হরতালকারী জনতা ঐ মাস্তান-সন্ত্রাসীদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে, তারা জনতাকে লক্ষ্য করে ব্যাপকভাবে গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করে। সেখানে ঐসব মাস্তান-সন্ত্রাসীর হামলায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। জনতার ধাওয়া খেয়ে ঐ মাস্তান-সন্ত্রাসীরা চলে যাবার সময় "খালেদা জিয়া এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে" শ্লোগান দেয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীর আর একটি দল মিছিল করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রের অফিসের সামনে উপস্থিত জনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর হামলা চালায়। ফলে, সেখানে ঐ মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সাথে জনতার সংঘর্ষ বাধে। জনতা ঐ মাস্তান-সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। অপরদিকে, ঐ মাস্তান-সন্ত্রাসীরা ব্যাপকভাবে গুলিবর্ষণ করে ও বোমা ফাটায়। সে ঘটনার সময় ঐ মাস্তান-সন্ত্রাসীদের ধাওয়া না করে পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। তার ফলে, পুলিশের সাথে জনতার সংঘর্ষ শুরু হয়। সেখানে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে।

৩১৯। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ আহূত সর্বাত্মক হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকায় বেলা ১২টার দিকে খিলগাঁও বাগিচা সড়কে হরতাল সমর্থনকারীরা একটি মিছিলসহ সে এলাকা প্রদক্ষিণ করছিলেন। সে সময় একটি পুলিশের লরি দ্রুতগতিতে ঐ মিছিলের ওপর উঠে গেলে মুহূর্তের মধ্যে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সে সময় ৭ বছরের বালক সবুজ প্রাণ ভয়ে দৌড়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় পুলিশের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সবুজের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খিলগাঁও এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর, পুলিশের সাথে জনতার কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘটিত হয়। বেলা ১২টার দিকে, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের একটি যৌথ মিছিল মৎস্য ভবনের সামনে দিয়ে যাবার সময় পুলিশ আচমকা ঐ মিছিলটির ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। পুলিশের লাঠির আঘাতে ঢাকা নগর আওয়ামী যুবলীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ফজলুল হক মারাত্মকভাবে আহত হন। সেখান থেকে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

৩২০। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ আহূত সবাত্মক হরতাল পালনকালে সকাল পৌনে ৮টায় রাজধানী ঢাকার গুলিস্তানের কলতাবাজার এলাকা থেকে হরতালবিরোধী কিছু সংখ্যক লোক কড়া পুলিশ পাহারায় ৩টি বাস ভর্তি লোক নিয়ে যাত্রাবাড়ি মোড়ে গেলে, হরতালের সমর্থক কর্মীরা তাদের ধাওয়া করে। গাড়ি ৩টি পোস্তগলার দিকে গেলে, সেখানেও তারা জনতার ধাওয়ার সম্মুখীন হয়। তারপর ঐ বাস তিনটি পুনরায় যাত্রাবাড়ী এলে আবারও জনতার ধাওয়ার সম্মুখীন হয়। অবশেষে, ঐ বাস তিনটিকে পুলিশ পাহারা দিয়ে কাঁচপুরের দিকে নিয়ে যায়। ঐ বাস তিনটির ভেতরে অনেক সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসী সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিলো।

৩২১। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ আহূত সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথাযথভাবে পালিত হয়। সে এলাকায় কোন যানবাহন চলেনি ও দোকানপাটও খোলেনি। তবে, সেখানের কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি অপ্রীতিকর ও সহিংস ঘটনা ঘটে। ঐ এলাকায় থেমে থেমে বিক্ষিপ্তভাবে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সকাল পৌনে ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের সামনে একটি বোমা বিস্ফোরণে হারুন-উর-রশীদ নামে একজন রিকশাচালক গুরুতর-ভাবে আহত হয়। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেলা ১১টার দিকে সবুজ নামে একজন স্কুল ছাত্রকে শিশুপার্কের সামনে পুলিশ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে সবুজের মাথা ফেটে রক্ত বের হয়। বেলা ১২টার দিকে শিশু পার্কের দিক থেকে দ্রুতগতিতে ৩টি মাইক্রোবাস শাহবাগের মোড়ে গিয়ে থামে। হরতাল পালনকারীরা ঐ মাইক্রোবাস ৩টির কাছে যাবার আগেই সেগুলোর সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসী আরোহীরা দু'রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে। তারপর, ঐ মাইক্রোবাস তিনটি দ্রুতগতিতে বাংলা মোটর্স অভিমুখে চলে যায়। ঐদিন ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও হরতাল পালিত হয়। যদিও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হরতাল অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস করবার নির্দেশ দেন, তা সত্ত্বেও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে আসেননি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বাস গ্যারেজ থেকে বের হয়নি। এমনকি, ঐদিন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস-পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি।

৩২২। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণার প্রতিবাদে আহূত সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতালের কমসূচী পালন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর একটি বিরাট মিছিল ১২টা ৩৫ মিনিটে শাহবাগ এলাকা হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব এবং পল্টন ঘুরে নূর হোসেন চত্বরের দিকে যাওয়ার সময় মুক্তাঙ্গনে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। সেখানেই অনুষ্ঠিত একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি খিজির হায়াত লিজু, সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ, ছাত্রনেতা ফারুক আহমদ প্রমুখ। ঐ সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরী বলেন, "মিডিয়া ক্যু ও ভোট ডাকাতির মাধ্যমে মিরপুরে (সংসদের ঢাকা-১১ আসনে) আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে আহূত হরতালকে বানচাল করার জন্য বিএনপি (সরকার) রাজপথে প্রকাশ্যে (মাস্তান)-সন্ত্রাসীদের নামিয়ে দিয়েছে। ঢাকার জনগণ ঐ (মাস্তান)-সন্ত্রাসীদের চিনে রেখেছে।" উপরোল্লিখিত ঐ ছাত্র-জনতার সমাবেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বক্তব্যে ইকবালুর রহিম বলেন, "জনগণের পয়সায়, আমার বাবার, আপন পিতার, কৃষক-শ্রমিকের পয়সায় বুলেট কেনা হয়। এ বুলেট আজ সরকারী (মাস্তান)-সন্ত্রাসীরা আমাদের ভাইদের বুকে নিক্ষেপ করছে। এ খুনী (বিএনপি) সরকারকে জনগণ আর রাজপথে নামতে দেবে না।"

৩২৩। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনকালে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাস্তান-সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি ও অন্যান্য সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সংসদ সদস্য আবদুর রাজ্জাক, দলের প্রচার সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু, কেন্দ্রীয় নেতা মির্জা সুলতান রাজা, আবদুল মান্নান, মুকুল বোস, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, মনির হোসেন খান, ঢাকা মহানগর শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, দলের আখতারুল আলম, এডভোকেট কামরুল ইসলাম, ফয়েজ উদ্দিন মিয়া, বেগম নসিবুন আহমেদ, কামাল চৌধুরী, আবদুস সালাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় ছিনতাই এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত হরতাল বানচালে বিএনপি সরকারের আচরণের নিন্দা করে আবদুর রাজ্জাক এমপি বলেন, "উপনির্বাচন ও হরতালকালে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ন্যক্কারজনক ভূমিকায় স্বৈরাচারী জিয়া-এরশাদের কথা মনে পড়ে। আমরা পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করেছিলাম, কিন্তু পরিবর্তন আসেনি। বিএনপি সরকার দু'বছরে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমরা এরশাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলতাম সেই একই কথা আজও বলতে হচ্ছে।" তারপর, তিনি নব্য স্বৈরাচার উৎখাত করে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "নব্য স্বৈরাচার রুখতে রাজপথে নামার প্রস্তুতি নিন।"

৩২৪। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় আওয়ামী লীগ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রচার সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, "(১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত পালিত) হরতালের দিন সরকারী দল (বিএনপি)-এর গেস্টাপো বাহিনীর তাণ্ডবলীলায় প্রমাণ হয়ে গেছে (যে), বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের নামাবলী পরে স্বৈরতন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরম পন্থা অবলম্বন করে গণতন্ত্রকে আজ হুমকির সম্মুখীন করেছে।" তারপর, 'জনগণ হরতাল প্রত্যাখ্যান করেছে', সে মর্মে জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "জনগণ যদি হরতাল প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তাহলে কেন বুধবার (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে) হরতাল বানচাল করতে সরকারী পেটোয়া বাহিনী রাস্তায় নামলো?" আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সহকারী প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান বলেন, "বিএনপি সরকার ২২ মাসের শাসন আমলে কোন ভালো কাজ করেনি।" ঐ সমাবেশে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মির্জা সুলতান রাজা বলেন, "বর্তমান (বিএনপি) সরকারের হাতে গণতন্ত্র ও জনগণ নিরাপদ নয়, আর কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই, আর একটি নব্বুইয়ের (১৯৯০-এর) গণঅভ্যুত্থানের জন্য সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের প্রস্তুত হতে হবে।" তারপর আওয়ামী লীগের নেতা মুকুল বোস বলেন, "আর প্রতিবাদ নয়, আবার আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলা চালানো হলে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে।" ঐ সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে ঢাকা মহানগর শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, "(১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত পালিত) হরতালের সময় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলা, গুলিবর্ষণ, যুবলীগ কর্মী জাহাঙ্গীরের হত্যাকারীদের গ্রেফতার, বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।" তারপর, ঐ সমাবেশে আখতারুল আলম বলেন, "বুধবার (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে) আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে (সশস্ত্র) হামলার ঘটনা সম্পর্কে মতিঝিল থানায় মামলা করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এজাহার নম্বর দেয়নি।" ঐ জনসভায় সভাপতির ভাষণে ঢাকা মহানগর শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ বলেন, "বুধবার (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে) হরতালের সময় বিএনপির আচরণ দেখে আমরা হতাশ হয়েছি, কিন্তু অবাক হইনি। পূর্তমন্ত্রী (ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া) বলেছিলেন (যে), জনগণ হরতাল প্রতিহত করবে। বুধবার একদল মুখোশপরা 'জনগণ' হরতাল প্রতিহত নয়, বানচাল করতে পথে নেমেছিলো। তারা হরতাল ঠেকাতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না। জিয়া-এরশাদ পারেনি, খালেদা সরকারও নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না।"

৩২৫। ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায়, "এক শ' পণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ঃ চাল, সিগারেট, পত্রিকা, বিমান অন্তর্ভুক্ত" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "অবাধ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর পদক্ষেপ হিসেবে ১শ' পণ্য সামগ্রী আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ১০ই ফেব্রুয়ারী আমদানি নীতি (সংশোধিত) আদেশ ১৯৯২-৯৩ জারি করেছে। এই আদেশ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) থেকে কার্যকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়েছে। যে ১ শ' পণ্য সামগ্রীর আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হেলিকপ্টার, বিমান, চা, চাল, বলপেন, টুথব্রাশ, সিগারেট, তামাক, চলচ্চিত্রের ছবি (উপমহাদেশের ভাষায় নির্মিত ছবি ব্যতীত), বাস ও ট্রাক, মোটর সাইকেল, দিয়াশলাই, ফেরি ও কার্গো জাহাজ, গাড়ী, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, ব্লেড, ছাতা, ক্যালেন্ডার, প্লাস্টিক স্যানিটারী ওয়্যার, সাবানের তেল ও পাউডার, কালো ছাপার কালি, স্যাকারিন, গ্যাস সিলিন্ডার, খবরের কাগজ ও সাময়িকী, মহিলাদের ব্লাউজ, পুরুষের সার্ট, বাচ্চাদের কাপড়, কার্পেট প্রভৃতি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানান যে, (উপরোল্লিখিত সংশোধিত আমদানি নীতি জারির ফলে) আমদানি নিষিদ্ধের তালিকায় এখন মাত্র ৯৩টি পণ্য সামগ্রী রয়েছে। আগামী ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে আরও কিছু পণ্যসামগ্রী আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে। আমদানি নিষিদ্ধের তালিকায় যে (অবশিষ্ট) ৯৩টি পণ্যসামগ্রী রাখা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ নিউজপ্রিন্ট, বিড়ি পাতা, লবণ, বৈদ্যুতিক সিলিং পাখা, আগ্নেয়াস্ত্র, লাইফ জ্যাকেট, পুরাতন কাপড় প্রভৃতি। এসবের মধ্যে লবণ ও পুরাতন কাপড় নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে আমদানির অনুমতি দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

৩২৬। ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় "খাল কাটা ব্যর্থ, সবার সাহায্য কামনা ঃ এমপিদের কাছে প্রধান মন্ত্রীর চিঠি" শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবশেষে নিজেই তাঁর সরকারের খাল খনন কর্মসূচীর ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এ কর্মসূচী সফল করার জন্য (সংসদে) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ সকল এমপির সাহায্য কামনা করেছেন। গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সকল এমপির কাছে ব্যক্তিগতভাবে লেখা এক চিঠিতে তিনি (প্রধান মন্ত্রী) একথা বলেন। ঐ চিঠি প্রেরণে তিনি জাতীয় পার্টির এমপিদেরকেও বাদ দেননি। প্রধান মন্ত্রীর প্যাডে তাঁর সই করা ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া ১২ বছর আগে প্রধানত স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে 'ঐতিহাসিক' খাল খনন কর্মসূচী শুরু করেন। তখন খাল খনন প্রকল্পের কাজ শতকরা ৭৫ ভাগ স্বেচ্ছাশ্রমে এবং বাকিটা 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য বরাদ্দের' মাধ্যমে করা হতো। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ঐ স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে তা সফল করেছিলেন।" বর্তমান বিএনপি সরকারের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী লিখেছেন, "বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে, স্বেচ্ছাশ্রমের অংশ কমিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরে এই কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।" জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে ব্যাপক প্রচার, গণসংযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ঐ চিঠিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমপিদের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী লিখেছেন, "আপনারা জনগণের অতি প্রিয় এবং কাছের লোক। আপনাদের ব্যাপক গণসংযোগ, সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রমে জনতা স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত হয়।" জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা ছাড়া খাল খনন কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়, এ কথাটিকে ঘুরিয়ে ঐ চিঠির আর এক জায়গায় লিখেছেন, "জনপ্রতিনিধিদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এহেন মহৎ প্রয়াস বাস্তবায়ন করা সম্ভব।" (পরিশেষে) প্রধান মন্ত্রী তাঁর ঐ চিঠিতে আশা প্রকাশ করে এমপিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "খাল খনন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক জনজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে আপনার এলাকায় এ কর্মসূচী সফল হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে (মেনিফেস্টোতে) দেশে খাল খনন প্রকল্পসমূহ চালু ও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো। উক্ত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের 'খাল খননের কর্মসূচী' প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের সরাসরি অধীনে এনে তার দেখাশুনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন।

৩২৭। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় "মিরপুর চিড়িয়াখানা এখন সন্ত্রাসীদের লীলাক্ষেত্র ঃ তরুণী যুবতীদের নিয়ে টানা হেঁচড়া" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "রাজধানীর বিনোদন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম ঢাকা চিড়িয়াখানা বর্তমানে সন্ত্রাসীদের অবাধ লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। (রাজধানী ঢাকার) মিরপুরে অবস্থিত এই চিড়িয়াখানায় নির্মল আনন্দ ও বিনোদন খুঁজতে এসে দর্শনার্থীরা প্রায় প্রতিদিনই সন্ত্রাসীদের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন। অনেককে সর্বস্ব খুইয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। এই সন্ত্রাসীদের হাতে সমস্ত চিড়িয়াখানা প্রশাসন জিম্মি হয়ে পড়েছে। এদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। চিড়িয়াখানায় মদ, গাঁজা, হেরোইন সেবন চলে প্রকাশ্যে। সন্ধ্যার পর চলে অসামাজিক কার্যকলাপ। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী চিড়িয়াখানায় গিয়ে কিছুটা সময় কাটায়। ছুটির দিনগুলোতে দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে অনেক বেশী। সারা সপ্তায় কাজ করে ছুটির একটি দিন স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেকেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। এমনিভাবে গতকাল (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখ) শুক্রবার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসা হতে বের হয়ে চিড়িয়াখানায় উপস্থিত হয়েছিলেন সিলভেস্টার হালদার তাঁর স্ত্রী রেবেকা, মেয়ে ঝর্ণা ও ছেলে তুষারকে নিয়ে। চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ফিরে দেখে বেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়ে ৩টায় তাঁরা সাপের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এ সময় ৩/৪ জন যুবক সিলভেস্টার হালদার পরিবারের সামনে গিয়ে তাঁর স্ত্রী রেবেকাকে উত্যক্ত করতে থাকলে তিনি প্রতিবাদ জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। তারা লাঠি, লোহার রড ও ধারালো ছুরি দিয়ে সিলভেস্টারকে আঘাত করলে তিনি মারাত্মক আহত হন। সন্ত্রাসীরা সিলভেস্টার হালদারের কাছ থেকে নগদ ২২ শ' টাকা ও একটি হাতঘড়ি নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই সিলভেস্টার হালদার আহত অবস্থায় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন এবং মিরপুর থানায় একটি জিডি করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে শুধু সন্ত্রাসী হামলা বা ছিনতাই নয়, গৃহবধূ বা যুবতী, কিশোরীদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করাও সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এটি হচ্ছে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের খোদ ঢাকা মহানগরীতে আইন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার একটি দৃষ্টান্তমাত্র। এ ধরনের বহু ঘটনা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহর বন্দরেও ঘটে এবং সেগুলো যে অজানা ও অপ্রকাশিত রয়ে যায় শুধু তাই নয়, সেসব অপরাধ প্রতিকার-প্রতিরোধে এবং অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয় খুব কম ক্ষেত্রেই।

৩২৮। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত ফলাফল নির্বাচন কমিশন ঐ উপনির্বাচনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঘোষিত আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট সংসদ সদস্য খ. ম. জাহাঙ্গীরের পেশকৃত এক আবেদনের শুনানী শেষে বাতিল করে ঐ উপনির্বাচনের ভোট আইনানুগভাবে পুনঃগণনার আদেশ জারি করেন। ঐ আদেশে যৌথভাবে স্বাক্ষর করেন নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন হোসেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। নির্বাচন কমিশনের ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় ঃ (আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট খ. ম. জাহাঙ্গীরের) আবেদনটি বিবেচনাকালে আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ এবং উপনির্বাচন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা শেষে নির্বাচন কমিশন তার আদেশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের মতামত ব্যতিরেকে সরকারী গণমাধ্যমে যথা রেডিও এবং টেলিভিশনে ইতিপূর্বে কখনও প্রচারিত হয়নি। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচন কমিশনের অথবা রিটার্নিং অফিসারের মতামত ছাড়াই রেডিও-টেলিভিশন বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেয় এবং প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বলে দেয়, যদিও তখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন অথবা রিটার্নিং অফিসার মোট প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ণয় করতে পারেননি। এতে স্পষ্টতই একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এতে, জনসাধারণ, বিশেষ করে, সংশ্লিষ্ট ভোটারদের মাঝে সঠিক নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে নানাবিধ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে ও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।"

৩২৯। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে রিটার্নিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফল বাতিল আদেশে আরও বলা হয় ঃ "জনাব সাদেক আলী খান, উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা মিরপুরস্থ কন্ট্রোল রুমে প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছ থেকে নির্বাচনী ফলাফলের কপি ও মালামাল বুঝে নেন। তাঁর জিজ্ঞাসা মতে, প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসার বলেন যে, তাঁরা ভোট গণনার মূল হিসাব প্রথমে কাগজের নির্দিষ্ট প্যাকেটে রেখে সীল করেছেন এবং তা অন্যান্য মালামালসহ চটের ব্যাগে ভর্তি করে ঐ ব্যাগটি গালাযুক্ত সীলমোহর করে দিয়েছেন। কাজেই দেখা যায় যে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক তৈরী কেন্দ্রে ভোট গণনার মূল হিসাব নির্বাচন কমিশন থেকে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট কাগজের খামে সীলমোহরকৃত অবস্থায় উপরোক্ত চটের থলিতে রয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ভোট একত্রীকরণের সময় সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মুখে ভোট গণনার ঐ মূল হিসেব বের করে তার ভিত্তিতেই কেন্দ্র ও প্রার্থীভিত্তিক ভোট একত্রীকরণ হিসেব তৈরী করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি মূলতঃ তা করেননি। বরং, পূর্বরাতে যেসব হিসেব প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল নির্ণয়ের জন্য পেয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই ভোট একত্রীকরণ কাজটি করেছেন। এ ছাড়াও, রিটার্নিং অফিসার ও উপনির্বাচন কমিশনার জনাব সাদেক আলী খানের মৌখিক বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্র থেকে প্রেরিত চটের বস্তা থেকে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা থেকে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারের প্যাকেটগুলো বের করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি, যা আইনের দিক থেকে অবশ্যই করণীয় ছিল।"

৩৩০। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে রিটার্নিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফল বাতিল আদেশে আরও বলা হয় ঃ "উপনির্বাচন কমিশনার ঢাকা-এর বক্তব্য থেকে দেখা যায় (যে), প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফলের কিছু বিবরণী সীল করা এনভেলাপে, কিছু বিবরণী সীলবিহীন এনভেলাপে এবং কিছু বিবরণী এনভেলাপবিহীন খোলা অবস্থায় তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। এরূপ প্রাথমিক গণনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে রিটার্নিং অফিসার ১১৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল একত্রীকৃত করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চটের ব্যাগে সংরক্ষিত সীলমোহর করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার মূল বিবরণীর সংগে প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফলের জন্য প্রাপ্ত ভোট গণনার বিবরণী আদৌ যাচাই করা হয়নি। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, প্রাসঙ্গিক সর্বদিক ও বিষয়াদি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সেখানে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ ওঠেনি, কেবল ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে এক ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। তা এই মুহূর্তে দূরীভূত করতে না পারলে জাতীয় জীবনে গণতন্ত্রের সূচিত ধারা ভীষণভাবে ব্যাহত হতে পারে। নির্বাচনী সকল মালামাল যেখানে আইনানুগ-ভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় সংরক্ষিত করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আইনানুগভাবে সংশিষ্ট সর্বসমক্ষে ভোট পুনঃগণনার মাধ্যমে নির্বাচনের সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করে সকল প্রকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান করা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

৩৩১। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে রিটার্নিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফল বাতিল আদেশের মূল কার্যকরী অংশে বলা হয়ঃ "সুতরাং সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২)-এর ৩৭(৫)(বি) ও ৯১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় সংসদ ১৯০ (ঢাকা-১১, মিরপুর) নির্বাচনী এলাকায় ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফলসম্বলিত ৪-২-৯৩ তারিখে উক্ত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২)-এর ৩৭ অনুচ্ছেদবলে প্রস্তুতকৃত এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতাবলে ঘোষিত ফলাফল ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ আইনানুগসম্পন্ন না হওয়ায় বাতিল করা হলো এবং উক্ত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার জনাব বদিউর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা)-কে উক্ত উপনির্বাচনের সংরক্ষিত সকল ভোট আইনানুগভাবে সংশ্লিষ্ট সর্বসমক্ষে পুনঃগণনা করে চূড়ান্ত সঠিক ফলাফল আইনানুগভাবে পুনঃতৈরী করে সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। উক্ত রিটার্নিং অফিসার আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১০টা থেকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষে নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে আইনানুগভাবে ঐ ভোট পুনঃগণনার যাবতীয় কাজ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব অত্র আদেশ যথাসময়ে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই আদেশের অবিকল অনুলিপি নির্বাচনের সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নিকট এবং জ্ঞাতার্থে সংশ্লিষ্ট সচিবালয়ের সচিবদের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।"

৩৩২। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ বিকেল ৩টায় রাজধানী ঢাকার মিরপুর থানা আওয়ামী লীগ, সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ঘোষণা এবং তার পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী ও নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ পরিচালনার প্রতিবাদে মিরপুর স্টেডিয়াম চত্বরে এক জনসভার আয়োজন করে। ঐ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি মকবুল হোসেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। ঐ জনসভায় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ এমপি, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমান, বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি, খ. ম. জাহাংগীর এমপি, আবদুল মান্নান, কামাল আহমেদ মজুমদার, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন প্রমুখও বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে বেগম সাজেদা চৌধুরী এমপি, মমতাজ হোসেন, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ ও সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে মিরপুরবাসীর নির্বাচনী রায়কে ছিনতাই করার প্রতিবাদে জনগণ দু'দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফল হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন।" তারপর ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে রিটার্নিং অফিসারের ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল বাতিল এবং ভোট পুনঃগণনার নির্দেশকে ভোটের অধিকার ও নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বিএনপি সরকারের ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে জনগণের হরতাল ও আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় হিসেবে অভিহিত করে শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপি সরকার আজ হরতাল ভাংগার রাজনীতি শুরু করেছে। তারা দমননীতি চালিয়ে (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে চাচ্ছে। পেশীশক্তি দিয়ে কখনোই জনগণের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখা যায়নি এবং ভবিষ্যতেও যাবে না।"

৩৩৩। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকার মিরপুর থানা আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ঘোষণা এবং তার পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী ও নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ সংগঠনের প্রতিবাদে মিরপুর স্টেডিয়াম চত্বরে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর ভাষণে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ রাতে নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে বেতার-টেলিভিশনে নির্বাচনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলাফল প্রচার, মিরপুরে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ও হয়রানি, ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে পালিত অর্ধদিবস হরতাল শেষে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে পুলিশের হামলা ও সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিমসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে প্রহার এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী বানচালের হীন উদ্দেশ্যে বিএনপি মাস্তান-সন্ত্রাসীদের মাইক্রোবাসে করে সশস্ত্র মহড়া, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গুলি বর্ষণ, সন্ত্রাস সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দেশকে ক্রমাগত এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।" তারপর, দেশ পরিচালনায় বিএনপি সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও নীতিহীনতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপি সরকারের হাতে জনগণের জানমাল শুধু নয়, গণতন্ত্রও আজ নিরাপদ নয়। ক্ষমতাসীনদের ভ্রান্ত নীতির কারণে দেশ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে।" তারপর, যে কোন মূল্যে গণতন্ত্রকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। কিন্তু জনগণ শিশু গণতন্ত্রকে লালন-পালনের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিল বিএনপির হাতে, সুষ্ঠু পরিচর্যার অভাবে সেই শিশু গণতন্ত্র আজ বিকলাংগ হয়ে পড়েছে। যারা গণতন্ত্রের আচার-আচরণ বোঝে না, গণতন্ত্র জানে না, তাদের হাতে থাকলে শিশু গণতন্ত্রের শ্বাসরুদ্ধকর অপমৃত্যু ঘটতে পারে।" তারপর, যে কোন মূল্যে গণতন্ত্র রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নব্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। আওয়ামী লীগের হাতকে শক্তিশালী করুন।"

৩৩৪। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঢাকার মিরপুর থানা আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির মাধ্যমে নিজেদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী ও নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ সংঘটনের প্রতিবাদে মিরপুর স্টেডিয়াম চত্বরে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির মাস্তান-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "বিএনপি সরকার মাস্তান-সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করছে। বাংলার মানুষ সন্ত্রাস চায় না, শান্তি চায়। অবিলম্বে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপির গুণ্ডা বাহিনীর হামলা বন্ধ করতে হবে।" তারপর, দলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "জনগণ আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সহ্য করবে না। মিথ্যা মামলা দিয়ে বিরোধী দলকে হয়রানি বরদাশত করা হবে না। জনতা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছে, নব্য স্বৈরাচারের পতনও ঘটাবে। ইনশাল্লাহ, জনতার বিজয় হবেই। আর কাউকে স্বৈরশাসকদের মতো বাংলার মানুষের ভোট নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।" তারপর, তাঁর ভাষণের শেষের দিকে 'নৌকা' প্রতীকে সীলমারা একটি ব্যালট পেপার দেখিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আপনারা এই ব্যালটে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন, এই ব্যালট আজ মিরপুরের রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কিভাবে পাওয়া যায়? এই ব্যালট তো নির্বাচন কমিশনে থাকার কথা। জানি না, এভাবে কত হাজার 'নৌকায়' সীল দেয়া ব্যালট নষ্ট করা হয়েছে!" পরিশেষে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "দেশবাসী আগামীতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তনের সুষ্ঠু প্রক্রিয়াকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। ব্যালট পেপার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে নির্বাচনী বিধি-বিধান অনুযায়ী ১৮টি ভোটকেন্দ্রে দলের প্রার্থীর মনোনীত পোলিং এজেন্টদেরকে ফলাফলের সত্যায়িত কপি না দেয়ার কারণে ঐসব ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে দাবিনামা পেশ করেছিলো, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা উপরোল্লিখিত জনসভায় তাঁর ভাষণে সে ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য বা কোন কিছু উল্লেখ করেননি।

৩৩৫। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সংসদের ১৯০ (ঢাকা-১১, মিরপুর) আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ ও নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সৈয়দ মিছবাউদ্দিন হোসেন সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনের উপস্থিতিতে ঐ ভোট পুনঃগণনার কাজ শুরু হয়। ভোট পুনঃগণনার কাজ পরিচালনা করেন উক্ত উপনির্বাচনের জন্য নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার বদিউর রহমান। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের সচিব এ. জেড. এম. শামসুল আলম, যুগ্ম-সচিব স. ম. জাকারিয়া ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ঢাকা জেলা প্রশাসক আবু সোলায়মান চৌধুরী ভোট পুনঃগণনার কাজে সহযোগিতা করেন।

৩৩৬। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনাকালে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা ও এমপিদের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সভাকক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত ছিলেন তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ রহমত আলী, দলের প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট খ. ম. জাহাঙ্গীর, বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ হারুনুর রশিদ, মীর্জা আজম, আবদুল আউয়াল মিয়া, এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু, শাহজাহান খান, মোহাম্মদ শামছুল হক, আ. স. ম. ফিরোজ, আবুল হাসান চৌধুরী, মিসবাউদ্দিন খান, খান টিপু সুলতান, ডঃ মিযানুল হক, এডভোকেট ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভু, ইমরান আহমদ, আনোয়ারুল ইসলাম, শুধাংশু শেখর হালদার ও দলের মনোনীত প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদার। বিএনপির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র মীর্জা আব্বাস, লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, আমানউল্লাহ আমান, ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান, জয়নাল আবেদীন ফারুক, বিচারপতি টি এইচ খান, এডভোকেট জুলমত আলী খান, ফজলুল হক, জিয়াউল হক, নূরুল ইসলাম মনি, মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম, মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন, আতাউর রহমান, মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, এ. টি. এম. আলমগীর, দলের মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন ও তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট সালাউদ্দিন আহমদ। তাছাড়াও, জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী বেলাল আহমেদ এবং ২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোট পুনঃগণনাকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

৩৩৭। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনের উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ পূর্ব ঘোষিত সময় অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সভাকক্ষে আসেন সকাল ১০টায়। রিটার্নিং অফিসার ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার বদিউর রহমানের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, "জাতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যাঁরা জাতিকে পরিচালনা করেন, যাঁরা হাল ধরেন, তাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। মিরপুর উপনির্বাচন নিয়ে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসানের লক্ষ্যে আমরা এই আয়োজন করেছি। সুশৃংখল পরিবেশের মধ্যে আমরা এটি করতে চাই। ভোট গণনা সম্পর্কে যে কোন অভিযোগ তাৎক্ষণিক মুহূর্তে লিখিতভাবে জানালে সাথে সাথে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তসহ অভিযোগের ফটোকপি ফেরত দেয়া হবে। ভবিষ্যতে এটা আপনাদের কাজে লাগতে পারে।" তারপর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ সুশৃংখল পরিবেশে সুন্দরভাবে ভোট পুনঃগণনা কাজ সম্পাদনের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে তওফিক কামনা করে বলেন, "আমি আজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার, (হয়তো বা) কাল থাকবো না। কিন্তু এই জাতিকে পরিচালনায় আপনাদের থাকতেই হবে। তাই আপনাদের প্রজ্ঞা ও মেধা এবং পরামর্শ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগিতা দিয়ে ভোট পুনঃগণনা সম্পাদনে সবাই সহযেগিতা করবেন বলে আমি আশা করবো।"

৩৩৮। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সভাকক্ষে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা উপলক্ষে প্রদত্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উদ্বোধনী বক্তব্যের পর আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমদ বলেন, "আমরা ভোট পুনঃগণনার কিছু পদ্ধতিগত ও আইনগত বিষয়ে কথা বলতে চাই।" তাঁর জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "আমি বলে দিয়েছি (যে), আপনারা লিখিতভাবে দিন। তাছাড়া আমি আপনাদের এজন্য আগেই সময় দিয়েছি।" ঠিক ঐ পর্যায়ে বিএনপির পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "এ ব্যাপারে আপনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সর্বতো ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষণে আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই না। তবে, আমাদেরও কিছু কথা আছে।" তাঁর জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "আমি যে আদেশটা দিয়েছি, তা সবাইকেই দেয়া হয়েছে। আজ, বিশেষ করে, দুই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে দু'জন থাকেন বলার জন্য।"

৩৩৯। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় সভাকক্ষে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা শুরুর আগে এক ঘন্টারও অধিক সময় সেখানে উপস্থিত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ঐ সময়ের এক পর্যায়ে বিএনপি সরকারের তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ঐ উপনির্বাচনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে ঘোষিত ফলাফল ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন বাতিল ঘোষণা করার পর আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট খ. ম. জাহাঙ্গীরের দেয়া দৈনিক ইত্তেফাকের সাথে সাক্ষাৎকারের বক্তব্য, 'সত্যিকারের অর্থে (ব্যালট বাক্স) নির্বাচন কমিশনের কাস্টডিতে (জিম্মায় ও হেফাজতে) থাকলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করবে' উল্লেখ করে বলেন, "খ. ম. জাহাঙ্গীর নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।" তথ্যমন্ত্রীর ঐ মন্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ এমপি বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। উপরন্তু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। অথচ, বিএনপি প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট সালাউদ্দিন আহমদ গতকাল (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩) নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কারণ, তিনি সংবাদপত্রের কাছে বলেছেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এভাবে ফলাফল বাতিল করতে পারেন না।" তারপর, বিএনপি সরকারের পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ফলাফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতিল ও (ভোট) পুনঃগণনা সম্পর্কিত রায়ে বলা হয়েছে যে, ব্যালট পেপার ও অন্যান্য দলিলাদি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবুও এ ক্ষেত্রে সন্দেহ ও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।" বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐসব বাদানুবাদের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার উভয় পক্ষের নির্বাচনী এজেন্টের সংবাদপত্রে দেয়া বিবৃতিকে নিয়ে দু'পক্ষের বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বলেন, "আইনগত দিকটি হচ্ছে (যে), রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনেরই অংশ। আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও যোগে ভুল করে থাকি। যোগের জন্য একটি ভুল রেজাল্ট দিয়েছি—এজন্য আমরা দুঃখিত ও অনুতপ্ত।"

৩৪০। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষে সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা শুরুর আগে সেখানে উপস্থিত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলাকালে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে উপনির্বাচন এলাকার সর্বমোট ১১৭টি ভোটকেন্দ্রের বস্তায় ভর্তি ব্যালট পেপারের বাক্সগুলো, মুড়িসহ ব্যালট বই, রেজাল্ট শীটসমূহ ৭টি গ্রুপের ৭টি টেবিলে আনা শুরু হয়। ঠিক ঐ সময় আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ এমপি বলেন, "(ভোট পুনঃগণনা শুরু করার) প্রারম্ভে আমাদের জানা ভালো, কত ব্যালট বই, ব্যালট পেপার ইস্যু করা হয়েছিল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।" তার জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ বলেন, "একটি প্রশ্ন এসেছে। এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই (যে), যেহেতু ব্যাপারটি স্পর্শকাতর, সেহেতু সেগুলো আমার কাস্টডিতে রেখে দিয়েছি। নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের রেজাল্ট শীট—যেগুলো পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এবং আমার নির্বাচন কর্মকর্তার মারফত পেয়েছি—সেগুলো আমার কাছে আছে।" তারপর সীলমোহরকৃত সেসব খামের প্যাকেট উপস্থিত সবার সমক্ষে প্রদর্শন করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "এগুলো আমি খুলিনি। আমার কাছে আছে—প্রয়োজনে খুলবো।" তারপর প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান যে, ঐ উপনির্বাচনের জন্য ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯ শত ৭৪টি ব্যালট পেপার ইস্যু করা হয়েছিল। তারপর সেখানে উপস্থিত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে সকাল ১১টা ২০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনার কাজ শুরু হয়। সর্বমোট ১৮ জন প্রার্থীর নামসম্বলিত ব্যালট পেপারগুলো থেকে সর্বপ্রথম বিএনপি ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট গোণার আগে অন্য ১৬ জন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট গোণার নীতি অনুসৃত হয়। রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে একটানা সকল বৈধ ব্যালট গণনা চলাকালে বিভিন্ন বুথ (ভোট গণনার টেবিল) থেকে সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক আপত্তি অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে আনা হলে, সেগুলো নিষ্পত্তি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। বৈধ সকল ব্যালট গোণার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল ঘোষিত ব্যালট গণনার কাজ শুরু হয় রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে।

৩৪১। ইত্যবসরে, ঐদিনই উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা শুরুর প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারের পক্ষে তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট খ. ম. জাহাঙ্গীর এমপি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে এক আবেদন পেশ করে ঐ আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি করেন। দীর্ঘ এগারো পৃষ্ঠার ঐ আবেদনের এক পর্যায়ে বলা হয়ঃ "যদিও মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখের) রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যালট পেপারসমূহ অক্ষত ও যথোপযুক্তভাবে রাখা আছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে বাস্তবতা হচ্ছে স্থানীয় জনগণ গতকালও ঐ (নির্বাচনী) এলাকায় একটি ভস্মস্তূপ থেকে কিছু ব্যালট পেপার উদ্ধার করতে পেরেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষের ব্যালট পেপার বাক্স থেকে বের করে নেয়া হয়েছিল। এ কথাও জানা গেছে যে, রিটার্নিং অফিসারের সম্মতিতে প্রিজাইডিং অফিসারের সহায়তায় বিএনপি প্রার্থীর অনুকূলে সীল মেরে ব্যালট বাক্সে ফেলা হয়েছে।" মিরপুর ১০ নম্বর গোল চক্করে স্থাপিত রিটার্নিং অফিসারের কন্ট্রোল রুম সম্পর্কে উপরোক্ত আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয় ঃ "এই কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছিল এই এলাকায় নির্বাচনকালীন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি মনিটরিং করা, নির্বাচন আইন ও বিধি লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী স্থাপনের কাজে। এই কন্ট্রোল রুমকে তাই পুলিশ কন্ট্রোল রুম বলা যায়। এই কন্ট্রোল রুম প্রকৃত নির্বাচন পরিচালনার কাজে ব্যবহারের কথা ছিল না। এই কন্ট্রোল রুম রিটার্নিং অফিসার বা তাঁর সহকারীর দফতরও ছিল না। প্রিজাইডিং অফিসারদের নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রের ফলাফলসম্বলিত কাগজপত্র ও নির্বাচন কাজে ব্যবহৃত উপকরণাদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পাঠানোর কথা ছিল না। রিটার্নিং অফিসারের স্থায়ী অফিসে এগুলো পাঠানোর বিধান ছিল। এই মর্মে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশও ছিল।" সেদিন রাত ৯টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ এবং নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সৈয়দ মিছবাহউদ্দিন হোসেনের যুক্ত স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্তে খ. ম. জাহাঙ্গীর এমপি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি নাকচ করে দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বলা হয় ঃ "আরপিও ১৯৭২-এর বিধি মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার সীল-গালাযুক্ত নির্বাচনী সামগ্রীসমূহ সীল-গালা করা বস্তায় ঢাকা ট্রেজারীর 'ডাবল লক'-এ রেখেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের সচিব ঢাকা ট্রেজারী পরিদর্শন করেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন যে, এসব উপকরণ যথাযথ হেফাজতে আছে এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব এই আবেদনের নিষ্পত্তি করা হলো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪২। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখ পূর্বাহ্ন পৌনে ১২টার সময় সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনা, পুনঃপরীক্ষা, একত্রীকরণ, টেবুলেশন, ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিরতিহীনভাবে প্রায় ২৫ ঘন্টা সেসব কাজে অতিবাহিত হয়। তারপর, সংসদের ১৯০ নম্বর (ঢাকা-১১, মিরপুর) আসনে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার বদিউর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ, নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ মিছবাহউদ্দিন হোসেন, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিবর্গ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রধান প্রার্থীদ্বয় ও তাঁদের নির্বাচনী এজেন্টদের উপস্থিতিতে ঐ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন। ঐ ফলাফল ঘোষণায় বলা হয় ঃ "বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন ৮০ হাজার ২ শত ৭৬ ভোট পেয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদারকে পরাজিত করেছেন। কামাল আহমদ মজুমদার পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৬ শত ৫১ ভোট। তাঁদের দু'জনের মধ্যে ভোটের ব্যবধান হচ্ছে মোট ২ হাজার ৬ শত ২৫টি। ৭ হাজার ১ শত ৪৯ ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টি প্রার্থী তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন।" রিটার্নিং অফিসার উপরোক্ত উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অপর ১৫ জন প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির ফলাফলও পাঠ করে শোনান। উল্লেখ্য যে, পুনঃগণনায় বিজয়ী প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীনের ভোটের সংখ্যা ৩৩টি বৃদ্ধি পায়। জানা যায় যে, পুনঃগণনার সময় ৬ শত ৯০টি ভোট বাতিল করা হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখের ঘোষণায় ১ হাজার ৬ শত ২৬টি ভোট বাতিলের কথা বলা হয়েছিল। আরও জানা যায় যে, ঐ উপনির্বাচনে মোট ১ লাখ ৬৬ হাজার ৫ শত ৭৮টি ভোট কাস্ট হয় অর্থাৎ শতকরা ৬১ দশমিক ০৬ ভাগ ভোটার ঐ উপনির্বাচনে ভোট প্রদান করেন।

৩৪৩। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সংসদের ১৯০ নম্বর (ঢাকা-১১, মিরপুর) আসনে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনার ফলাফল ঘোষণার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। "মিরপুর উপনির্বাচনের ভোট পুনঃগণনায় গেলেন কেন?" সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি রউফ বলেন, "কারণ এই ফলাফল নিয়ে একটি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের তাড়াহুড়োর জন্য, কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির জন্য সবকিছু ঠিকঠাক মতো এবং আইন অনুযায়ী করা সম্ভব হয়ে উঠেনি বলে পুনঃগণনা করা হলো। বাতিল ভোট পুনরায় পরীক্ষা করে গুণে দেখা হয়েছে। অনেক ভোট ঠিকমতো বাতিল হয়নি, সেগুলো পুনঃনিরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অনুকূলে যোগ করা হয়েছে।" "পুনঃগণনার পর মিরপুর উপনির্বাচন সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটেছে কি?" সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "কোন কিছুরই শেষ নেই।" "নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠন করা হবে কি-না?" সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি রউফ বলেন, "কেউ চান বা না চান, তবুও নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়ে থাকে। এবারেও ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। আইনের পথ খোলা আছে।" উল্লেখ্য, ঐ দিনই নির্বাচন কমিশন এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জাতীয় সংসদের ১৯০ নম্বর (ঢাকা-১১, মিরপুর)-এর শূন্য আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসীন নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৩৯(৪) ধারা অনুযায়ী ঐ ঘোষণা দেয়া হয়।

৩৪৪। ১৭ই মার্চ (১৯৯৩) তারিখে সারা দেশে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং বাড়িতে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও সন্ধ্যায় ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে দলের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমান ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং ১৪০০ (বাংলা) সাল উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে কবি সৈয়দ শামসুল হক, বেলাল চৌধুরী ও রবিউল হুসাইন। রাজধানী ঢাকায় এই দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। মূল কর্মসূচী কেন্দ্রীভূত ছিলো বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ঢাকার ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) সড়কস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবন'কে ঘিরে। সকাল থেকেই সেখানে সংরক্ষিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ও আদর্শের অনুসারী হাজার হাজার নরনারী। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দলের সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন সকাল ৯টায়। তাছাড়াও, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু কবিতা আবৃত্তি ও সংস্কৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শাখা, জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগরী শাখা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, বাংলার মুখ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, সংগ্রামী শহীদ স্মৃতি পরিষদ, কেন্দ্রীয় খেরাঘর আসর, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ, সংবাদপত্র পাঠক ফোরাম, বঙ্গবন্ধু সমাজ কল্যাণ পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বঙ্গবন্ধু পাঠাগার নারায়ণগঞ্জ, প্রকৌশলী মঞ্চ, সোনার বাংলা যুব পরিষদ, ১৯৯০-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণঅভ্যুত্থান চেতনা বাস্তবায়ন পরিষদ, জামাত শিবির প্রতিরোধ কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ ইত্যাদি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ। সকালে বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু ভবন' প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং পরে 'বঙ্গবন্ধু ভবনে'র সামনের সড়কে শিশু-কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বিকেল ৫ ঘটিকায়। মিলাদ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। কিন্তু জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় এই যে, আওয়ামী লীগসহ দেশের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিক্ষক, পেশাজীবী, যুব-ছাত্র সংগঠনের আহ্বান-আবেদন সত্ত্বেও, অতীতের জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারের মতো জনগণের সার্বজনীন ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় রেডিও-টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোকে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি দেয়নি।

৩৪৫। ১৭ই মার্চ (১৯৯৩) তারিখ বিকেল ৩ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র রমজান মাসের পড়ন্ত বিকেলে ঐ আলোচনা সভা ক্রমান্বয়ে জনসভার রূপ লাভ করে। ঐ সভায় প্রদত্ত ভাষণের শুরুতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বঙ্গবন্ধুর নামও থাকবে। বিগত ১৭ বছর অনেক অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কেউ বাঙালির মনের মুকুর থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে পারেনি। আগামীতে জাতিকে যতোই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, বাংলাদেশের বুক থেকে জাতির জনকের নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "আজকের ক্ষমতাসীনরা স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলে ইতিহাস বিকৃত করে জাতিকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী করে দেশ শাসন করতে চাচ্ছে। কোন্ বিদেশী প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য শাসকগোষ্ঠীর এই তৎপরতা ?" তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে ক্ষমতাসীন (বিএনপি) দলের অত্যাচার-নির্যাতন, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "(বিএনপি) সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কাউকে জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "দেশবাসী আশা করেছিলো (যে), স্বৈরাচারের পতন ঘটলে দেশে গণতন্ত্র আসবে। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। কিন্তু স্বৈরাচারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতন হলেও স্বৈরতন্ত্র রয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন (বিএনপি) সরকার স্বৈরতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে। ক্ষমতাসীনদের আচার-আচরণে জনগণের আশা-আকাংক্ষা আজ ধূলিস্যাৎ হতে চলেছে। শাসকগোষ্ঠীর ভ্রান্ত ও অপরিকল্পিত নীতির ফলে জনগণের মাঝে চরম হতাশা বিরাজ করছে।"

৩৪৬। ১৭ই মার্চ (১৯৯৩) তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভানেত্রীর ভাষণে দলের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের (তৎকালীন) জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত একটি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "বিগত দু'বছরে দ্রব্যমূল্য ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও (বিএনপি) সরকার বলছে (যে), 'মানুষের কোন অভাব নেই। গরীব মানুষ দু'বেলা পেট পুরে ভাত খাচ্ছে। একবেলা কাজ করলে তিন দিন খেতে পাচ্ছে'।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "(বিএনপি) সরকার উন্নয়নের কথা বলছে। সরকারের সেই উন্নয়ন হচ্ছে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ আর সন্ত্রাসের উন্নয়ন। অনেক মন্ত্রী আর তাঁদের আত্মীয়স্বজন দুর্নীতি করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করেছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের কোন উন্নতি হয়নি। বর্তমান (বিএনপি) সরকার কোন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা দিতে না পারায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চরম হতাশা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে। পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।" তাঁর ভাষণের শেষাংশে শেখ হাসিনা (বিএনপি) সরকারের অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেন, "ভ্রান্ত ও অপরিকল্পিত নীতির ফলে সময় মতো প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্য কমে যাচ্ছে। জাতিকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিদেশে দাতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। কিন্তু (বিএনপি) সরকারের দুর্নীতির কারণে দাতারাও আজ নাখোশ হয়ে উঠেছেন।"

৩৪৭। ১৭ই মে (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় "৫০০ কোটি টাকার সিমেন্ট কারখানা মাত্র ৩৮ কোটি টাকায় বিক্রী" শিরোনামে এক সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয়, "দেশের সর্ববৃহৎ সিমেন্ট কারখানা, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের 'চট্টগ্রাম সিমেন্ট ক্লিংকার গ্রাইন্ডিং কোম্পানীটি' সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিচ্ছে। (বন্দরনগরী চট্টগ্রামের) কর্ণফুলী নদীর তীরে ১৯.৪৩ একর জায়গায় এ কারখানাটি অবস্থিত। কারখানাটির একটি নিজস্ব জেটি রয়েছে। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন সরকার ২০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৭৪ সালে কারখানাটির উৎপাদন শুরু হয়েছিলো। এই সিমেন্ট কারখানাটি অত্যন্ত লাভজনক। জন্মলগ্ন হতেই মাঝখানে কয়েক বছর বাদে প্রতি বছরই লাভ করে আসছে। ১৯৮৫-৮৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থবছর হতে প্রতি বছরই কমবেশী লাভ করে আসছে। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে ৭ কোটি ৭১ লাখ ৭ হাজার, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ৭ কোটি ৪ লাখ, ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৭ কোটি ৭৪ লাখ টাকা লাভ করেছে বলে সংস্থা সূত্রে জানা গেছে। সব মিলিয়ে এ কারখানার দাম বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ৫ শত কোটি টাকা হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ধারণা করেছেন। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী এ ধরনের একটি কারখানা স্থাপন করতে কম করে হলেও এক হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।"

৩৪৮। ১৭ই মে (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় "৫০০ কোটি টাকার সিমেন্ট কারখানা মাত্র ৩৮ কোটি টাকায় বিক্রী" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে আরও বলা হয়, "বর্তমান (বিএনপি) সরকার তাদের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি বাস্তবায়নের কর্মসূচী হিসেবে দেশের সর্ববৃহৎ সিমেন্ট কারখানা 'চট্টগ্রাম সিমেন্ট ক্লিংকার গ্রাইণ্ডিং কোম্পানীটি' বিক্রী করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরশাদ সরকারের (শাসন) আমল হতেই এই কার-খানাটির বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে এ কারখানার ৫১ ভাগ শেয়ার বিক্রী করা হয় শুধুমাত্র ৪ কোটি ২১ লাখ টাকায়। কারখানার বাকি ৪৯ ভাগ শেয়ার বিক্রীর জন্য বর্তমান (বিএনপি) সরকার গত বছর কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এ ব্যাপারে সরকার টেন্ডার আহ্বান করে। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়। ৪৯ ভাগ শেয়ারের জন্য সর্বোচ্চ দরপত্র উঠে ৩৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। (বিএনপি সরকার) এই দামেই কারখানাটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। (ফলে), ৫ শত কোটি টাকার কারখানাটি শুধুমাত্র ৩৮ কোটি টাকায় বিক্রী করা হচ্ছে।" তারপর ঐ সংবাদের মন্তব্যে বলা হয়ঃ "দীর্ঘ ১৯ বছরে নানা জটিলতা, সমস্যা, সংকটকে অতিক্রম করে যে কারখানাটি আজও উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাভের পর্যায়ে রয়েছে, সে কারখানাটি এভাবে পানির দরে বিক্রী করার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। প্রশ্ন উঠেছে, এই কি (বিএনপি) সরকারের 'বাজার ও মুক্ত অর্থনীতির নীতিমালা'? শিল্পায়ন তথা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের এই যদি কর্মকাণ্ড হয়, তাহলে দেশের শিল্প বাঁচবে কি করে?"

৩৪৯। ২৯শে মে (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় 'বিজেএমসি ও ৩৫টি পাটকলের ১ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী হারাচ্ছেন" শিরোনামে এক সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয়ঃ "বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) -এর পঁয়ত্রিশটি পাটকলের মধ্যে নয়টি পাটকল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। আঠারোটি পাটকল বেসরকারী খাতে হস্তান্তরিত করে দেওয়া হবে। আদমজী জুট মিলস লিমিটেডের মত বৃহৎ দুইটি পাটকলের লুম (তাঁত) হ্রাস করে ছোট আকৃতির করা হবে। পঁয়ত্রিশটি পাটকলের নিয়ন্ত্রক বিজেএমসিকে প্রায় আড়াই হাজার জনবলের মধ্যে হ্রাস করে এক শত জনের মত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে নামসর্বস্ব একটা ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। বিজেএমসিসহ পঁয়ত্রিশটি পাটকলে ১ লাখ বিশ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে মাত্র বিশ হাজারের মত চলতি বছরে জনবল রাখা হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বিজেএমসি ও পঁয়ত্রিশটি পাটকলের প্রায় এক লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করা হবে।" ঐ সংবাদে আরও বলা হয়ঃ "(বিএনপি) সরকার বিশ্বব্যাংক ও দাতা দেশসমূহের পরামর্শে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল খাতে জনবল হ্রাস ও লোকসান কমানোর জন্য চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নয়টি পাটকল বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। খুব শীগ্গিরই আঠারোটি পাটকলকে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ার আওতায় বেসরকারী খাতে দিয়ে দিচ্ছে। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম আদমজী জুট মিলস লিমিটেডের কি পরিমাণ তাঁত (লুম) হ্রাস করে কত সংখ্যক জনশক্তি কমানো যায়, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। (বিএনপি) সরকারের এই প্রক্রিয়ার ফলে ইতিমধ্যেই বিজেএমসি ও পাটকলসমূহে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দোদুল্যমানতা, অস্থিরতা, উদ্বেগ ও আতংক দেখা দিয়েছে। এ বছরই রাষ্ট্রায়ত্ত পাটখাতের বিদেশে রফতানির পরিমাণ হ্রাস ও অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাসহ দীর্ঘদিনের বিদেশের বাজার বাংলাদেশ হারাবে। সেই সাথে এ খাতে ১ লাখ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীচ্যুত হওয়াও নিশ্চিত।"

৩৫০। ২৯শে মে (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় "বিএডিসি'র সেচ খাতে বরাদ্দ বাতিল ঃ ১২ হাজার কর্মচারীর বেতন অনিশ্চিত ও ১ শত বীজ বিতরণ কেন্দ্র বন্ধ" শিরোনামে এক সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "(বিএনপি) সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর সেচ খাতের বরাদ্দ বাতিল ও ১ শত বীজ বিতরণ কেন্দ্র বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। ফলে, আগামী জুলাই মাস থেকে বিএডিসির প্রায় ১২ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। বিগত বছরে এডিপিতে বিএডিসি'র সেচখাতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হতো। কিন্তু ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে যে ৯ হাজার ৭ শত ৫০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাতে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেচখাতের ৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ কর্তন করা হয়েছে। অপরদিকে, দেশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যে ৪ শত ৬০টি বীজ বিতরণ কেন্দ্র রয়েছে, তার মধ্যে ১ শতটি বীজ বিতরণ কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করে এ খাতে ৫৭ কোটি টাকার স্থলে ১২ কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি মাসের ১৬ তারিখ থেকেই বন্ধ ঘোষিত বীজ বিতরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রগুলোতে কর্মরত ৩ শত জন কর্মচারী সাধারণ নিয়মে ছাঁটাই হবে।"

৩৫১। ৮ই জুন (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় "কার্পেট ব্যাকিং উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে ঃ পাট শিল্পখাতে ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হবে"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরোনামে আর একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ 'বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী কার্পেট ব্যাকিং (সিবিসি) উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে আদমজী জুট মিলের সমস্ত ব্রডলুম বন্ধ করে দেয়া হবে। ভবিষ্যতে এগুলো ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হবে। অন্য পাটকলগুলোর ব্রডলুমও কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে কার্পেট ব্যাকিং-এর চাহিদা নেই দেখিয়ে সিবিসি উৎপাদনকারী মিল এবং লুমগুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে পাটখাতে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী। বিদেশে চাহিদা কমে যাবার অজুহাত দেখিয়ে বিশ্বব্যাংক (বাংলাদেশে) সিবিসি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি ভারতকে এক লাখ টন সিবিসিসহ দু'লাখ টন পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বলেছে।" ঐ সংবাদে আরও বলা হয় ঃ "বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ অনুযায়ী পাটশিল্প খাতে নির্ধারিত সংখ্যক মিল বন্ধ করা, ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া পুরোদমেই চলছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এ পর্যন্ত ৯টি মিল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আরও একটি মিল বন্ধ করা হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে আঠারোটি পাটকল ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে। এ পর্যন্ত শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে ৯ হাজার। পাট শিল্প খাতে মোট ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হবে। বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছরের মধ্যে দশটি মিল এবং পরবর্তী বছরে অপর আটটি মিল ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হবে। চলতি বছরেই ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হবে।"

৩৫২। ৭ই জুলাই (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'সংবাদে' "১৭ বছরে কেয়ারের ৪ লাখ ৭১ হাজার টন গমের অপব্যবহার" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয়ঃ "বাংলাদেশকে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে' গত ১৭ বছরে কেয়ার (CARE)-এর দেয়া ৪ লাখ ৭১ হাজার ১ শত ৪৮ টন গমের অপব্যবহার হয়েছে। এই গমের দাম ২ শত ৬৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। কেয়ার-এর সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছর থেকে শুরু করে গত ১৯৯১-৯২ অর্থবছর পর্যন্ত 'কেয়ার' মোট ১৯ লাখ ৩৯ হাজার ৪ শত ৪৩ মেট্রিক টন গম বাংলাদেশের 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করে, তন্মধ্যে ১৭ লাখ ৬ হাজার ১ শত ৬৩ টন গম ঐ কয় বছরে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত এই গমের ভেতর থেকে বিগত ১৭ বছরে মোট ৪ লাখ ৭১ হাজার ১ শত ৪৮ টন গমের অপব্যবহার হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশকে এই গম কিনে 'কেয়ারকে' বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। তাতে বাংলাদেশের খরচ হয়েছে মোট ২ শত ৬৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত প্রতি টন গমের কেনা দাম ধরা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। অপরদিকে, তারপর থেকে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতি টন গম কেনা পড়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬ হাজার ৫ শত টাকা দরে। 'কেয়ারের' এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় (যে), ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরের তুলনায় ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে গম অপব্যবহারের হার প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৭৫-৭৬ সালে শতকরা ১৮ দশমিক ৯ ভাগ, ১৯৮৯-৯০ সালে ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ, ১৯৯০-৯১ সালে ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালে অপ-ব্যবহারের হার হচ্ছে ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ।"

৩৫৩। ১৯শে জুলাই (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় "দু'বছরেও রুলস অব বিজনেসের খসড়া প্রণীত হয়নি ঃ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত লংঘিত" শিরোনামে এক সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বের প্রশ্নে ঐকমত্যের অভাবে কৃষি এবং সেচমন্ত্রী মজিদ-উল হকের নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের কমিটি প্রায় ২ বছরেও বর্তমান সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি কার্যবিধিমালা (রুলস অব বিজনেস)-এর খসড়া প্রণয়ন করতে পারেনি। ১৯৯১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরের মন্ত্রিসভা বৈঠকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ উপযোগী একটি কার্যবিধিমালা অতি সত্বর প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং কমিটিকে (বর্তমান) কার্যবিধিমালার চূড়ান্ত পরিবর্তনের সুপারিশ প্রণয়ন করে অতি সত্বর মন্ত্রিসভা বৈঠকে পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান কার্যবিধিমালা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকাণ্ডে মন্ত্রীর ভূমিকা তদারকিমূলক এবং সচিব এর প্রধান। অথচ, সংসদে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য মন্ত্রী দায়বদ্ধ এবং এজন্য তাঁকেই জবাবদিহি করতে হয়। এ কারণে, মন্ত্রীদের অনেকে তাঁদেরকে মন্ত্রণালয়ের প্রধান করার পক্ষে। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রীরা প্রধান নন বলে কোন কোন মন্ত্রী এবং সচিবের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং কর্মকাণ্ডে সমন্বয়হীনতা চলছে। এর ফলে, নানা জটিলতা দেখা দিচ্ছে।" ঐ সংবাদে আরও বলা হয়ঃ "১৯৯১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ (কৃষি ও সেচমন্ত্রী) মজিদ-উল হকের নেতৃত্বে বর্তমান কার্যবিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে ৪ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য তিনজন সদস্য হচ্ছেন (১) যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদ, (২) বাণিজ্যমন্ত্রী এম. কে. আনোয়ার এবং (৩) শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার। ১৯৯১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী কার্যকর হওয়ায় কমিটি ১৯৭৫ সালের কার্যবিধিমালা পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির আলোকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে একে কার্যকর করার সুপারিশ করে। এ সম্পর্কিত প্রস্তাব ১৯৯১-এর ২৩শে সেপ্টেম্বরের মন্ত্রিসভার বৈঠক আলোচিত হয়।"

৩৫৪। ১৯শে জুলাই (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়, "দু'বছরেও রুলস অব বিজনেসের খসড়া প্রণীত হয়নি ঃ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত লংঘিত" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে আরও বলা হয় ঃ (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার) বৈঠকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিটি মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান করে এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব দান এবং সচিবকে প্রশাসনিক প্রধান/প্রধান নির্বাহী করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলো, মন্ত্রিসভা তখন তা গ্রহণ করেনি। মন্ত্রিসভা কমিটিকে তাঁদের প্রস্তাব বিস্তারিত আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পেশ করার নির্দেশ দেয়। এদিকে (কৃষি ও সেচমন্ত্রী) মজিদ-উল হক কমিটিকে পাশ কাটিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মন্ত্রী ও সচিবের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে খসড়া একটি কার্যবিধিমালা প্রণয়ন করে এবং তা ১৯৯২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আপোসমূলক এ খসড়া কার্যবিধি-মালায় সচিবালয়ের কার্য পরিচালনায় মন্ত্রীকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব করা হয়। এতে সচিবদেরকে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান তথা প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার করার কথা বলা হয় এবং সচিব মন্ত্রীর নির্দেশে কাজ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়। তবে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রী সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। ঐ খসড়া কার্যবিধিমালায় সরকারের কার্যপরিচালনায় প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়। এতে সাবেক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির যতোখানি ক্ষমতা ছিলো, সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধান মন্ত্রীকে ততোখানি ক্ষমতা দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়। খসড়ায়, কোন্ কোন্ বিষয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে, প্রধান মন্ত্রী কোন্ কোন্‌টিতে অনুমোদন দেবেন, কোন্ কোন্ বিষয় প্রধান মন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে এবং কোন্ কোন্ বিষয় সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে, তারও বিশদ উল্লেখ ছিলো। কিন্তু গত বছরের ৩রা ফেব্রুয়ারী মন্ত্রিসভার বৈঠকে কমিটির আপত্তির মুখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রণীত খসড়া কার্যবিধিমালা আলোচিত হতে পারেনি।"

৩৫৫। ১৯শে জুলাই (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় "শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিশটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি ঃ অর্থবছরের দশ মাস চলে গেছে" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার ২০টি প্রকল্পের কাজ অর্থবছরের দশ মাস চলে যাওয়া সত্ত্বেও শুরু করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে, প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ভেতর থেকে ঐ একই সময়ে খরচ হয়েছে ৬১ শতাংশ। গত ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাগুলোর মোট ৪৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তার মধ্যে ৩টি ছিলো মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় ৪৭ কোটি ২১ লাখ এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা মিলিয়ে ১০৪ কোটি ১ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিলো। জুলাই (১৯৯২) থেকে এপ্রিল (১৯৯৩) পর্যন্ত ১০ মাসে বরাদ্দকৃত অর্থের ৬১ শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রথম ১১ মাসে বরাদ্দকৃত স্থানীয় মুদ্রার ৪৭ কোটি ২১ লাখ টাকার মধ্যে ৩৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের ৫৬ কোটি ৮০ লাখ টাকার মধ্যে ২৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ২০টি প্রকল্পের কাজ ঐ ১০ মাসে শুরু করাই সম্ভব হয়নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫৬। ৯ই আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "কুটির শিল্পে এডিবি'র ৩ কোটি ডলারের বেশীর ভাগ অব্যবহৃত" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর দেয়া ১ শত ২০ কোটি টাকা (৩ কোটি মার্কিন ডলার) ঋণের একটি বড় অংশ ব্যবহার করতে না পারার কারণে ফেরত যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। গতকাল (৮ই আগস্ট ১৯৯৩ তারিখ রোববার) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি'র ঋণ প্রদান পদ্ধতি' সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় এডিবি'র বেসরকারী খাত পরিচালনা বিভাগের প্রধান এস. এ. আর. বি. থালাকাদা এই আশংকা ব্যক্ত করেন। মিস্টার থালাকাদা জানান যে, ৫টি বেসরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ৩ বছরের মধ্যে বিতরণের জন্য এডিবি ৩ কোটি ডলার দিয়েছে। এর মধ্যে গত জুন (১৯৯৩) প্রথম দু'বছরে মাত্র ১ কোটি ১০ লাখ ডলার বিতরণ করা হয়েছে। বাকি সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ১ কোটি ৯০ লাখ ডলার বিতরণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর শাখাসমূহকে এই প্রকল্প সম্পর্কেই কিছু জানানো হয়নি। ব্যাংকের শাখাগুলোতে শিল্প প্রকল্প মূল্যায়নের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তারও অভাব রয়েছে। এই ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্য সচেতনতার অভাব রয়েছে।" পরিশেষে, মিস্টার থালাকাদা সেসব সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসহ বিভিন্ন সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

৩৫৭। ১২ই আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় "সৈয়দপুর রেল কারখানা—শেষ পর্ব ঃ ট্রেনের বগি নির্মাণের সম্ভাবনাময় প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে গেছে" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "বাংলাদেশ রেলের বগি (কোচ) নির্মাণের একমাত্র ও সম্ভাবনাময় প্রকল্পটি অবশেষে বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে, ভবিষ্যতে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের যে সম্ভাবনাটুকু ছিলো তাও আর থাকলো না। আস্তে আস্তে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬২ সালে সৈয়দপুর রেল কারখানার সাথেই 'ক্যারেজ কনস্ট্রাকশন' নামে এই শপ (বিভাগ)-এর গোড়াপত্তন করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে বগি নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ১ শত ৯৩টি নতুন বগি নির্মাণ করা হয়। এরপর বগি নির্মাণ আরও ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর থেকে এক ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৯০-৯১ সালের মধ্যে ১ শত ২০টি নতুন বগি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্তের পর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অর্থ বরাদ্দের অভাবে নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় চলতে চলতে অবশেষে গত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০শে জুন (১৯৯২) সেটি বন্ধই করে দেওয়া হয়।" ঐ সংবাদে আরও বলা হয় ঃ "১৯৭৭-৭৮ সালে এই কারখানাটি পরিদর্শন করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি (মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান) বগি নির্মাণের এই বিভাগটিকে আরও সম্প্রসারিত করার নির্দেশ দেন এবং সেই মোতাবেক বিভাগটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার কাজ শুরু হয়। বিভাগটিকে গড়ে তোলা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে। নিয়োগ করা হয় একজন ওয়ার্ক ম্যানেজার, একজন সহকারী ওয়ার্ক ম্যানেজার, তিনজন সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী এবং ৫ শত ১০ জন শ্রমিক। সেই সাথে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় বগি নির্মাণের জন্য 'আন্ডার ফ্রেম'। এসবের ১৯ খানা আজও পড়ে আছে। প্রতিটির মূল্য প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা।"

৩৫৮। ১৩ই আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে বঙ্গবন্ধু পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাস্তবতা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী, বিশিষ্ট কবি ও বুদ্ধিজীবী বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত ঐ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু তনয়া ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, প্রাক্তন বিচারপতি কাজী মাহবুব সোবহান, অধ্যাপক কবির চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী এমপি ও ডাঃ এস. এ. মালেক। প্রধান অতিথির ভাষণের এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুধু একজন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হয়নি, বাঙালি জাতির আশা-আকাংক্ষাকে হত্যা করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে। গত ১৮ বছর ধরে বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র ব্যতিক্রমী দেশ, যে দেশের সংবিধানে মানবতাবিরোধী 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (১৯৭৫)'-এর মতো একটি কালাকানুন সংরক্ষিত রয়েছে, যে দেশে (বঙ্গবন্ধুর) আত্মস্বীকৃত খুনীরা শাস্তি লাভের পরিবর্তে পুরস্কৃত হয়েছে।" তারপর দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "তখনই বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রকৃত প্রতিশোধ হবে, যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারবো, প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারবো।" পরিশেষে, তিনি জাতির আশা-আকাংক্ষা নস্যাৎকারী ১৯৭৫-এর খুনীচক্র, (১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস ও সুমহান ইতিহাস বিকৃতিতে লিপ্ত এবং বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী দল ও গোষ্ঠীসহ ক্ষমতাসীন (বিএনপি) সরকারের সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের প্রতিবাদে এবং 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (১৯৭৫), বাতিলের দাবিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫ই আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালন এবং আওয়ামী লীগ আহূত ২০শে আগস্ট (১৯৯৩) তারিখের মহা-সমাবেশকে সফল করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

৩৫৯। ১৫ই আগস্ট (১৯৯৩) তারিখ রোববার জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী সারা দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। আওয়ামী লীগের আহ্বানে সারা দেশে এ দিবসটি বিগত বছরগুলোর মতো 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালিত হয়। গত বছরের মতো এ বছরেও আওয়ামী লীগ ১৫ই আগস্টকে 'জাতীয় শোক দিবস' ঘোষণা, ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র রেডিও-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবনের ওপর অনুষ্ঠান ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ (১৯৭১)-এর ভাষণ প্রচার এবং (বিএনপি) সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের প্রতিবাদে সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের পূর্বে এই 'জাতীয় শোকাবহ' দিবসে আওয়ামী লীগসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুসারী, ভক্ত ও তাঁর কর্মজীবনের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, যুব, ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক, মহিলা ইত্যাদি সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর হাজার হাজার নর-নারী অতি প্রত্যূষ থেকে দুপুর পর্যন্ত, রাজধানী ঢাকার বনানী কবরস্থানে গিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাতে শহীদ বেগম মুজিব, তাঁর বড় ছেলে শেখ কামাল ও তাঁর নব-বিবাহিতা পত্নী সুলতানা কামাল খুকী, মেজো ছেলে শেখ জামাল ও তাঁর নব-বিবাহিতা পত্নী পারভীন জামাল রোজী, ১০ বছরের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসের, ভাগিনা ও দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেছা আরজু, বঙ্গবন্ধুর ছোট বোনজামাই ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল জামিল ও অন্যান্য শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করতেন। তারপর, তাঁরা ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) সড়কস্থ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন (বঙ্গবন্ধু ভবন)-এ সংরক্ষিত তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করতেন। কিন্তু ঐ দিবসে আওয়ামী লীগ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী দেওয়ায় এসব অনুষ্ঠান অনেকাংশে বিঘ্নিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬০। ১৫ই আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত সকাল ৬টা থেকে ১২ পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচীর পর যুবক-বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যুব, ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক ইত্যাদি সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ ঢাকার বনানী কবরস্থানে গিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাতে শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তাছাড়াও, ঐ দিবসে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন 'বঙ্গবন্ধু ভবন' প্রাঙ্গণসহ প্রতিটি মহল্লায় ও রাজধানী ঢাকার বাইরের অন্যান্য শহর, থানা সদর, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং গরীব-দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর দেশের বাড়িতে তাঁর কবরে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নর-নারী পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখানেও মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত করে বঙ্গবন্ধু ও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে তাঁর শহীদ পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। তাছাড়াও, সেখানে গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণও করা হয়। তবে জাতির জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ ও এর অন্যান্য অঙ্গসংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের আবেদন সত্ত্বেও অতীতের জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারগুলোর মতো প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার রাষ্ট্রীয় রেডিও-টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধম্যগুলোকে ঐ দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি দেয়নি।

৩৬১। ২৫শে আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যান উল্লেখ করে ঐ সংবাদে বলা হয়ঃ "জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, বেঞ্চ-টেবিলসহ শ্রেণীকক্ষের অভাব এবং দীর্ঘদিন যাবত অনেক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় (দেশের) উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের ১ শত ২৪টি থানায় যে ১২ হাজার ১ শত ৩৪টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর পাশাপাশি ৫ হাজার ৪ শত ৫৬টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘ দিন শূন্য থাকার কারণে ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ শত ৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তি হবার পরেও বিদ্যালয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না।" প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্রের বরাত দিয়ে ঐ সংবাদে আরও বলা হয় ঃ "১৬টি জেলায় ৯ হাজার ২ শত ৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের ২ হাজার ৩ শত ১২টি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য আছে। এছাড়া, রেজিস্টাড বেসরকারী ২ হাজার ৮ শত ৭২টি এবং ব্যক্তি বা কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থাপিত আরও প্রায় ৬ শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩ হাজার ১ শত ৪৪টি।' দেশের অন্যান্য এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা যে দেশের উত্তরাঞ্চলের অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে বেশী ভালো নয়, তা অভিজ্ঞ মহলের অজানা নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে বিগত প্রায় দু'বছর যাবত নিজেই তার দেখাশোনা ও তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন।

৩৬২। ২৯শে আগস্ট (১৯৯৩) তারিখ রোববার ডঃ কামাল হোসেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটি এবং প্রাথমিক সদস্যের পদে ইস্তফা দিয়ে 'গণফোরাম' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এক বছর ধরে তিনি অরাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরামে'র আহ্বায়ক হিসেবে ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিবি, জাসদ (সিরাজ), আওয়ামী লীগ ইত্যাদি দলের কতিপয় নেতা এবং নির্দলীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে অনেক বৈঠক করেন। ঐ 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরামে'র উদ্যোগে ২৭-২৯শে আগস্টে (১৯৯৩) রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে এক তিনদিনব্যাপী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম আয়োজিত মহাসম্মেলনের শেষ দিন বিকেলে ঐ নতুন রাজনৈতিক দল 'গণফোরাম' গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। দলের গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন গঠনতন্ত্র মোতাবেক ডঃ কামাল হোসনকে 'গণফোরামে'র সাংগঠনিক নির্বাহী পরিষদের সভাপতি করে ১১১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি ১ জন সভাপতি, ১৫ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী, ১৫ সদস্যের সম্পাদকমণ্ডলী, ১ জন কোষাধ্যক্ষ এবং ৬ জন বিভিন্ন বিভাগীয় কমিটির সহ-সম্পাদক এবং ৭৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। তবে, ঐ কমিটিতে 'সাধারণ সম্পাদক' বলে কোন পদ রাখা হয়নি। ঐ দিন ১১১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির ৮৪ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটির ১৫ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলীর ঐদিন বিকেলে নিম্নে উল্লিখিত ১২ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয় ঃ ডঃ কামাল হোসেন, পংকজ ভট্টাচার্য, শামসুদ্দোহা এমপি, জিয়াউল হক, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, এডভোকেট জহিরুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক, এ. এম. এ. মুহিত, বেগম নুরজাহান মোর্শেদ, মেজর জেনারেল (অবঃ) খলিলুর রহমান, মতিউর রহমান ও শাহজাহান সিরাজ এমপি। ঐদিন বিকেলে কমিটির ১৫ সদস্যবিশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকমণ্ডলীর নিম্নোক্ত ১২ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়ঃ মজহারুল হক বাকী, মফিজুল ইসলাম খান কামাল, প্রকৌশলী আবুল কাশেম, মোর্তুজা খান, নজরুল ইসলাম খান, মোস্তফা মহসীন মন্টু, নূরুল ইসলাম নাহিদ, এনায়েতুর রহমান, বেগম রাবেয়া সিরাজ, কমান্ডার আবদুর রউফ, শাহেদ আলী ও মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী। বিভিন্ন বিভাগীয় কমিটির ৬ জন সহ-সম্পাদক হলেন ঃ সগীর আনোয়ার, আবুল হোসেন, সাজেদার হোসেন, শোয়েব চৌধুরী, মুশতাক আহমদ ও আতাউর রহমান। এসব ছাড়াও, ডঃ কামাল হোসেন, পংকজ ভট্টাচার্য, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, এডভোকেট জহিরুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক, এ. এম. এ. মুহিত ও শাহজাহান সিরাজের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি ৭ সদস্যবিশিষ্ট সাংগঠনিক নির্বাহী পরিষদও গঠন করা হয়।

৩৬৩। ২৯শে আগস্ট (১৯৯৩) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার একটি Bangladesh Jute Corporation (Repeal) অর্ডিন্যান্স (১৯৯৩) জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন' বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এই অজুহাতে সরকার বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ ও পরোক্ষ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাট মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায় যে, 'বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের বর্তমান দায়-দেনা ১২৫৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৯৪৪ কোটি টাকাই অতীতের ব্যাংক ঋণের সুদ। পক্ষান্তরে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য ৬০০ কোটি টাকারও অধিক। বিগত এক বছর যাবত এই প্রতিষ্ঠানের জনবল ৩১০০ জন থেকে ১৩০০ জনে হ্রাস করা হয়। ইত্যবসরে, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানটির জনবল ৮০০ জনে হ্রাস করে এটাকে একটি স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রাখারও কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেন। কিন্তু সরকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেসব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে উপরোল্লিখিত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে, ঐ অধ্যাদেশটি সংসদে সরকারী দল বিএনপির সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পাস করানো হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর তা ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৩) তারিখে 'Bangladesh Jute corporation (Repeal) এ্যাক্ট (১৯৯৩)' শিরোনামে আইনে পরিণত হয়। ঐ আইনটির কার্যকারিতা উল্লিখিত অধ্যাদেশ জারির তারিখ থেকে বলবৎ রাখা হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সালে Bangladesh Jute Corporation Ordinance, 1985 (No. xxx of 1985) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন ও র‍্যালী ব্রাদার্স লিমিটেড, এই চারটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন' গঠন করা হয়। এই কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিলো কৃষকের পাটের মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান, পাটের চোরাচালানী নিয়ন্ত্রণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী খাতের পাটকলসমূহে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও মানের পাট সরবরাহ, পাটের মানানুসারে গ্রেডিং কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানী করা। বিএনপি সরকারের উপরোল্লিখিত অধ্যাদেশ জারি এবং পরবর্তীতে আইন পাসের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন' (বিজেসি) বিলুপ্ত করার ফলে বাংলাদেশে পাট উৎপাদনে এবং বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীতে ব্যাপক ক্ষতিকর নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে অভিজ্ঞ মহল আশংকা ব্যক্ত করে।

৩৬৪। ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৩) তারিখ ভোর রাত সাড়ে ৩টায় জামাতে ইসলামীর অংগ ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা বিকট শব্দ করে বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শেরে বাংলা' ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে অনেক কক্ষের দরজা ভেংগে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা চায়নীজ কুড়াল, কিরিচ দিয়ে নৃশংস ও বর্বরোচিতভাবে ছাত্রদের হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয় এবং প্রহার করে। সে সময় প্রায় অর্ধশতাধিক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। এক পর্যায়ে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা ঐ হলের ৩০ নম্বর কক্ষে অবস্থানরত ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র জুবায়েদ চৌধুরী রিমুকে ধরে গেটের বাইরে নিয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করার পর গুলি করে হত্যা করে। তাছাড়াও, ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা ঐ ছাত্রাবাদের কয়েকটি কক্ষে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। তারপর, ছাত্র শিবিরের ঐ সশস্ত্র মাস্তানরা সোহরাওয়ার্দী, মাদারবক্স ও শহীদ হাবিবুর রহমান ছাত্রাবাস তিনটিতেও অনুরূপ আক্রমণ চালায়। ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা ঐ চারটি ছাত্রাবাসের ৫০টি কক্ষে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানদের ঐ আকস্মিক বর্বরোচিত হামলায় উল্লিখিত একজন নিহতসহ প্রায় দু'শতাধিক ছাত্র আহত হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে যে, ঐ সময় আহত ছাত্রদের আর্ত চিৎকারে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হলেও, ক্যাম্পাসে অবস্থানরত প্রায় হাজার খানেক পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা ঐ নৃশংস ও বর্বরোচিত তৎপরতা চালায়।

৩৬৫। ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৩) তারিখ রাত ৮টায় জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় মোট ৩৩ জন সংসদ সদস্য নির্ধারিত কার্যসূচী মুলতবি রেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৩) তারিখে জামাতে ইসলামীর অংগ ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মী-মাস্তানদের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর নৃশংস, বর্বরোচিত ও নারকীয় আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা এবং ঐসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনার অনুরোধ জানালে, সংসদ স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সে মুলতবি প্রস্তাব অনুমোদন করেন। রাত ৮টা ১০ মিনিটে ঐ মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হয় এবং রাত ১২টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সোয়া চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘন্টা আলোচনা চলে। সরকার ও বিরোধী দলীয় সাংসদদের মধ্যে সর্বমোট ৩২ জন সাংসদ ঐ আলোচনায় অংশ নেন। জাতীয় সংসদে জামাতে ইসলামী বাদে সরকারী দল বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলীয় সাংসদগণ দেশে জামাত-শিবিরের ধর্মান্ধ মৌলবাদী অপশক্তির হত্যা, হাত-পায়ের রগ কাটা ও জবাইয়ের ঘটনার প্রতি তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে ধর্মের মুখোশ ও বর্ম ব্যবহার করে মৌলবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জোর দাবি জানান। সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুস সামাদ আজাদ সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে চিরতরে নির্মূল করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, "মুখের কথা নয়, কাজেও বিএনপিকে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে উদ্যোগী হতে হবে।" সংসদ উপনেতা বিএনপির অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সাংবিধানিক বিধান পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে এবং জনগণের আশা-আকাংক্ষার আলোকে এদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা যায় কি-না, তাও দেখার অবকাশ রয়েছে। তবে, রাজনীতির নামে সন্ত্রাসের চূড়ান্ত শাস্তি বিধান করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসীমুক্ত করা।"[৮] তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "আমাদের ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে যারা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপপ্রয়াসে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষের সকল শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাজনীতির অধিকার সবারই আছে কিন্তু সংবিধান কাউকেই রাজনীতির নামে হত্যার, রগ কাটার, জবাই করার অধিকার, গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার অধিকার দেয়নি।" তারপর, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "যারা সীমা লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আপনি ক্ষমাহীন পদক্ষেপ নিন।"

৩৬৬। ২৬-২৭শে অক্টোবর (১৯৯৩) তারিখে রাজধানী ঢাকায় দলের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে আওয়ামী লীগ (কেন্দ্রীয়) কার্যনির্বাহী সংসদের এক দু'দিনব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে দলের পরাজয়ের কারণ, ৩রা ফেব্রুয়ারী(১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে উপনির্বাচন ও উপনির্বাচনোত্তর ঘটনাবলী, বিরোধী দলগুলোর, বিশেষ করে, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপি দল ও সরকারের নির্যাতনমূলক তৎপরতা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর বক্তব্য রাখেন। ঐ সভার শেষ দিনে অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর (১৯৯৩) তারিখে ঘোষিত বিবৃতিতে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ব্যবস্থা করার দাবি জানাবে। আওয়ামী লীগের ২৭শে অক্টোবর (১৯৯৩) তারিখে ঘোষিত বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয় যে, থানা ও জেলা পর্যায়ের 'স্থানীয় সরকারগুলো' জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। তাছাড়াও, গ্রামের সাধারণ জনগণের কাছে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সহজলভ্য করার নিমিত্তে থানা পর্যায়ে 'থানা আদালত' ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা বাঞ্ছনীয় ও একান্ত প্রয়োজন সে মর্মেও আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের উল্লিখিত সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩৬৭। ৩১শে অক্টোবর (১৯৯৩) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'বিশ্ব ব্যাংকের শর্তে আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় ৩৯টি পণ্য রাখা হচ্ছে' শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশোধিত আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকা চূড়ান্ত করেছে। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে এটি প্রকাশ করা হবে। আগামী সোমবার (১লা নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখ) থেকে সংশোধিত আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকাটি কার্যকর করা হবে। কয়েকমাস আগে আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় ১৯৩টি পণ্য ছিলো। এর মধ্যে (বিএনপি) সরকার ১ শত পণ্য নিয়ন্ত্রণ তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ৫২টি পণ্য নিয়ন্ত্রণ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। এতে বিশ্ব ব্যাংক ক্ষুব্ধ হয়। বিশ্বব্যাংক ১লা নভেম্বর (১৯৯৩) তারিখের মধ্যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় পণ্যের সংখ্যা ৩৯-এ নামিয়ে আনা এবং আগামী ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় কোন পণ্য না রাখার শর্ত দেয়। ঐ শর্ত পূরণের ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ই আর ডি) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আলোচনায় বসেন। শেষ পর্যন্ত, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১লা নভেম্বর (১৯৯৩) থেকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় পণ্যের সংখ্যা ৩৯-এ নামিয়ে আনা হচ্ছে।" সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সূত্রের বরাত দিয়ে ঐ সংবাদে আরও বলা হয় ঃ "সব ধরনের গার্মেন্টস সামগ্রী, গরু, মহিষ, ছাগল, মাছ ধরার ট্রলার, ১৫ বছরের পুরানো জাহাজ, বাচ্চা ফুটানোর ডিমসহ বহু সামগ্রী এবার আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। চিনি, লবণ ও মদ বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমদানি করার বিধান রাখা হবে। ধর্মীয় পরিবেশ, প্রতিরক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত কারণে মাত্র ৩৯টি পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় থাকবে।"

৩৬৮। ১৫ই নভেম্বর (১৯৯৩) তারিখ সোমবার দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ঃ সংবিধান সংশোধনের জন্য বিরোধী দলের উদ্যোগ' শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় "ভবিষ্যতে (সংসদের) সকল সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করার ব্যাপারে সংসদের প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো পৃথক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথক উদ্যোগ নিয়েছে।" এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, জামাতে ইসলামী পঞ্চম জাতীয় সংসদের গোড়ার দিকেই অর্থাৎ ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি সংবিধান সংশোধন বিল জমা দেয়। ঐ বিলে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়। অপরদিকে, সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের আবদুর রহিম এমপি ২৮শে অক্টোবর (১৯৯৩) তারিখে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে সুপ্রীম কোর্টের নেতৃত্বে নির্দলীয় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করে একটি বিল জমা দেন। সর্বশেষ, জাতীয় পার্টির সাংসদ মনিরুল হক চৌধুরী সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করে একটি বিলের নোটিশ জমা দেন ১১ই নভেম্বর (১৯৯৩) তারিখে। জাতীয় পার্টির সাংসদ মনিরুল হক চৌধুরী পেশকৃত বিলে বলা হয় ঃ "জাতীয় সংসদের (সাধারণ) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিন প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করবেন এবং এর পর রাষ্ট্রপতি তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী একজন (নির্দলীয়) অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কেউই কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন না এবং তাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।"

৩৬৯। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৯৪) তারিখ, রোববার নির্ধারিত ছিলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী॥এই চারটি শহরের সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও ওয়ার্ড কমিশনার পদের নির্বাচনের জন্য। দেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন এই প্রথম। ইতিপূর্বে, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের পদে সরকার কর্তৃক মনোনীত করার ব্যবস্থা ছিলো। বর্তমান সরকার গত বছর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনগুলোর পূর্বেকার আইন সংশোধন করে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, যদিও একটি সিটি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র পদে নির্বাচন ব্যবস্থায় এই পদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ একজন প্রার্থীর পক্ষে অতীব ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার নির্বাচন ব্যবস্থার সংগে অসংগতিপূর্ণ, তবুও এই ব্যবস্থা যে মনোনীত করার ব্যবস্থার চেয়েও অধিকতর গণতান্ত্রিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও, বলা যায় যে, নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের ভোটে সিটি কর্পোরেশন মেয়র পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে তা দেশের সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার নির্বাচন ব্যবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণই হতো শুধু তাই নয়, কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়রের পদ কোন কারণে শূন্য হলে তখন নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের মধ্য হতে সে পদে নতুন মেয়র নির্বাচিত করা যায় অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজে ও স্বল্প সময়েই। তারপর প্রয়োজন হবে শুধু একটি ক্ষুদ্র ওয়ার্ডের শূন্য আসনে একজন নতুন ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, যা অতি সহজে ও স্বল্প ব্যয়েই সম্ভব। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিটি কর্পোরেশনসহ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সকল 'স্থানীয় সরকার' প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর দলগতভাবে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ, সে ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তরের 'স্থানীয় সরকার' প্রতিষ্ঠান, 'ইউনিয়ন পরিষদ' পর্যন্ত গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের পথ-পন্থা সুগম এবং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

৩৭০। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৯৩) তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ৪টি মেয়র পদের জন্যে মোট ৪৮ জন এবং ১৯২টি ওয়ার্ড কমিশনার পদের জন্যে ১৪০৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চারটি সিটি কর্পোরেশনের ৪৮ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ঢাকায় ২৪ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, খুলনায় ৫ জন এবং রাজশাহীতে ৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৪০৯ জন ওয়ার্ড কমিশনার প্রার্থীর মধ্যে ঢাকায় ৯০টি কমিশনার পদের জন্যে ৬৭৫ জন, চট্টগ্রামের ৪১টি কমিশনার পদের জন্যে ৩০২ জন, খুলনায় ৩১টি কমিশনার পদের জন্যে ১৭৫ জন এবং রাজশাহীতে ৩০টি কমিশনার পদের জন্যে ২৫৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের মোট ভোটার ছিলো ২৮ লাখ ৭১ হাজার ৫০ জন। তার মধ্যে, ঢাকায় ১৭ লাখ ৬ হাজার ৬ শত ৫৫ জন, চট্টগ্রামে ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৮ শত ৬৫ জন, খুলনায় ৩ লাখ ২৪ হাজার ৭ শত ৬৫ জন এবং রাজশাহীতে ১ লাখ ৫১ হাজার ৭ শত ৬৫ জন। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অরাজনৈতিক স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হলেও, বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মেয়র থেকে কমিশনার পদ পর্যন্ত প্রার্থীদের প্রতি দলীয় সমর্থন দান এবং সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের প্রচার-প্রচারণায় অংশ গ্রহণের ফলে ঐ নির্বাচন একটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপ লাভ করে। চারটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের প্রতিটিতেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বিএনপি ও আওয়ামী লীগসমর্থিত প্রার্থীদের মধ্যে। প্রধান মন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপি সরকারের প্রায় সব মন্ত্রী শহর চারটির, বিশেষ করে, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিলে অংশ নিয়ে তাঁদের দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদান করার জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান। বিএনপির সংসদ স্পীকারও খুলনায় দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কাজে অংশ নেন। 'বিএনপি প্রার্থীকে ভোট না দিলে উন্নয়ন হবে না' একথা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বলেও প্রধান মন্ত্রী ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। সেসব প্রচার-প্রচারণার সময় বিএনপি মন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় যানবাহনসহ ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহার করেন বেপরোয়াভাবে। একই সঙ্গে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা চারটি শহরের, বিশেষ করে, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিলে অংশ নিয়ে দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান।

৩৭১। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৯৪) তারিখে কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহর চারটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলে। ঢাকায় প্রায় ২৫টি ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, সংঘর্ষ, বোমাবাজি, গুলিবর্ষণ ইত্যাদির ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৪ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। অপর তিনটি শহরের প্রতিটির কিছু সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। সেসব ঘটনা বাদে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উল্লিখিত চারটি শহরের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ৩১শে জানুয়ারী (১৯৯৪) তারিখে ঢাকার লালবাগ থানার নবাবগঞ্জ বাজারে সিটি কর্পোরেশনের বিজয় উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি সমাবেশে ঐ ওয়ার্ডের (৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের) পরাজিত বিএনপি কমিশনার প্রার্থী আবদুল আজিজের নেতৃত্বে সশস্ত্র মাস্তানরা বেপরোয়াভাবে স্টেনগান ও কাটা রাইফেল দিয়ে গুলি চালালে ৭ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত ও কমপক্ষে ২৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়। ঐ লোমহর্ষক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জনমনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঐদিন নির্বাচন কমিশন বন্দরনগরী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সর্বদলীয় মনোনীত প্রার্থী আওয়ামী লীগের এ. বি. এম. মহিউদ্দিন চৌধুরীকে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে। জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী মোট ১ লাখ ৮০ হাজার ৪শত ৬৮টি এবং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭ শত ৬৩টি ভোট পান। খুলনার মেয়র পদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শেখ তৈয়েবুর রহমান ৭৬ হাজার ৬শত ৯৩টি ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলম হিরণ পান ৬৩ হাজার ২ শত ৬৭টি ভোট। রাজশাহীর মেয়র পদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু ৫৮ হাজার ৫ শত ৩২টি ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুল মতিন খান ২৩ হাজার ১ ভোট পান। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে নির্বাচন কমিশন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৮০টি ওয়ার্ডের কমিশনারের পদে নির্বাচিতদের নাম বেসরকারীভাবে ঘোষণা করে। ঢাকার ২৮টি ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে নির্বাচন কমিশন মেয়র পদের যে ৭০৯টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল একত্রীভূত করে তাতে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ ৪ লাখ ১৬ হাজার ১ শত ৫৩টি এবং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাস ৩ লাখ ৪০ হাজার ৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত ২৮টি ভোট পান। তাঁদের ভোটের ব্যবধান ছিল ৭৫ হাজার ৬ শত ২৫টি। অপরদিকে, ২৮টি ভোটকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের মোট ভোটের সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৯ শত ৬৭। ২৮টি ভোট কেন্দ্রের ২৫টিতে ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৪) তারিখে এবং ৩টিতে ৩রা মার্চ (১৯৯৪) তারিখে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর, ৩রা মার্চ (১৯৯৪) তারিখে রাতে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬৪টি ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে ঢাকার মেয়র পদে নির্বাচিত ঘোষিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস পান ৩ লাখ ৫৩ হাজার ৫ শত ৭৫টি ভোট।

৩৭২। ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯৪) তারিখ সকালে সংসদ ভবনে বিরোধী দলের নেত্রীর অফিস কক্ষে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিসহ সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের নেতৃবৃন্দের একটি আলোচনা বৈঠক সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, সালাউদ্দিন ইউসুফ ও বেগম সাজেদা চৌধুরী, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা আবদুস সোবহান এবং এনডিপির একমাত্র সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ওয়ার্কার্স পার্টির একমাত্র সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন এবং গণতন্ত্রী পার্টির একমাত্র সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ঢাকার বাইরে থাকায় ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ঐ বৈঠকেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে যে তিনটি সরকারী বিল জমা দেওয়া হয়েছিলো সেসব প্রত্যাহার করে সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে একটি অভিন্ন বেসরকারী বিল সংসদে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ বিলের খসড়া প্রণয়ন এবং তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যাপারে আইনগত খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেনঃ আওয়ামী লীগের বেগম সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রহিম, তোফায়েল আহমদ ও মোহাম্মদ নাসিম, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মতিউর রহমান নিজামী, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, গণফোরামের শাহজাহান সিরাজ এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা ওবায়দুল হক।

৩৭৩। ১লা মার্চ (১৯৯৪) মঙ্গলবার সকালে ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদের বৈঠকে দিনের কার্যসূচী অনুযায়ী এক ঘন্টার প্রশ্নোত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব এবং কার্যপ্রণালীর ৭১ বিধি মোতাবেক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আনীত নোটিশসমূহ নিষ্পত্তির পর বেলা ১২টা বিশ মিনিটে আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ আবুল হাসান চৌধুরী 'পয়েন্ট অব অর্ডারে' দাঁড়িয়ে ইসরাইল দখলকৃত 'ওয়েস্ট ব্যাংক' ভূখণ্ডের হেবরনস্থ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার একটি মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ার সময় একজন কট্টরপন্থী ইহুদী ইতিপূর্বে মুসলমানদের ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো, সেই অমানবিক ঘটনা সম্পর্কে সংসদে আলোচনা ও নিন্দা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন। সংসদ উপনেতা অধাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, "হেবরন হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সরকারপ্রধান ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সংসদ থেকে (ঐ ঘটনায়) নিহতদের ব্যাপারে একটি শোক প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে। সরকারের প্রধান মন্ত্রী মানেই সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি।" বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ নাসিম সে সময় বলেন, "সংসদে শোক প্রস্তাব নেয়া হলেও, ঐ নারকীয় পৈশাচিক ও অমানবিক ঘটনা নিয়ে সংসদে আলোচনা ও একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন।" জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জাতীয় পার্টির মওদুদ আহমদ, সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ প্রমুখ হেবরনের মসজিদে প্যালেস্টাইনীদের নামাজে সিজদারত অবস্থায় তাদের গুলি করে হত্যার ও আহত করার ঘটনা নিয়ে সংসদে আলোচনা ও নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার দাবি জানান। ঐ প্রশ্নের ওপর সরকারী ও বিরোধী দলের সাংসদদের মতামত প্রদানের এক পর্যায়ে সরকারের তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, 'আমরা হঠাৎ মুসলমান হয়েছি' বলে বিরোধী দলগুলোর সাংসদদের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য শুরু করলে, সংসদে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয় এবং বিরোধী দলীয় সাংসদরা একযোগে নিজ নিজ আসনে দাঁড়িয়ে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ঐ সময় বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তথ্যমন্ত্রীর ঐ মন্তব্য প্রত্যাহারের এবং তার জন্য সংসদে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী তাঁর ঐ মন্তব্যের জন্য সংসদে ক্ষমা না চেয়ে বিরোধী দলগুলোর সাংসদদের প্রতি কটাক্ষ করে আরও মন্তব্য করলে, সংসদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং বিকেল ১টা ৫০ মিনিটে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল বিরোধী দলের সাংসদগণ সম্মিলিতভাবে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। পরদিন অর্থাৎ ২রা মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত, সংসদের সকল বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের এক সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তথ্যমন্ত্রী তাঁর ১লা মার্চের আপত্তিকর ও মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাতকারী মন্তব্যের জন্য সংসদে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তাঁরা সংসদে ফিরে যাবেন না। উল্লেখ্য, তথ্যমন্ত্রী তাঁর মন্তব্যের জন্য সংসদে ক্ষমাও চাননি আর বিরোধী দলগুলোর সাংসদগণ সংসদে ফিরেও যাননি। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সরকার সংসদের সেই অচলাবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সমাধান, সুরাহা না করেই ৭ই মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সংসদের ঐ ত্রয়োদশ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

৩৭৪। ১৭ই মার্চ (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকা ও বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়াসহ সারা দেশে বেসরকারীভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য অংগ সংগঠনসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী এবং বাংলাদেশের জন্য তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন নানান কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ঐ দিবসটি উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য অংগ সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও, সকাল থেকে আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য অংগ সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং যুবক-বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্তরের হাজার হাজার মানুষ ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন, 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' গিয়ে সেখানে রক্ষিত তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনায় আল্লাহ তা'লার কাছে মোনাজাত করেন। 'বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা' ঢাকাস্থ 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি' প্রাংগণে দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঐ অনুষ্ঠানমালায় ছিলো চিত্রাংকন, স্বেচ্ছায় রক্ত দান, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবনের ওপর প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের অডিও-ভিডিও প্রদর্শনী, উপস্থিত বক্তৃতা, আনন্দর‍্যালী ও আলোচনা সভা। কিন্তু জাতির জন্য অতীব পরিতাপের বিষয় যে, অতীতের লেঃ জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান ও লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোর মতো প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারও বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় রেডিও ও টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষকে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি দেয়নি।

৩৭৫। ১৭ই মার্চ (১৯৯৪) তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কন্যা ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দলের নেতৃবৃন্দের বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় ঐ দিবসটির কর্মসূচীর শুভ সূচনা হয়। তারপর, সেখানে সারা দিন দেশের অনেক স্থান থেকে আগত বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্তরের হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার মানুষ বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করেন। বিকেলে টুঙ্গিপাড়ার জি. টি. হাই স্কুল প্রাংগণে ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কবি শামসুর রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশাল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর ভাষণের গোড়ার দিকে শেখ হাসিনা বলেন, "সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারীর ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন কায়েম করতে হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর গত ১৮ বছর যাঁরা দেশ শাসন করেছেন, তাঁরা বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। জাতির জনকের জন্মদিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেব না।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক চক্র বাংগালী জাতির অন্তর থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো যে, এ নাম মুছে ফেললে স্বাধীনতার চেতনাকে মুছে ফেলা যাবে। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তান বানানো যাবে। আজকের টুঙ্গিপাড়ার গণজোয়ার প্রমাণ করে যে, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব আরও বেশী শক্তিশালী। হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্র-কারীদের বিপক্ষে আজকের গণজোয়ার এ শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ।"

৩৭৬। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখ নির্ধারিত ছিলো জাতীয় সংসদের ৯২ (মাগুরা-২) আসনের উপনির্বাচন। সে উপলক্ষে ঐদিন নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত সরকারী-বেসরকারী সকল অফিস, কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিক এডভোকেট আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে সংসদের ঐ আসনটি শূন্য হয়। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে এডভোকেট আসাদুজ্জামান ৬১ হাজার ৭২৯ ভোট পেয়ে সংসদের ঐ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. মজিদ-উল হক পেয়েছিলেন ৩১ হাজার ৫৯০ ভোট। মাগুরা সদর থানার ৪টি, শালিখার ৭টি ও মোহাম্মদপুরের ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত। নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটারের সংখ্যা ছিলো ২ লাখ ৬ হাজার ৬২৪ জন। সংসদের ৯২ (মাগুরা-২) আসনের ঐ উপনির্বাচনে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁরা ছিলেন আওয়ামী লীগের শফিকুজ্জামান বাচ্চু, বিএনপির কাজী সালিমুল হক কামাল, জাতীয় পার্টির এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আকবর ও ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা মাহবুবুর রহমান। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুজ্জামান বাচ্চু মরহুম আসাদুজ্জামানের বড় ছেলে। ঐ উপনির্বাচনের তারিখের কয়েকদিন পূর্বে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শফিকুজ্জামান বাচ্চু মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনী এলাকার ২৭টি ভোটকেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করে রিটার্নিং অফিসারের কাছে কেন্দ্রগুলোর একটি তালিকা পেশ করেন। একই সাথে তিনি সেসব ভোটকেন্দ্রে ভোট কারচুপি ও গোলযোগের আশংকা করে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানান।

৩৭৭। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে উপনির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চলে। বিএনপি সরকারের অনেক মন্ত্রী ও দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা সেসব প্রচার-প্রচারণায় অংশ নেন। তাঁরা নির্বাচনী এলাকার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে সভা-সমাবেশ করেন এবং ঐ এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। সেসব প্রতিশ্রুতি ছাড়াও, বিএনপির মন্ত্রীরা ঐ নির্বাচনী এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ ও বিভিন্ন প্রকল্প মঞ্জুরীর ঘোষণা দেন। তাছাড়া বিএনপি সরকারের অনেক মন্ত্রী ও দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ঐ নির্বাচনী এলাকার শহরস্থ বিভিন্ন মহল্লায় এবং গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দানের জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান। সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনী এল্যাকার অনেক ইউনিয়নে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিসহ অনেক স্কুল-মাদ্রাসার জন্য অর্থমঞ্জুরী ঘোষণা করেন। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর সরকারের মন্ত্রীদের ও বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সেসব নির্বাচনী প্রচারাভিযানে রাষ্ট্রীয় যানবাহন ও সম্পদ-সুবিধাদির অপব্যবহার করা হয় দারুণ বেপরোয়াভাবে।

৩৭৮। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে জাতীয় সংসদের ৯২ নম্বর (মাগুরা-২) আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় একটানা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ঐ নির্বাচনের ভোট গ্রহণকালে নজিরবিহীন সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, গোলাগুলি, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভয়ভীতি ও জীবন নাশের হুমকি প্রদর্শন, পেশী ও অস্ত্রবলে ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নির্বাচন বিধি লংঘনীয় ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। সেসব ঘটনায় কমপক্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঐ আসনে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শফিকুজ্জামান বাচ্চু সাংবাদিকদের জানান, "শুরু থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রগুলোতে পরিস্থিতি এতোটা খারাপ না হলেও, নির্বাচন কমিশনের ওয়াদানুযায়ী সেগুলোতে বিডিআর মোতায়েন না করার কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএনপি'র মন্ত্রী-এমপিরা ৪/৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। প্রতিটি গ্রুপে ২০/২২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীসহ তাঁরা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে যান এবং নির্বাচনী এলাকার সর্বমোট ১৯টি ইউনিয়নের মোট ১০২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১১টি ইউনিয়নের ৫০ থেকে ৫২টি ভোটকেন্দ্র দখল করে নেন। এসব ভোটকেন্দ্রে একমাত্র বিএনপি ছাড়া আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলীয় প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের মারপিট করে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। গত শনিবার (১৯শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখ) রাত থেকেই (বিএনপি) সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু এলাকাগুলো কর্ডন করে রাখে এবং ৫ জনকে তুলে নিয়ে যায়। এঁদের মধ্যে শালিখা থানার ধনেশ্বরগাতি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সভাপতি রঞ্জিত বিশ্বাসের ২২ বছর বয়স্ক পুত্রও রয়েছেন। রঞ্জিত বিশ্বাসকে বলা হয়েছে যে, বিএনপি প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী না হলে, তাঁর পুত্রকে ফেরত দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে শালিখা থানায় মামলা করতে গেলে থানায় মামলা নেওয়া হয়নি।"

৩৭৯। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর, ঐ আসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাংবাদিকদের আরও বলেন, "শালিখা থানার ৩৯ কেন্দ্রের সবগুলোই সকাল ১০টা নাগাদ বিএনপির সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়। মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেলযোগে এসএমজি, কাটা রাইফেল, পিস্তল, বোমাসহ তারা ভোটকেন্দ্রগুলোতে যায় এবং সেগুলো দখল করে সেখান থেকে প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীদের এজেন্টদের মারধর ও অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়। এসব কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে বড়ইচারা, রাহাতপুর, ধনেশ্বরগাতি, সত্যখালী, বোনাগাতি, আড়পাড়া, পুকুরিয়া, মশাখালী, তালঘড়ি, কৃষ্ণপুর, সিংড়া, নাঘোষা, আসিয়ান ও থইপাড়া। মোহাম্মদপুর থানার ৪৪টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ৩৩টি কেন্দ্রই সকাল ১০টার মধ্যে বিএনপির সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়। এসবের মধ্যে রয়েছে ন'হাটা, পানিঘাটা, রাহাতপুর, মোবারকপুর, বেজুরা, রাজাপুর, হরেকৃষ্ণপুর, চোরারগাতি এবং সদর থানার গংগারামপুর ভোটকেন্দ্র। রাজাপুর হাই স্কুল ও প্রাইমারী স্কুল ভোটকেন্দ্রে বেলা ১২টায় বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা চড়াও হয় এবং আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়। স্কুল সংলগ্ন বাজারে এ সময় আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সাথে সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষকালে বাজার পার্শ্বস্থিত ২টি বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এসব ভোটকেন্দ্রে নজিরবিহীনভাবে সন্ত্রাস চলাকালে নির্বাচনী দায়িত্বে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কেননা, প্রতি ৩টি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলেও তাঁদেরকে গাড়ী দেওয়া হয়নি। ফলে, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।"

৩৮০। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের মাগুরা-২ আসনে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার সূত্রে জানা যায় যে, শালিখা থানার বড়ইচড়া ও হাটবাড়ীয়া ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদপুর থানার রাহাতপুর, এই তিনটি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার ছিনতাই ও নির্বাচনী সংঘর্ষের কারণে ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়। গভীর রাতে রেডিও বাংলাদেশের খবরে বলা হয় ঃ "মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে ১০২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯টি কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থী কাজী সালিমুল হক কামাল ৭৩,২৪৮টি ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী শফিকুজ্জামান বাচ্চু পেয়েছেন ৩৯,৬২৩ ভোট। জাতীয় পার্টির নিতাই রায় চৌধুরী পেয়েছেন ২০,৭৯৪ ভোট।

৩৮১। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যায় মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী আওয়ামী লীগ প্রার্থী শফিকুজ্জামান বাচ্চুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐ উপনির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের বিএনপি সরকার তার দলের প্রার্থীর সমর্থনে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট ডাকাতি করে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। বিএনপি সরকার এ উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে গণতন্ত্রকেই হত্যা করেছে।" সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালন করেনি, সে অভিযোগ করে তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাগুরায় এসে অবস্থা আঁচ করতে পেরে কাউকে কিছু না বলে ঢাকায় ফিরে গিয়ে সঠিক দায়িত্ব পালন করেননি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব ছিলো এই উপনির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, কিন্তু তিনি তা করেননি।" ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি দলীয় মন্ত্রী ও এমপিরা সশস্ত্র মাস্তান-কর্মীদের নিয়ে শালিখা থানার সমস্ত ভোটকেন্দ্র দখল করে আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করে ভোট ডাকাতি করেছে। মাগুরা সদর ও মোহাম্মদপুর থানার শতকরা ৭৫ ভাগ ভোটকেন্দ্রে ভোট ডাকাতি হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৪৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলেও তাঁদের কোন যানবাহন দেওয়া হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটদের জিম্মি করে রেখে মন্ত্রী ও বিএনপি সরকার দলীয় এমপিরা প্রশাসনের (রাষ্ট্রীয়) গাড়ী ব্যবহার করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র ঘুরে ভোট ডাকাতিতে অংশ নেয়।"

৩৮২। ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সংসদের ৯২ নম্বর (মাগুরা-২) আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর, সন্ধ্যায় ঐ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শফিকুজ্জামান বাচ্চুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঐ উপনির্বাচনের ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানান। একই সাথে, তিনি ঐ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও ভোট ডাকাতির জন্য বিএনপি সরকারকে দায়ী করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। উল্লিখিত ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদের মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি সরকারের সশস্ত্র সন্ত্রাস ও ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে সোমবার (২১শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে) মাগুরায় অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল, মঙ্গলবার (২২শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখ) রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং বুধবার (২৩শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখ) সারা দেশে অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

৩৮৩। সংসদের মাগুরা-২ উপনির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ২১শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে মাগুরায় অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে সেখানে মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এবং মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণের এক পর্যায়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদরা ভোট ডাকাত বিএনপির সাথে আর বসবে না। আগামী ২৩শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখ বুধবার দেশব্যাপী আহূত সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতালের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য, অদক্ষ ও ভোট ডাকাত বিএনপি সরকারের অপসারণের আন্দোলন শুরু করা হবে।" বিএনপির চেয়ারপারসন ও সরকারের প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ভোট ডাকাতের নেত্রী বলে সমালোচনা করে শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে আরও বলেন, "বিএনপির মন্ত্রী, এমপি ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুবকরা মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে বর্গীদের মতো হামলা চালিয়ে ভোট ডাকাতির সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে। ভোটকেন্দ্রগুলোতে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ভোট ডাকাতি করে বিএনপি তার অতীতের চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে দেশ থেকে স্বৈরাচার উৎখাত ও দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপি অংশ গ্রহণ করায় মনে করেছিলাম যে, বোধ হয় তাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, তা হয়নি।"

৩৮৪। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপি সরকারের ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদ করে ২১শে মার্চ তারিখে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গদলসহ দেশের অনেক রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি শহীদুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ (খালেক)-এর আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল, জাসদ (ইনু)-এর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা আবদুর রশীদ ও অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ফুলু সরকার এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর সভাপতি মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম। তাঁরা ছাড়াও, দেশের আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের সভায় বিএনপি সরকার কর্তৃক ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সংসদের মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং উক্ত ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হয়। সেসবের মধ্যে ছিলো পাঁচ দলীয় বামজোট, গণফোরাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, এনডিপি, বাংলাদেশ উপজেলা চেয়ারম্যান পরিষদ, গণতান্ত্রিক শ্রমিক লীগ, জনতা পার্টি, পিএনপি, ফ্রীডম লীগ, আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ, রাজধানী ঢাকার মিরপুর ও পল্লবী থানা আওয়ামী লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গদল ও সামাজিক সংগঠন।

৩৮৫। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার কর্তৃক ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদে ২১শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে ঢাকার মগবাজারস্থ দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী অবিলম্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন দাবির পুনরুল্লেখ করে বলেন, "এ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই যে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু হতে পারে না, তা আবারও প্রমাণিত হলো।" ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ আহূত ২৩শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সারা দেশে হরতাল পালনের কর্মসূচীকে সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান জানিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "আগামী ৩১শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় দলের প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।" ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে মিজানুর রহমান চৌধুরী আরও বলেন, "(সংসদের মাগুরা-২ আসনের) উপনির্বাচনে পুলিশ ছিলো অসহায়। নির্বাচন কমিশন ছিলো অস্তিত্বহীন। বিএনপির মন্ত্রী, সরকার দলীয় এমপিদের উপস্থিতিতেই প্রকাশ্যে ব্যালটে সীল মারা হয়েছে। ... নজিরবিহীন ঐ সন্ত্রাস, ভোট ডাকাতি করে বিএনপি সরকার তার পতনকেই ত্বরান্বিত করেছে।" উল্লিখিত ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, "বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় সুষ্ঠু নির্বাচন ছিলো ১৯৭০-এর নির্বাচন। ১৯৭০-এর সেই নির্বাচনেও সর্বাধিক ভোট পড়েছিলো শতকরা ৫৬ দশমিক ৪ ভাগ। মাগুরা-২ আসনের শালিখা উপজেলার ভোট কেন্দ্রগুলোতে শতকরা ৯০ ভাগ ভোট পড়েছে বলে দেখানো হয়েছে। মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে মোট শতকরা ৭০ ভাগ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনসহ এদেশে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনেই এতো বিপুল হারে ভোট পড়েনি।" সাবেক প্রধান মন্ত্রী জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য কাজী জাফর আহমদ ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ভুয়া, জাল এই এমপিকে নিয়ে সংসদের মতো পবিত্র স্থানে আমরা যাবো কি-না, তা চিন্তা করে দেখতে হবে।"

৩৮৬। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার কর্তৃক ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদে ২১শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখ সোমবার বিকেলে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে নগর জামাতে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় ২৩শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখ বুধবার সারা দেশে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। নগর জামাতে ইসলামীর আমীর এ. টি. এম. আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, শেখ আনছার আলী এমপি ও এডভোকেট জসীমউদ্দিন সরকার। সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, "মাগুরায় উপ-নির্বাচন সরকারী দলের নজিরবিহীন সন্ত্রাস ও ভোট ডাকাতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। ঐ সন্ত্রাস সর্বকালের স্বৈরাচারী রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। গোটা রমজান মাস প্রতিদিন একাধিক মন্ত্রী সেখানে অবস্থান করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন শুধু মন্ত্রীদের ফরমায়েশ খেটেছে।" সভাপতির ভাষণে এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম বলেন, "মাগুরার উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে বিএনপির মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে। ভোট ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৭০ ভাগ ভোট গ্রহণ দেখানোতেই প্রমাণ হয় যে, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।"

৩৮৭। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ঘটা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য ২২শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে ঢাকার মিন্টো রোডস্থ তাঁর রাষ্ট্রীয় বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আগামী সাত-দিনের মধ্যে মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায় আগামী ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে দুর্নীতিবাজ ও ভোট ডাকাত খালেদা জিয়ার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয় ঘেরাও করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৭শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখ থেকে ৫ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী গণসংযোগ, সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।" ঐ সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, "বিএনপি ভোট ডাকাতি করে দলীয় প্রার্থীকে এমপি বানিয়ে যদি তাকে সংসদে পাঠায়, তাহলে আমাদের সে সংসদে যাওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আওয়ামী লীগ ভোট ডাকাতদের সঙ্গে সংসদে বসবে কি-না, তা ভেবে দেখা হবে।" ঐ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "ক্ষমতাসীন বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। গত ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে (সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত) উপনির্বাচনে শাসকদল ব্যাপক সন্ত্রাস, সশস্ত্র হামলা, গুলি ও বোমাবাজি করে ভোটকেন্দ্র দখল এবং ভোট ডাকাতির মাধ্যমে মাগুরার জনগণের রায় ছিনতাই করে কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। বিএনপি মাগুরার উপনির্বাচনে ভোট ছিনতাই করার জন্য মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও নড়াইল জেলার সর্বহারা ও নক্সালসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সন্ত্রাসী ও দাগী আসামীদের ভাড়া করেছিলো। নির্বাচনের দিন ভোট ডাকাতির কাজে ক্ষমতাসীনরা এদের ব্যবহার করেছে।"

৩৮৮। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্যে ২২শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে তার ঢাকার মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য রাখার আর এক পর্যায়ে সংসদে বিরোধী দরীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপি'র অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েনের দাবি জানায়। সে দাবি সরকার অগ্রাহ্য করে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশনকেও এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) বলে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্যে ৯ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েনের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানায়। নির্বাচন কমিশনের ঐ অনুরোধও সরকার অগ্রাহ্য করে।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৯শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে মাগুরায় এলে, আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে তাঁকে বিএনপির নির্বাচনী বিধিমালা লংঘন, সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের তৎপরতা, কালো টাকার ছড়াছড়িসহ নানাবিধ অনিয়ম সম্পকে অবহিত করে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবি জানানো হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য টীম গঠন করার প্রস্তাব দেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দল এ প্রস্তাবে সম্মত হলে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়নে দু'টি করে অর্থাৎ ১৯টি ইউনিয়নে ৩৮টি টীম গঠিত হবে এবং টীমগুলো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করবে। স্ব স্ব রাজনৈতিক দল থেকে টীমে প্রতিনিধিত্বকারীদের তালিকা প্রণয়ন করে তা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল তালিকাসহ দ্বিতীয়বার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে বসলে, বিএনপি পর্যবেক্ষক টীম গঠনে আপত্তি জানায় এবং সে ব্যাপারে প্রদত্ত পূর্বসম্মতি প্রত্যাহার করে নেয়। এমতাবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রস্তাবিত পর্যবেক্ষক টীম গঠনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। পর্যবেক্ষক টীম গঠনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলে তিনি সেদিনই মাগুরা ত্যাগ করেন। মাগুরা ত্যাগের কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ বলেছিলেন ঃ 'উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এটা আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না; পরিস্থিতি দৃশ্যত অপ্রীতিকর; আমার উপস্থিতিতে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটুক, এটা আমি চাই না। আমি এর দায়িত্ব নিতে চাই না'।"

৩৮৯। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৩৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্যে ২২শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে তাঁর ঢাকার মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বলেন, "উপনির্বাচনের দিন সকাল থেকে মন্ত্রী মজিদ-উল হক, তরিকুল ইসলাম, মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, আবদুল হাই, অধ্যাপক ইউনুস খান, হুইপ আশরাফ হোসেন, জাহিদুল হক, বিএনপির সাংসদ মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, আবদুস সালাম পিন্টু, শহিদুজ্জামান বেন্টু, জিয়াউল হক, আমান উল্লাহ আমান, লুৎফুরুজ্জামান লস্কর, আবদুল ওহাব, বরকত উল্লাহ ভুলু, মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন, আনসার আলী সিদ্দিকী, নূরুল হুদা ও আনোয়ার খান চৌধুরীসহ আরও অনেকের নেতৃত্বে বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এসএমজি, কাটা রাইফেল, পিস্তল ও বোমাসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র দখল করে প্রতিপক্ষের নির্বাচনী এজেন্টদের মারপিট করে অস্ত্রের মুখে কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তারা বিএনপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থীর পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে ভোট ডাকাতির ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে।" মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে নজিরবিহীন ভোট কারচুপি করা হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য শেখ হাসিনা দেশে অতীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে যে ভোট পড়েছিলো তার পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন, "১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিলো ৫৫.৬২ ভাগ। ১৯৭৯ সালে প্রদত্ত ভোটের হার ছিলো ৫০.২৪ ভাগ। ১৯৮৬ সালে এরশাদ আমলে ভোট ডাকাতির সময় প্রদত্ত ভোটের হার ছিলো ৬০.২৮ ভাগ। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পড়েছিলো শতকরা ৫৫.৩৫ ভাগ। বিগত বিভিন্ন উপনির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিলো ক্ষেত্র বিশেষে ৫০ থেকে ৫৮ ভাগের মধ্যে। কিন্তু মাগুরার উপনির্বাচনে ভোটারদের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভোট-কেন্দ্রে হাঙ্গামা হয়েছে, গুলি-বোমাবাজি হয়েছে। তারপরেও, আশ্চর্যজনক যে, মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে ভোট প্রড়ছে শতকরা ৭২.৪২ ভাগ, যা বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিএনপি সরকার ভোট ডাকাতি ও কারচুপির দ্বারাই এরূপ অবিশ্বাস্য ভোট প্রদানের রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।"

৩৯০। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকারী দল বিএনপির নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদে এবং ঐ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির পৃথক পৃথকভাবে ঘোষিত আহ্বানে ২৩শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। রাজধানী ঢাকায় হরতালের সময় কোন যানবাহন চলাচল করেনি। সকল দোকানপাট, সরকারী-বেসরকারী কল-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিলো। সচিবালয়ে উপস্থিতির হার ছিলো স্বাভাবিক দিনের তুলনায় নগণ্য। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সব অফিস ছিলো বন্ধ। সব ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্যিক ভবনের প্রধান ফটক ছিলো বন্ধ। হরতালের কারণে দূরপাল্লার বাস, লঞ্চ ও বিমান যাত্রা বিলম্বিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। হরতাল চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বাস গ্যারেজ থেকে বের হয়নি। ঢাকা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় হরতালের পক্ষে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করা হয় এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৯১। সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকারী দল বিএনপির নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদে এবং ঐ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের দাবিতে ২৩শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সারা দেশে অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতালের পর বিকেলে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জনসভায় উপরোল্লিখিত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে 'সচিবালয় ঘেরাও'-এর কর্মসূচী ঘোষণা করে। ঐ জনসভায় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনের ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে অবাধ ও সুষ্ঠু পুনঃনির্বাচনের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "নইলে আগামী ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে ভোট ডাকাত, সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ বিএনপি সরকারের পদত্যাগে 'সচিবালয় ঘেরাও' থেকে নতুন করে আন্দোলনের কর্মসূচী দেবো। আওয়ামী লীগ কোনদিন জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বরদাশত করেনি। আগামীতে করবে না। নব্য স্বৈরাচার, দুর্নীতিবাজ ও ভোট ডাকাত বিএনপি সরকারের কবল থেকে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবো।"

৩৯২। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকারী দল বিএনপির নজিরবিহীন ভোট কারচুপির প্রতিবাদে ও ঐ আসনে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে ২৩শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সারাদেশে অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতালের পর বিকেলে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "এই উপনির্বাচনে বিএনপির আসল চেহারা জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে, ১৯৫৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত সকল নির্বাচনে এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়ে আসছে। বিগত ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রয়াত আসাদুজ্জামান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মন্ত্রী মজিদ-উল হককে ৩০ সহস্রাধিক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। এছাড়াও, ১৯৯১-এর নির্বাচনে ঢাকার ৮টি আসনে বিএনপি প্রার্থিগণ জয় লাভ করলেও, তিন বছরের মাথায় (রাজধানী) ঢাকার মেয়র নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ৮৮ হাজারেরও বেশী ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত করে বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করে। জনগণের এই প্রত্যাখ্যানের কারণ বিএনপির তিন বছরের দুঃশাসন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। অথচ, মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী নাকি 'বিপুল ভোটে' জিতেছে। আসলে, আমাদের প্রার্থীকে সামান্য ভোট দিয়ে বাকি ভোট ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের এখনও তিনটি ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনা বাকি আছে। এরই মধ্যে প্রদত্ত ভোটের হার দেখানো হয়েছে শতকরা ৭২ ভাগেরও বেশী, যার আজ পর্যন্ত কোন নির্বাচনে এমন ভোট পড়ার নজির নেই। ভোট ডাকাতিই যদি না হবে, তাহলে এ ফলাফল হয় কিভাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯৩। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে নতুন নির্বাচন, দুর্নীতিবাজ ভোট ডাকাত বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে ছিলো আওয়ামী লীগের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী। অপরদিকে, সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতি প্রতিরোধ করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার জন্য নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে জাতীয় সংসদের মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন ও সাবেক রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মুক্তির দাবিতে একই দিনে (অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে) ছিলো জাতীয় পার্টির 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ঐ ঘেরাও কর্মসূচীর প্রেক্ষাপটে বিএনপি সরকার ৬ই এপ্রিল (১৯৯৪) বুধবার রাত ১২টা থেকে ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) রাত ১২টা পর্যন্ত সচিবালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে এবং আগারগাঁওস্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণসহ মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভা-সমাবেশসহ সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঐদিন ভোর থেকেই সচিবালয়ে প্রবেশের ১৪টি পয়েন্টে কয়েক হাজার বিডিআর, পুলিশ ও আনসার ব্যারিকেড গড়ে তোলে। ৭ই এপ্রিল সকাল ৯টার পর 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী উপলক্ষে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গদলসমূহের নেতা-কর্মীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমবেত হন। সকাল ১১টায় সেখানে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। বেলা সোয়া ১২টায় আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য ও সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সচিবালয়ের পাশে নূর হোসেন চত্বরের সামনে গিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মিছিলের অগ্রভাগে অবস্থান নিয়ে নূর হোসেন চত্বরের অভিমুখে যাত্রা করে অদূরে পীর ইয়ামিনী মার্কেটের ভবনের সামনে প্রথম পুলিশ ব্যারিকেডের সম্মুখীন হন। ঐ ব্যারিকেড ভেঙে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে সেখানে অবস্থানরত দাঙ্গা পুলিশ আওয়ামী লীগের ঐ মিছিলটির ওপর বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথায় গুরুতরভাবে জখমপ্রাপ্ত হন সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ। একই সময়ে, পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটায় ও কাঁদানে গ্যাস শেলের আঘাতে মারাত্মক-ভাবে আহত হন সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। সেখানে আহত হন আরও ৫০ জন আওয়ামী লীগ কর্মী ও নিরীহ মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯৪। ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালনকালে নূর হোসেন চত্বর ছাড়াও পুলিশ কার্জন হল, দৈনিক বাংলার মোড়, প্রীতম ভবন, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, পল্টন, বিজয় নগর, মৎস্য ভবন, নবাবপুর, ঠাটারী বাজার, নর্থ-সাউথ রোডস্থ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদেরসহ পথচারী, রিকশাওয়ালা ও হকারদের ওপর বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। সেসব ঘটনায় বহু লোক আহত হয়। সেদিন বেলা ১টার দিকে কাপ্তান বাজার ও নর্থ-সাউথ রোডে অবস্থিত বিএনপি ও যুবদল কার্যালয় থেকে সরকারী দলের মাস্তান বাহিনী কাটা রাইফেল, স্টেনগান, পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে জনতার মিছিলে বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করে। সে সময় গুলিতে আহত নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোস্তফা আমিনুর রসুল ঘটনাস্থলে এবং রশিদ পরান ও রুস্তম আলী হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র আজিজুল হক মিলন হাসপতালে নেয়ার পর মারা যায়। তাছাড়াও, সিদ্দিকবাজার ও নবাবপুরে যুবদলের মাস্তানরা ছুরি ও চাপাতিসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও জনতার মিছিলে আক্রমণ করে। কাপ্তান বাজার, সিদ্দিকবাজার ও নবাবপুরে যুবদলের মাস্তানদের সেসব সশস্ত্র আক্রমণে উল্লিখিত ৩ জন নিহতসহ ৩৫ জন গুলিবিদ্ধ ও বহু লোক আহত হয়।

৩৯৫। ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালনকালে বিএনপি সরকারের সশস্ত্র মাস্তান বাহিনীর গুলিবর্ষণে ৩ জন নিহত, বহু গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত এবং পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপে অসংখ্য ব্যক্তিকে আহত এবং গ্রেফতারের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও যুব-ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঐদিন পৃথক পৃথকভাবে বিবৃতি প্রদান করেন। তারা বিডিআর, আর্মড পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশ এবং সরকারী দলের সশস্ত্র মাস্তান বাহিনী দিয়ে ন্যক্কারজনকভাবে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী তথা জনগণের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে, এ জাতীয় স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট তৎপরতার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য তাঁরা বিএনপি সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারিও ব্যক্ত করেন। বিএনপি সরকারের ঐদিনের ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা করে যাঁরা বিবৃতি দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশের ৮টি বাম ও গণতান্ত্রিক দল, গণফোরাম, বাংলাদেশ জনতা দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, অলি আহাদের ডেমোক্রেটিক লীগ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, জনতা পার্টি (আসাদ), ন্যাপ (মোজাফফর), গণতন্ত্রী পার্টি, ছাত্রলীগ (ম-ই), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মঞ্চ, ছাত্র ঐক্য পরিষদ প্রভৃতির নেতৃবৃন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯৬। ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যায় এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের ঐ দিনের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালনকালে বিএনপি সরকারের বিডিআর, পুলিশ ও সশস্ত্র মাস্তান বাহিনী দিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের তথা জনগণের ওপর নির্যাতন, গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড চালানোর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা ব্যক্ত করে বলেন, "বিএনপি সরকার স্বৈরাচারী এরশাদের পদাংকই অনুসরণ করছে। ক্ষেত্র বিশেষে এরশাদকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। খালেদা জিয়া বুলেট দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, গণতন্ত্রের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চায়। অতীতে কেউ তা পারেনি, এখনও পারবে না। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।" তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "জানি না, বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যকলাপের হাত থেকে দেশবাসী কীভাবে মুক্তি পাবে! বিএনপির সশস্ত্র মাস্তানরা ঢাকার মেয়র নির্বাচনের পর লালবাগে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। সারা দেশে তারা তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ, তিনজনের লাশ ফেলে দেওয়ার ঘটনার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাই না।" পরিশেষে, ঐ সংবাদ ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনা নব্য স্বৈরাচারী ও সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের লালন-পালনকারী বিএনপি সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ই এপ্রিল (১৯৯৪) রোববার এবং ২৬শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখ দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালসহ ৮ই থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত পরবর্তী লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। আন্দোলনের সে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৮ই এপ্রিল কালো ব্যাজ ধারণ, বাদ জু'মা বায়তুল মোকাররম মসজিদে নিহতদের নামাজে জানাজা, জানাজা শেষে শোক মিছিল, ৮, ৯ ও ১০ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে শোক দিবস পালন, এই তিন দিন শোক দিবসে কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন, ৯ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে দেশব্যাপী সমাবেশ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা, ১০ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল, ১১ই থেকে ১৯শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে থানা ও জেলাসমূহে গণসংযোগ, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা এবং ২৬শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল।

৩৯৭। ১৫-১৬ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখ ঐ দু'দিনে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভা সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীতে তাঁর ২৯ নম্বর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সতের ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ সভায় দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বিভিন্ন বক্তা বলেন, "বিএনপি সরকার বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদে অংশ গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংসদের ভাগ্যকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।" ঐ সভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণে শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণযোগ্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও জনগণের নিকট সত্যিকারভাবে দায়বদ্ধ সরকার ও সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে গণতন্ত্রকামী প্রত্যেক মানুষকে, সমগ্র দেশবাসীকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

৩৯৮। ১৫-১৬ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গভীর উদ্বেগ ও শংকার সাথে লক্ষ্য করছে যে, বিএনপি সরকার অব্যাহতভাবে অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত মহান সংসদকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং সংসদকে অকার্যকর শুধু নয়, সংসদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘ ৯ বছর এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদাসমূহ পালন তো দূরের কথা, বরং বিরোধী দল যখন সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিয়েছে, তাও সরকারী বিএনপি দলের গণবিরোধী ভূমিকার কারণে ফলপ্রসূ হতে পারেনি।"

৩৯৯। ১৫-১৬ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয় ঃ "(১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত) ঐতিহাসিক তিন জোটের রূপরেখাকে শুধুমাত্র আন্দোলনের অঙ্গীকার বলে অভিহিত করে সমগ্র জাতির সঙ্গে বিএনপি প্রতারণা করে চলেছে। শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের বিল পাস করা ছাড়া তিন জোটের রূপরেখার কোন অঙ্গীকার বিএনপি শাসকগোষ্ঠী পালন বা পূরণ করেনি। সন্ত্রাস দমন আইন করে, এস. এস. এফ. গঠন করে শুধু কালাকানুনের সংখ্যাই বৃদ্ধি করেছে। রেডিও-টেলিভিশনকে দলীয় প্রচার মাধ্যমে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রীয় মদদে সন্ত্রাস আজ সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। দুর্নীতি আজ সমাজে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ জন ও মন্ত্রীদের সীমাহীন দুর্নীতি আজ সর্বজনবিদিত। দেশের সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিকয়েক দুর্নীতি-বাজদের কারণে স্থবির, গতিহীন হয়ে পড়েছে। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর দফতর দুর্নীতি-বাজদের আনাগোনার কারণে রাষ্ট্রীয় দফতরের পরিবর্তে ব্যবসায়িক দফতরে রূপান্তরিত হয়েছে। দুর্নীতি দমনে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, সংসদে বিরোধী দল এ সকল বিষয়ে বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করলে, স্পীকারের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তা আজ পর্যন্ত আলোচিত হতে পারেনি। সন্ত্রাস সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটিকে মূলত একটি কাগুজে কমিটিতে পরিণত করা হয়েছে। মন্ত্রীরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ার কারণে স্থায়ী কমিটিসমূহও সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না।"

৪০০। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয়ঃ "সংসদকে চরমভাবে উপেক্ষা করে সরকারের এহেন গণবিরোধী পদক্ষেপসমূহের কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা আজ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দুর্নীতি আজ সরকারের নীতিতে পরিণত হয়েছে। মাগুরা উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাহীন একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। এমন কি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে।" পরিশেষে, আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের ঐ সভায় নিম্নোল্লিখিত দাবিসমূহ ঘোষণা করা হয় ঃ "(১) তিন জোটের রূপরেখার আলোকে অবিলম্বে সন্ত্রাস দমন আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে; (২) রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে; (৩) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ' বিল পাস করতে হবে; (৪) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর সংসদীয় পদক্ষেপ নিতে হবে; (৫) 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিতকরণ' বিল পাস করতে হবে; (৬) স্বতন্ত্র সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; (৭) দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাস দমনে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে; (৮) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে; (৯) মানুষের ভোট, ভাত ও কাজের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং (১০) নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সরকারকে আনতে হবে ও তা পাস করতে হবে।"

৪০১। ১৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখ রোববার (১৯৭১-এর) ঐতিহাসিক 'মুজিব নগর দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, "পঁচাত্তর (১৯৭৫) পরবর্তী সরকারগুলোর মতো বর্তমান বিএনপি সরকারও সুপরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতার চেতনা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস এবং স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করে চলেছে।" তারপর, মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "দেশের ভেতরে স্বাধীনতার সত্যিকার ইতিহাসকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র সাময়িকভাবে সফল হলেও দেশের বাইরে বিদেশী পুস্তক, পত্রপত্রিকা, লাইব্রেরী থেকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিলুপ্ত করা যাবে না।" তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে যে গণতন্ত্র এনেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির, সেই গণতন্ত্র চর্চার ভার এমন একটি দলের ওপর পড়ে যারা গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে না। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিল উত্থাপন এবং পাস করে জাতীয় সংসদে বেগম খালেদা জিয়ার হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়েছিলাম। সংসদ চালানোর দায়িত্ব সংসদ নেত্রীর। কিন্তু, তিনি সংসদকে পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টারে উড়ে মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যে জাতীয় সংসদে জনস্বার্থে আনীত বিরোধী দলের একটিও প্রস্তাব ও বিল সরকারী দল পাস করে না, যে সংসদের নেত্রী সংসদকে উপেক্ষা করে চলেন, সে সংসদে বিরোধী দল পুতুল সেজে বসে থাকবে, তা হতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০২। ১৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, "গণতন্ত্রের লেবাস পরে বিএনপি সরকার কেবল অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে না, নাগরিকের ইচ্ছা মাফিক নির্বাচনী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার মৌলিক অধিকারও কেড়ে নিয়েছে।" তারপর, সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপির ভোট ডাকাতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানা সত্ত্বেও মাগুরাবাসীর ভোটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেননি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে সরকারের ছিনিমিনি খেলাকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ইনস্টিটিউশনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমরা ভোট ও ভাতের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবো না। বিএনপি নব্য স্বৈরাচার হিসেবে দেশ শাসন করছে। ক্ষমতাসীনরা তিন জোটের রূপরেখা ভঙ্গ করেছে। সংসদে বিরোধী দলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেও তা রক্ষা করেনি। আমরা বিএনপির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সরকারের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী আচরণ, অত্যাচার-নির্যাতন আমাদেরকে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছে। যারা বুলেট দিয়ে ব্যালট বাক্সকে স্তব্ধ করতে চায়, যারা ভোট ছিনতাই করার জন্য রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সর্বহারা-সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেয়, জনগণের ভোট ও ভাতের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।" পরিশেষে, শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্‌বান জানিয়ে বলেন, "ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদকে শুধু অকার্যকরই করেনি, বিরোধী দলের সংসদে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। বিএনপি সরকার ভোট চোর। ভোট চোরের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। অচিরেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।"

৪০৩। ৩০শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর চীফ এডিটর ডি. পি. বড়ুয়া ও সিনিয়র করেসপনডেন্ট কামালউদ্দিন সবুজের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বর্জনরত সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র দলের প্রতি ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য আহ্‌বান জানান। ঐ সাক্ষাৎকারে প্রধান মন্ত্রী দেশে ভবিষ্যতে যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ, নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধান এবং ভোটারদের জন্য পরিচয়পত্র প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলের দেশে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না।" সে প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের রীতিনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ।

৪০৪। ২-৩রা মে (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এক দু'দিনব্যাপী বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দসহ দলের জাতীয় কমিটির সদস্যগণ, জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, দলীয় সাংসদবর্গ, দলের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ দলের নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারগণ। ২রা মে (১৯৯৪) তারিখ সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত ঐ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হচ্ছে না সে কথা প্রধান মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। গত ৩০শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধান মন্ত্রীর দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনারকে শক্তিশালী ও ভোটারদের জন্য পরিচয়পত্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাবনার মধ্যে তাঁর স্বীকারোক্তি মিলেছে। ৩০শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর সাথে সাক্ষাৎকারে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে যোগদানের জন্য আওয়ামী লীগসহ সংসদে বিরোধী দলগুলোর প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তার জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা বলেন, "এমন কোন পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যে বিরোধী দল সংসদে ফিরে যাবে।"

৪০৫। ২রা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, "ক্ষমতাসীন বিএনপি'র দুঃশাসনে দেশের সর্বস্তরের মানুষ জর্জরিত। যতোদিন বিএনপি ক্ষমতায় থাকবে ততোদিন জনগণের সার্বিক মুক্তি আসবে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের কোন নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা না থাকায় দেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে। জনগণ তার মৌলিক অধিকার ভোট ও ভাতের নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত।" তাঁর ভাষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "আজ বিএনপি জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বিগত উপনির্বাচনগুলো তার প্রমাণ। আসলে বিএনপি বুঝতে পেরেছে যে, তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। নির্বাচন প্রতিষ্ঠানকে সরকার তাই হুকুমের দাসে পরিণত করেছে। বিএনপি যতোই নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করুক না কেন, ভোটের প্রশ্নে জনগণ যে তার অধিকার হারিয়েছে তা আজ জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।" তারপর শেখ হাসিনা বলেন, "বিগত (১৯৯১ সালের) নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনে তাঁর যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি সরকার এ সংসদকে কার্যকর ও অর্থবহ না করে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।" ঐ বর্ধিত সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের শেষাংশে শেখ হাসিনা বলেন, "সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য আমরা বহু সহযোগিতা করেছি। জনস্বার্থে আমরা যেসব প্রস্তাব সংসদে এনেছি, বিএনপি সরকার তা উপেক্ষা করে চলেছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সবকিছু পাস করিয়ে নেওয়া বিএনপি রেওয়াজে পরিণত করেছে। দুর্নীতির ব্যাপারে সংসদে সরকার আমাদের কথা বলতে দেয় না। ফলে, আমরা জনগণের কথার প্রতিফলন সংসদে তুলে ধরতে পারি না। উল্টো সরকারী দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে নানাভাবে কটূক্তি ও অবমাননা করা হয়। সংসদকে অকার্যকর করার পেছনে বিএনপি সরকারের নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। তাইতো, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে যথার্থভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না। আসলে বিএনপি সরকার সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নয় বলে সংসদকে অচল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে।" পরিশেষে, শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা জনগণের জীবনের নিরাপত্তা, ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং বিএনপি সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও দুর্নীতির জন্য বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করেছি।"

৪০৬। ২-৩রা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দু'দিনব্যাপী কার্যনির্বাহী সংসদের ঐ বর্ধিত সভায় বক্তারা জাতীয় সংসদের ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় চতুর্দশ অধিবেশনে আওয়ামী লীগের যোগদান করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন। ঐ সভায় দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধানসহ অমীমাংসিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিএনপি সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ঐ সভায় বক্তারা ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ না নিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে, ঐ সভায় নেতৃবৃন্দ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিএনপি সরকারকে বাধ্য করার লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনের কর্মসূচী ও কৌশল গ্রহণে সর্বময় দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার ওপর অর্পণ করেন।

৪০৭। ২-৩রা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের দু'দিনব্যাপী সভার শেষ দিন ৩রা মে (১৯৯৪) তারিখে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সভার সমাপনী ভাষণে বলেন, "আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, পার্লামেন্টে ফিরে যাওয়ার মতো কোন পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার সকল ওয়াদাই ভঙ্গ করেছে। তাদের দুঃশাসন, নির্যাতন ও দুর্নীতি সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী, শ্রমিক, পেশাজীবীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। বিএনপি সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশবাসীর কোন কল্যাণ হবে না। কোন সমস্যার সমাধান হবে না। সর্বস্তরের মানুষ এই সরকারের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ১০ই এবং ২৬শে এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশব্যাপী পালিত পর পর দুটি স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক সফল হরতাল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা তিন বছরে নানাভাবে সরকারকে সহযোগিতা করেছি। কিন্তু সরকার কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। সন্ত্রাস, খুন, হত্যা, দুর্নীতি, দুঃশাসন, দলীয়করণ সমগ্র জাতিকে গ্রাস করেছে। ক্ষমতাসীনরা জনগণের ভোটের অধিকার ছিনতাই করেছে। সংসদের মাগুরা-২ আসনে ২০শে মার্চ (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের ফলাফল আজও বাতিল করা হয়নি। রাজধানী ঢাকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরের দিন লালবাগে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ৭ই এপ্রিল (১৯৯৪) তারিখে 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালনকালে সরকার দলীয় সন্ত্রাসী-দের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের খুনীদের আজও গ্রেফতার করা হয়নি।" ঐ সভার সমাপনী ভাষণের শেষাংশে শেখ হাসিনা বলেন, "জনগণ স্বৈরাচারী বিএনপি সরকারের হাত থেকে মুক্তি চায়। আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া জনগণের মুক্তি আসবে না। আন্দোলন ছাড়া এই সরকারের হাত থেকে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা করা যাবে না। জনগণের অধিকার রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং কৃষক-শ্রমিকের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের বিকল্প নেই। আমরা জনগণের ভাষা বুঝি, জনগণ আমাদের ভাষা বোঝে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০৮। ৩রা মে (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে সংসদে বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, সালাউদ্দিন ইউসুফ, শুধাংশু শেখর হালদার, আবদুর রহিম, মতিয়া চৌধুরী ও খ. ম. জাহাঙ্গীর, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মনিরুল হক চৌধুরী ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী ও সাখাওয়াত হোসেন, এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। ঐ সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত বিল প্রণয়ন, ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে যোগদান না করার প্রশ্ন এবং ৭ই জুলাই (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় সংসদের বগুড়া-৪ (কাহালু) আসনের উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়। ঐ সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিরোধী দলগুলো ৭ই জুলাই (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় সংসদের বগুড়া-৪ (কাহালু) আসনের উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না। ঐ সভায় ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে যোগদান না করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা করে সংবিধান সংশোধনী কোন বিল সংসদে না এনে সে ব্যাপারে সংসদে বিল আনার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হবে। তবে, বিরোধী দলগুলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা উল্লেখ করে যৌথভাবে ঘোষণা দেবে।

৪০৯। ৩রা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধিদের সভার পর সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, "বিএনপি সরকার সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই, আওয়ামী লীগ সংসদের চলতি অধিবেশনে যোগদান করবে না। সরকারকেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিল ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদে আনতে হবে।" সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আরও বলেন, "বিগত তিন বছর ধরে বিরোধী দল সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিল থেকে শুরু করে জনস্বার্থে অনেক প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেছে। কিন্তু সরকারী দল তা উপেক্ষা করেছে, সংসদ পরিচালনায় অদক্ষতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার আজ পর্যন্ত একটি পৃথক সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতেও ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে ঠিকমত কাজ করতে দিচ্ছে না। এক কথায়, সংসদকে কার্যকর করতে সরকারী দলের কোন উদ্যোগ ও উৎসাহ নেই। এছাড়াও, বিএনপি সরকার (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত) তিন জোটের রূপরেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। অপরদিকে, সরকারী দল বিএনপির মহাসচিব তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে চলেছেন। সরকারী দল ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলতে আসেনি।"

৪১০। ৩রা মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধিদের সভার পর আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, "সংসদকে কার্যকর করার দায়দায়িত্ব সরকারের ওপরেই বর্তায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সরকারের আচার-আচরণ সংসদকে অর্থবহ করার উপযোগী নয়। জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা, সংসদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থতা ও অনীহা অব্যাহতভাবে চলছে। সংসদে সংসদ নেত্রী প্রধান মন্ত্রীর অব্যাহত অনুপস্থিতি সংসদকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। অথচ, সরকারপ্রধান হিসেবে সংসদ নেত্রীর ওপরেই সংসদের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। এতে মনে হয় যে, সংসদের কার্যকারিতা কিভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।" ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরও বলেন, "গণতন্ত্রকে সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাংবিধানিক সংশোধনী সরকার কর্তৃক সংসদে উপস্থাপন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিল সংসদে উত্থাপনসহ রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত এবং কালাকানুন বাতিলের জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থবহ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত জাতীয় পার্টি সংসদ বর্জন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোয় যোগদান না করা অব্যাহত রাখবে এবং ৭ই জুলাই (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় সংসদের বগুড়া-৪ (কাহালু) আসনের উপনির্বাচনে অংশ নেবে না।" ঐ সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণতন্ত্রী পার্টির একমাত্র সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "সরকারী দল বিএনপি সংসদে যাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। সরকারের মধ্যে সংসদীয় শিষ্টাচারের অভাব রয়েছে। আজ জাতির সামনে রাজনৈতিক ইস্যু হচ্ছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাংবিধানিক ত্রয়োদশ সংশোধনী আনয়ন। এটি আনলেই আমরা সংসদে যেতে রাজি। সরকারের হাতে এখনও সময় আছে।" একই প্রেস ব্রিফিংয়ে এনডিপির একমাত্র সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, "সংসদে যাওয়া না যাওয়া একই কথা। কেননা, বিএনপি সরকার এ সংসদকে জবাবদিহি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে সংসদে জবাবদিহিতা নেই, তাতে যোগ দেওয়া অর্থহীন। তাই সংসদে যাবার পরিবর্তে এখন জনগণের কাছে যাবার সময় এসেছে।"

৪১১। ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন শুরু হয়। সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবিতে সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের সকল সদস্য সংসদের ঐ অধিবেশন বর্জন করেন। ঐ অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণ পর সংসদ নেত্রী প্রধান মন্ত্রী ৭ মিনিট স্থায়ী এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের প্রতি আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানান। সংসদে বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের শূন্য আসনগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রধান মন্ত্রী বলেন, "আসুন, জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ও জাতীয় যা কিছু সমস্যা আছে, সংসদে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান করি। জাতীয় সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাতীয় সংসদ। আমরা সকলে মিলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছি। এ সংসদে সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। দেশ আমাদের সকলের। তাই দায়িত্বও প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে, আমরা যারা সংসদ সদস্য, সহকর্মী বা বন্ধু হিসেবে এক সাথে রাজপথে আন্দোলন করেছি। বিরোধী দলের বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি আমার আহ্বান, সংসদে আসুন। গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করতে ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারবো। আসুন, আমরা জাতীয় সংসদকে আরও শক্তিশালী, প্রাণবন্ত ও কার্যকর করে গড়ে তুলি।"

৪১২। ঐদিন বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের সকল সদস্যের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনের শুরুতে প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণের অব্যবহিত পর সংসদ ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সম্মেলন কক্ষে বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের পক্ষ থেকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি সংসদে যোগদানের জন্য সংসদ নেত্রী প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বান সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে শেখ হাসিনা বলেন, "প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ অন্তঃসারশূন্য। তাঁর ভাষণে এমন কিছু নেই যার ফলে বিরোধী দল সংসদে ফিরে যেতে পারে।" সংসদে প্রদত্ত ভাষণে প্রধান মন্ত্রী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, তার জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপিকে ভোট না দেওয়ায় সেই ভোটারকে পরে বিএনপির মাস্তান-সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। সংসদের মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে, ভয়ভীতি ও জীবন নাশের হুমকি প্রদর্শন করে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে না দিয়ে, মাস্তান-সন্ত্রাসীদের দিয়ে ভোটারদের শায়েস্তা করে প্রধান মন্ত্রী যে কি ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন হয় না।" তারপর শেখ হাসিনা আরও বলেন, "বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচনে এখন বিএনপি প্রার্থীকে ভোট না দিলে ভোটারদের জানের নিরাপত্তা নেই। এভাবে দেশকে অরাজকতা ও সংঘাতের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই, দেশকে বাঁচাতে হলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বছরের মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি জাতীয় নির্বাচন প্রয়োজন।" ঐ সংবাদ ব্রিফিংয়ে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যকে 'সারমর্মশূন্য' বলে অভিহিত করে বলেন, "নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে দেশের আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি যেখানে আজ একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে, সেখানে প্রধান মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।" জামাতে ইসলামীর মাওলানা আবদুস সোবহান ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, "সংসদ নেত্রীর বক্তব্য জাতীয় দাবির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে বিরোধী দলের সংসদে যাওয়ার পথ ও পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।" ঐ একই প্রেস ব্রিফিংয়ে গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "সংসদ নেত্রীর বক্তব্য বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের অচলায়তন থেকে মুক্তির কোন পথ দেখাতে পারেনি। সংসদ নেত্রী প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই রাজনৈতিক সংকটকে ক্রমেই সাংবিধানিক সংকটে পরিণত করে ফেলেছেন।" উল্লেখ্য, সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের সকল সদস্যের সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে ৪ঠা মে (১৯৯৪) তারিখে শুরু হওয়া জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন ১২ই মে রাতে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৪১৩। জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন সমাপ্তির পর সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপির কতিপয় মন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় নেতা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। 'সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান নেই', 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না', এসব কথা বলে বিএনপির নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়াও, বিএনপির অনেক নেতা বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে 'অবাস্তব', 'অযৌক্তিক', 'হাস্যকর' ইত্যাদি হিসেবে অভিহিত করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলেন। সে পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত। ইত্যবসরে, দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ, বিবৃতি ও চিঠিপত্রাদি প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের প্রতি আবেদন জানান বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির প্রশ্নে একটি সন্তোষজনক সমঝোতায় পৌঁছে রাজনৈতিক বিরোধ ও সংকটের সমাধান করার জন্য। কিন্তু সরকারী দল বিএনপির পক্ষ থেকে সে লক্ষ্যে কোন উদ্যোগ গ্রহণের বা প্রয়াস চালানোর কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়নি।

৪১৪। ৫ই জুন (১৯৯৪) তারিখ সকালে সংসদ ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সভাকক্ষে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের বেগম সাজেদা চৌধুরী, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, তোফায়েল আহমদ, চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, আবদুর রহিম, বেগম মতিয়া চৌধুরী, সুধাংশু শেখর হালদার, মহিউদ্দিন আহমদ, কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, শেখ হারুনুর রশিদ ও হুইপ আজিজুর রহমান, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ডঃ টি.আই.এম. ফজলে রাব্বি ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী ও মাওলানা আবদুস সোবহান, এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং গণফোরামের এম. সামসুদ্দোহা। গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন ও ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা ওবায়দুল হক ঢাকার বাইরে থাকায় তাঁরা ঐ বৈঠকে যোগদান করতে পারেননি। সংসদের বিরোধী দলীয় ও অন্যান্য গ্রুপের নেতৃবৃন্দের ঐ সভা শেষে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, "আজ (রোববার) পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সংসদের অচলাবস্থা নিরসনে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি কিংবা সংকট সমাধানে সরকারের আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়নি। আগামীকাল (৬ই জুন, ১৯৯৪ তারিখ) সোমবার থেকে জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।" তারপর মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "সম্প্রতি সরকারের কতিপয় মন্ত্রীর বক্তব্য ও লাগামহীন উক্তি পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। এ অবস্থায় বিরোধী দল মনে করে যে, যেহেতু পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি, বরং অনেকাংশে অবনতি ঘটেছে, সে ক্ষেত্রে বিরোধী দল তার পূর্বতন সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। অর্থাৎ বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত বহাল আছে।" পরিশেষে, মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "আমাদের অত্যন্ত পরিষ্কার দাবি যে, সরকারের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের বিল সংসদে উত্থাপন করতে হবে। তা না করা পর্যন্ত বিরোধী দল বাজেট অধিবেশনে যোগ দেবে না।"

৪১৫। ৬ই জুন (১৯৯৪) তারিখ বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের লাগাতার সংসদ বর্জনের মধ্যে সংসদের পঞ্চদশ (বাজেট) অধিবেশন শুরু হয়। সরকারী দল সংসদে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল সংসদে না আনা পর্যন্ত লাগাতার সংসদ অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলামী, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, গণফোরাম, এনডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সাংসদগণ ঐ অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। ৯ই জুন (১৯৯৪) বৃহস্পতিবার সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল গ্রুপের সাংসদদের অনুপস্থিতিতেই সংসদে পেশ করা হয় সরকারের ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট।

৪১৬। ৯ই জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী সকল গ্রুপের সাংসদদের অনুপস্থিতিতে বিএনপি সরকার কর্তৃক সংসদে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করার পর সেদিন রাতে সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ সংসদের অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের নেতৃবৃন্দ এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "সকল বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে রেখে সরকারের বাজেট পেশে মনে হচ্ছে যে, এ যেন ক্ষমতাসীন বিএনপি পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে বাজেট উত্থাপন করা হলো! সরকার বিরোধী দলের সংসদে যাবার পথ রুদ্ধ করে একদলীয় ব্যবস্থায় সংসদে বাজেট পেশ করেছে। অগণতান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া এ বাজেটের কোন বৈধতা থাকলো না। আর যে বাজেটের বৈধতা থাকে না, জনগণ সে বাজেট কখনোই গ্রহণ করতে পারে না।" তারপর তাঁর বক্তব্যে শেখ হাসিনা আরও বলেন, "বিগত (১৯৯১-এর) নির্বাচনে দেশের মাত্র ৩১ শতাংশ ভোটার বিএনপিকে ভোট দেয়। বাকি ৬৯ শতাংশ ভোটারের ভোট পেয়েছিল আজকের সকল বিরোধী দল। সেই ৬৯ শতাংশ ভোটারের প্রতিনিধিরা আজ জাতীয় সংসদে অনুপস্থিত। সুতরাং, সকল বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সংসদে চাপিয়ে দেওয়া বাজেটের দায়দায়িত্ব ৬৯ শতাংশ ভোটার গ্রহণ করতে পারে না।" বিএনপি সরকার কখনোই সংসদে 'প্রাক বাজেট' আলোচনার ব্যবস্থা করেনি তার অভিযোগ করে পরিশেষে শেখ হাসিনা বলেন, "বিগত ৩ বছরে কখনোই সংসদে 'প্রাক বাজেট' আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়নি। কনসোর্টিয়াম বৈঠকের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় যে এইড মেমোরেন্ডাম তৈরি করে থাকে সে সম্পর্কে কখনোই আমরা অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিরা কোন কিছু জানতে পারিনি।"

৪১৭। ৯ই জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদে সরকারের বাজেট পেশের পর রাতে সংসদ ভবনে বিরোধী দল আয়োজিত ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, "দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দকে সংসদের বাইরে রেখে সংসদে উপস্থাপিত এ বাজেট জাতীয় সংসদের বাজেট নয়, একদলীয় বাজেট। বিরোধী দলহীন জাতীয় সংসদে বাজেট পেশের মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার জনগণের প্রতি অগণতান্ত্রিক আচরণের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে, তাতে বিএনপির সত্যিকারের রূপ আজ জনগণের কাছে ধরা পড়েছে। এ ধরনের নজির দেশের ইতিহাসে শুধু নয়, অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে কিংবা সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পার্লামেন্টের ইতিহাসেও নেই।" ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে গণতন্ত্রী পার্টির সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "এ বাজেট উপস্থাপিত হয়নি, বরং চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোষিত বাজেট সংবিধানসম্মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজেট নয়, একক সরকারী দলের নব্য স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশসম্বলিত একটি চাপানো বাজেট। বিরোধ দলহীন সংসদে বাজেট পেশের মধ্য দিয়ে বিএনপি যে কলংকজনক অধ্যায়ের নজির সৃষ্টি করলো, বিএনপি সরকারকেই তার মাশুল দিতে হবে এবং বাজেটের সকল দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।" একই প্রেস ব্রিফিংয়ে জামাতে ইসলামীর সাংসদ শেখ আনসার আলী বলেন, "বিরোধী দলকে সংসদে অনুপস্থিত রেখে সংসদে বাজেট ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার আবারও তাদের অগণতান্ত্রিক, অসংসদীয় ও হঠকারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বিএনপি তাদের পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় এ বাজেট পেশ করলেই ভালো করতো। উথ্থাপিত বাজেট বিবেচনার যোগ্য নয় এবং ভবিষ্যতে এর যে কোন পরিণতির জন্য বর্তমান সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।"

৪১৮। ১৩ই জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদ ভবনের বিরোধী দলীয় নেত্রীর সম্মেলন কক্ষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ সংসদের অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, মহিউদ্দিন আহমদ, সালাউদ্দিন ইউসুফ, তোফায়েল আহমদ, শুধাংশু শেখর হালদার, মোহাম্মদ নাসিম, রহমত আলী ও খ. ম. জাহাঙ্গীর, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মনিরুল হক চৌধুরী ও ডঃ টি. আই. এম. ফজলে রাব্বি, জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী ও মাওলানা আবদুস সোবহান, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। সংসদের প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের ঐ বৈঠকের পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারকে আল্টিমেটাম দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন, "আগামী ২৬শে জুন (১৯৯৪) তারিখের মধ্যে সরকারকে ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদের সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য সংসদে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল আনতে হবে। এ দাবি যদি সরকার বাস্তবায়ন না করে, তাহলে আমরা সকল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবো। ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি সরকারকে আমাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা হবে। ঐ আন্দোলন হবে জনগণের সামগ্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার আদায় এবং নিশ্চিত করার আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের মুখে সরকারের যদি কিছু হয়, তার দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।"

৪১৯। ১৩ই জুন (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, "জনগণ আশা করেছিলো যে, অনেক আন্দোলন, সংগ্রামের মাধ্যমে আসা গণতন্ত্রকে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবো। কিন্তু তা বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা ও একগুঁয়েমির জন্যে হলো না। এ সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। তাদের হাতে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা নেই। মানুষের ভোটের অধিকার বিএনপির হাতে নিরাপদ নয়। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংসদের সকল বিরোধী দল গত দু'দিন বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেছে। আমরা সরকারকে আমাদের দাবির ব্যাপারে দীর্ঘ সময় দিয়েছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করার দাবি শুধু আমাদের দাবি নয়, এ দাবি জনগণের। কিন্তু জনগণের দাবির প্রতি বিএনপি সরকারের সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই।" ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপি সরকার একদলীয়ভাবে একটা বাজেট সংসদে পেশ করেছে। এ বাজেট জনগণের ওপর একতরফাভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতেই সরকারের একদলীয় মনোভাব, একগুঁয়েমি ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সকল বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সংসদে বাজেট পেশ করা হয়েছে। বাজেটের ওপর আমাদের আলোচনা করার সুযোগও সরকার দিচ্ছে না। আমাদের সংসদে যাবার পথ সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এ বাজেট একদলীয় বাজেট। সুতরাং, এ বাজেটের কারণে দেশে যদি কোথাও কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সকল দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। জনগণ এর দায়দায়িত্ব বহন করবে না।"

৪২০। ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখ রাত সাড়ে ৯টায় সংসদ ভবনে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদের সকল সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও দলনিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন দাবি এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সম্বলিত এক ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান। তার আগে, সংসদ ভবনে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রীর কক্ষে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে প্রস্তাবিত দাবি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসম্বলিত ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত রূপ প্রদান করা হয়। শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, মহিউদ্দিন আহমদ, সালাউদ্দিন ইউসুফ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, আবদুল মতিন খসরু ও আ. স. ম. ফিরোজ, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ডঃ টি. আই. এম. ফজলে রাব্বি ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আবদুস সোবহান ও শেখ আনসার আলী, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী।

৪২১। ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের পক্ষে ঘোষিত ঐ ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধে বলা হয় ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"(১৯৭১-এর) মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ বার বার বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক একটি সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু, আমাদের দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক চর্চা যেহেতু এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার তাগিদ এখন একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বিরোধী দলসমূহ সংসদে তিনটি বিলও পেশ করেন এবং ঐ বিলসমূহ আলোচনার জন্য দাবি জানান। কিন্তু, সরকার তাতে কোন সাড়া দেননি। তারপর, বিরোধী দলসমূহ ২৬শে জুন (১৯৯৪) তারিখের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনকল্পে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু, সরকার সেই বিল না এনে সংসদকে আরও অকার্যকর করে দেন এবং অগণতান্ত্রিক ও একগুঁয়েমী মনোভাব নিয়ে আজ জাতিকে গভীর সংকটে নিমজ্জিত করেছেন।"

৪২২। ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের পক্ষে ঘোষিত ঐ ঘোষণাপত্রে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "(১) একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে সাথে প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। (২) রাষ্ট্রপতি ঐ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধান মন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন। (৩) (ঐ) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। (৪) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানপ্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। (৫) রাষ্ট্রপ্রতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে (সংসদের) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (৬) সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪২৩। ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখে ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসম্বলিত ঐ ঘোষণাপত্রে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য নিম্নোল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের দাবি করা হয় ঃ "(১) নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করতে হবে। (৩) উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।" ঐ ঘোষণাপত্রের উপসংহারে বলা হয়ঃ "এ রূপরেখা বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় সংসদে সকল বিরোধী দল আজ ঐক্যবদ্ধ। সরকার যেহেতু সংবিধান সংশোধন বিল আনতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সকল বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছেন, সেহেতু এ রূপরেখা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে আমাদের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না এবং এ রূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত জনগণের এ আন্দোলন চলবে। আজ আমরা দেশের রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং সকল শ্রেণীর জনগণকে এ আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।" এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখে ঘোষিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা'য় যেসব ব্যক্তির সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে তাঁরা কেবল আন্দোলনরত দলগুলোর পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং এক্ষেত্রে সরকারী দলের কোন ভূমিকাই থাকবে না। এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে আপত্তিকর মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, মনোনয়ন দানের প্রথা গণতন্ত্রের রীতিনীতিপরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের নির্বাচনে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সরকারী দলের কোন ভূমিকা না রাখার প্রস্তাব গণতান্ত্রিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এসব ছাড়াও, বিরোধী দলগুলোর ঘোষণায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে সেটা একটি এ্যাডহক ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হয়। গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের স্বার্থেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও একরূপ নির্বাচিত সত্তা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪২৪। ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন দাবি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসম্বলিত ঘোষণাপত্র পাঠ সম্পন্নের পর সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের বক্তব্যও রাখেন। সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ হাসিনা বলেন, "আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্র এসেছিলো। আশা করা হয়েছিলো যে, দেশে শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা আসবে, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। কিন্তু, গত সাড়ে তিন বছরে সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছে স্থবিরতা, শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হয়েছে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।" তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "কালো টাকা, অস্ত্র ও সন্ত্রাস যাতে নির্বাচন বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক না হতে পারে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা রেখে যাওয়ার লক্ষ্যেই একটি সাংবিধানিক বিধান প্রণয়নের জন্য এই রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে।"

৪২৫। ২৭শে জুন (১৯৯৪) তারিখে সংসদ ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সম্বলিত ঘোষণাপত্র পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, "গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সংসদের সকল বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সরকারের ব্যর্থতার কারণেই বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। এই রূপরেখা জাতির জন্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।" ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "সুস্থ রাজনীতির বিকাশ ও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। নির্বাচনকে দলীয় সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত করার প্রয়াসে বিরোধী দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেছে। সরকার বিরোধী দলকে সংসদের ইস্যু রাজপথে আনতে বাধ্য করেছে।" ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষিত রূপরেখা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীদের প্রণীত একটি রূপরেখা। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সংসদে উত্থাপন, আলোচনা ও সুরাহা করতে চেয়েছি। কিন্তু সরকার সে সুযোগ দেয়নি। এ অবস্থার জন্য বর্তমান বিএনপি সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে।" একই সাংবাদিক সম্মেলনে গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "বিরোধী দল ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা এখন একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দলিল। আগামীতে এই রূপরেখা একটি ঐতিহাসিক সাংবিধানিক দলিলে পরিণত হবে।"

৪২৬। ২৯শে জুন (১৯৯৪) বুধবার প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সকল বিরোধী গ্রুপের সংসদ বর্জনের মধ্যেই আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ বিএনপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের পক্ষে সংসদে পেশ করেন 'নির্বাচন আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) বিল (১৯৯৪)'। ঐ বিলের কারণ ও উদ্দেশ্যসম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয় ঃ "বিদ্যমান নির্বাচন আইন সংশোধন করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে উন্নততর করতে নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে নির্বাচনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা অর্জনই এই বিলের লক্ষ্য।" ঐ বিলে প্রস্তাব করা হয় ঃ "নির্বাচন কমিশন নিজের কর্মকাণ্ড নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবে। নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন তৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে পারবে। (ছবিসহ) বৈধ পরিচয়পত্র দেখানোর আগে প্রিসাইডিং অফিসার কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার দিতে পারবেন না। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রই হবে 'বৈধ পরিচয়পত্র'। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিন থেকে ফলাফল প্রকাশের পর ১৫ দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া জেলা জজের চেয়ে নিচের পদমর্যাদার জুডিশিয়াল অফিসার, সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ অথবা তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বদলি করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন অনুরোধ জানালে অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার অথবা তাঁদের অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে জেলার বাইরে বদলি করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য যেসব ব্যক্তিদের নিয়ে প্যানেল করা হবে, রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া তাঁদের জেলার বাইরে বদলি করা যাবে না।"

৪২৭। ২৯শে জুন (১৯৯৪) তারিখে বিএনপি সরকার কর্তৃক সংসদে পেশকৃত 'নির্বাচন আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) বিল (১৯৯৪)'-এর বিভিন্ন বিধি-বিধানে আরও বলা হয় ঃ "নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে, কোথাও নির্বাচন আইনবিরোধী কাজ হচ্ছে, তাহলে নির্বাচন কমিশন যে কোন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন যে কোন পর্যায়ে স্থগিত করে পারবেন। নির্বাচন কমিশন সরকারী কর্মকর্তা, সরকার নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন।" ঐ বিলে 'ইলেকটরাল ইনকোয়ারি কমিটি' নামে একটি নির্বাচন তদন্ত কমিটি গঠনের বিধান করার প্রস্তাবও করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ। নির্বাচন কমিশন জুডিসিয়াল কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে ঐ কমিটি গঠন করবে। ঐ কমিটি নির্বাচন সম্পর্কিত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সুপারিশ করতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনকে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার কোন প্রস্তাব রাখা হয়নি উল্লিখিত 'নির্বাচন আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) বিল (১৯৯৪)'-এ। অথচ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যই নির্বাচন কমিশনকে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা একান্ত অপরিহার্য।

৪২৮। ১১ই জুলাই (১৯৯৪) তারিখে জাতীয় সংসদের ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্য সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের অব্যাহত সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জাতির ইতিহাসে এটিই ছিলো প্রথম এ ধরণের ঘটনা যেখানে বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর কোনও সাংসদ সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল ও গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্বে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, সরকারী দল বিএনপি দেশে সংসদের ভবিষ্যত সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধন বিল না আনা পর্যন্ত তাঁরা সংসদের কোনও অধিবেশনে যোগদান করবেন না। ঐ ঘোষণার পর সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের সাংসদরা ইতিপূর্বে ৪ঠা থেকে ১১ই মে (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। তারপর থেকে ৬ই জুন (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত সময়কালে সংসদ বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে একটি সন্তোষজনক সমাধান ও ঐকমত্যে পৌঁছে তাঁদেরকে সংসদের অধিবেশনে যোগদানে সম্মত করানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তাছাড়াও, ৬ই জুন (১৯৯৪) তারিখে বাজেট অধিবেশন শুরুর পরও সরকারের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণের কিংবা কোন প্রয়াস চালানোর কোন লক্ষণও পরিদৃষ্ট হয়নি। এমন কি, বাজেট অধিবেশন চলাকালেও সংসদ বর্জনকারী বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতাদের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে সমঝোতার আসার নিমিত্তে আলাপ-আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার নির্দ্বিধায় বাজেট অধিবেশনের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংসদ অধিবেশন সম্পন্ন করে সংসদে সকল বিরোধী দলীয় সাংসদদের অনুপস্থিতিতেই। বিএনপি সরকার ও তার নেতৃত্বের সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের প্রতি ঐ অবজ্ঞাসূচক আচরণের ফলে সরকারী এবং বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার সম্পর্ক শুধু তিক্ত থেকে তিক্ততরই হয়নি, দেশের রাজনীতি আরও বেশী সংঘাতমুখী হয়ে পড়ে। ঐ পরিস্থিতি যে বহু সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলতে পারে সে কথা চিন্তা করে জনমনেও সৃষ্টি হয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। জনমনে অনেক আশা ছিলো যে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজেকে দলের বিশেষ গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই উদার মন নিয়ে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে একটি সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে বের করতে। সে মনোভাব নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলে অনেক আগেই হয়তো সকল বিরোধ ও তিক্ততার নিরসন হতো। কারণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে এমন কোন কঠিন সাংবিধানিক বাধা বা সমস্যা নেই যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন শুধু উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মন-মানসিকতা। সেখানে কোন উদার মনোভাবের প্রদর্শন না করে এবং সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোকে জাতীয় বাজেট অধিবেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগদান থেকে বঞ্চিত করে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু সংকীর্ণতারই পরিচয় দেননি, দেশের রাজনৈতিক সংকটকেও আরও ঘনীভূত ও ভয়াবহ করে তোলেন।

৪২৯। ২৬শে জুলাই (১৯৯৪) তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাত ঃ ঢাকা ও চট্টগ্রামে সরকারী বরাদ্দ হ্রাস; খুলনা ও রাজশাহীতে বৃদ্ধি" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঐ সংবাদে বলা হয় ঃ "ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে সরকারী বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, খুলনা ও রাজশাহী কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।" ঐ সংবাদে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে সরকারী বরাদ্দ ছিলো ৩৪ কোটি টাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে সরকারী বরাদ্দ ছিল ২৪ কোটি টাকা। কিন্তু, ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দুটোর উন্নয়ন খাতে সরকারী বরাদ্দ যথাক্রমে ২৫ কোটি ও ২০ কোটি টাকায় কমিয়ে আনা হয়। পক্ষান্তরে, ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে ১৬ কোটি টাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে ১৪ কোটি টাকা সরকারী বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সালের অর্থবছরে খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন দুটোর উন্নয়ন খাতে সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১৮ কোটি ও ১৬ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়। অনেকের ধারণা যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দুটোর মেয়রদ্বয়সহ এ দুটোর নিয়ন্ত্রণ বিরোধী দল আওয়ামী লীগের করায়ত্ত হওয়ায়, অন্য কোন কারণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই দুটো সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে সরকারী বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে কমানো হয়।

৪৩০। ২৭শে জুলাই (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যতে সংসদের সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে রাজধানী ঢাকার পান্থপথে এক জনসভার আয়োজন করে। সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত ঐ জনসভাটি ছিলো সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় জনসভা। পান্থপথের সুপ্রশস্ত চত্বর জনভারে উপচে পড়ে। পূর্বে সার্ক ফোয়ারা ছাড়িয়ে দু'পাশে বাংলা মোটর ও কাওরান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজার পর্যন্ত এয়ারপোর্ট রোড, দক্ষিণমুখী সোনারগাঁও সড়ক এবং পশ্চিমে গ্রীনরোড অবধি পান্থপথের দু'পাশ ছিলো জনতায় ঠাসা। সভাস্থলের আশেপাশের ভবনগুলোর ছাদ থেকেও বাসিন্দাদের ঐ জনসভা প্রত্যক্ষ করতে দেখা যায়। উপস্থিত জনতার করতালি ও শ্লোগানের মধ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "আজ থেকে প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগের এক দফা, এক দাবির আন্দোলন শুরু হলো। অযোগ্য, ব্যর্থ, দুর্নীতিবাজ, জনগণের ভোটাধিকার হরণকারী বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।" তারপর, ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের গণআন্দোলন, বিশেষ করে, ঐ বছরের ৬ই নভেম্বরে এই পান্থপথে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাঁর সে সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ঘোষিত প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "আমি চেয়েছিলাম বাংলার মানুষ তার ভোটাধিকার পাক। ক্ষমতার উৎস জনগণ। ক্ষমতায় কে বসবে না বসবে তার মালিক জনগণ। সেজন্যই সেদিন আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছিলাম। বিএনপি ক্ষমতায় যাবার পর দেখলাম যে, তারা গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে না। গণতন্ত্রের চর্চা জানে না। জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের পর লালবাগে ভোটারদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনেও জনগণের প্রদত্ত রায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সংসদের মাগুরা-২ আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জনগণের ভোট ডাকাতি করা হয়েছে।"

৪৩১। ২৭শে জুলাই (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার পান্থপথে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণের এক পর্যায়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "ক্ষমতাসীনরা আজ দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করছে। দুর্নীতির মাধ্যমে কালো টাকা করে আগামী নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কালো টাকা দিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলতে চায়। আমরা যে কারণে ১৯৯০-তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছিলাম, আজকে বিএনপি সরকার যেভাবে জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, দুর্নীতি করছে, জনগণের ভাগ্য নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া যায় না বলেই আবার আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছি।" ঐ জনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "দুর্নীতি দূর করার জন্য, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। কেননা, সরকার যদি জানে তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে জনতার কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তাহলে দুর্নীতি হবে না, জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না। পক্ষান্তরে, সরকার যদি জানে যে, ক্ষমতায় থেকে কালো টাকা ও সন্ত্রাস দিয়ে নির্বাচনে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে, তাহলে কোনদিনই দেশ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্নীতি দূর হবে না।" তাঁর ভাষণের শেষে ঐ জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন এক দফা এক দাবি এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যত সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচী। ঐ ঘোষণায় ২৭শে থেকে ৩০শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত দেশের থানাগুলোতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সমাবেশ, ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে দেশের জেলা প্রশাসন কার্যালয়সমূহ ঘেরাও এবং ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী 'ঢাকা নগর অবরোধ' কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

৪৩২। ১৫ই আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলো কর্তৃক আয়োজিত ব্যাপক কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঊনবিংশতম শাহাদাত বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। অতীতের সরকারগুলোর মতো প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কোন সরকারী স্বীকৃতি না দিলেও, আওয়ামী লীগের আহ্বানে জনগণ এ দিবসটিকে 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবেই গণ্য করে। বিগত কয়েক বছরের মতো এবারো আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিলো তা বাতিল, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং হত্যা ও ক্যুর রাজনীতির চিরঅবসানের দাবিতে ঐ দিবসে সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। অতীতে, এই দিন ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাসহ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী ও বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবনের অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যুব-ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতা ও কর্মীবৃন্দ এবং যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, হাজার হাজার নরনারী অতি প্রত্যূষ থেকে বনানী কবরস্থানে গিয়ে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও কর্নেল জামিলসহ অন্যান্য শহীদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তারপর ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার (পুরাতন) ৩২ (নতুন ১১) নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' গিয়ে সেখানে সংরক্ষিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পবিত্র স্মৃতির ও বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। কিন্তু, ঐদিন আওয়ামী লীগ আহূত অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচী পালনের কারণে ঢাকায় বনানী কবরস্থান ও ধানমণ্ডিস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবনে'র সেসব অনুষ্ঠান অনেকাংশে বিঘ্নিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩৩। ১৫ই আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগ আহূত সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচীর পর ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা ও কর্মীবৃন্দসহ বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যুব-ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক ইত্যাদি সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা ছাড়াও যুব-বৃদ্ধ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী বনানী কবরস্থানে গিয়ে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাতে নিহত তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন সামরিক সচিব কর্নেল জামিল ও অন্যান্য শহীদদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখান থেকে তাঁরা ঢাকার ধানমণ্ডির (পুরাতন) ৩২ (নতুন ১১) নম্বর সড়কস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর পুণ্য স্মৃতি ও বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঐদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর মাজারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও হাজার হাজার শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী এবং যুব-বৃদ্ধ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সারাদিন বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু, জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার অতীতের লেঃ জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারগুলোর মতো এবং নিজের শাসন আমলের বিগত বছরগুলোর মতো সেবারো বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় রেডিও-টেলিভিশন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে তাঁর সম্পর্কে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি দেয়নি।

৪৩৪। সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দল ও গ্রুপের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবিতে অব্যাহত সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে সংসদের বাজেট অধিবেশন ১১ই জুলাই (১৯৯৪) তারিখে সমাপ্ত হওয়ার পর এক মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, ঐ দীর্ঘ সময়েও ক্ষমতাসীন বিএনপি দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলগুলোর দাবির ব্যাপারে একটি সাংবিধানিক সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনরূপ উদ্যোগ নেওয়া বা প্রয়াস চালানো হয়নি। সরকারপ্রধান, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর বিএনপি দলের মন্ত্রীরা ও নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির প্রতি রইলেন সম্পূর্ণ উদাসীন, নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। বিরোধী দলগুলোর দাবির প্রতি ঐ মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার জনগণকে বোঝাতে চাইলেন যে, বিরোধী দলগুলোর দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অব্যাহত সংসদ বর্জন ও আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে দেশে কোনও রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকট সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু, দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক সচেতন ও দেশপ্রেমিক মানুষের চিন্তা-চেতনা ছিলো বিএনপি সরকারের ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটে তাঁরা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় হয়ে পড়েন দারুণ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। তাই তাঁরা মনে করেন যে, অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষায় বিএনপি সরকারের উচিত উদার ও নিঃস্বার্থ মন নিয়ে সংসদ বর্জন ও আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে আলাপ-আলোচনায় বসা এবং যথাশীঘ্র সে ব্যাপারে একটি সাংবিধানিক সমাধানে পৌঁছানো। রাজনৈতিক সচেতন ও দেশপ্রেমিক জনগণের সে চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে বিরোধী দলগুলোর, বিশেষ করে, সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে তাদের বিপুল সমর্থন প্রদান ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

৪৩৫। এরকম এক পরিস্থিতিতে সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনের জন্য নির্ধারণ করা হয় ৩০শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে সংসদ বর্জন ও আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলোকে সংসদের ঐ অধিবেশনে যোগদানে যাতে প্রভাবিত করা যায় সেজন্য সরকার আগস্ট মাসের শেষের দিকে এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে। দেশের নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণসহ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে সরকার পক্ষ সংসদের বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক, সে মর্মে কিছু সংবাদ সে সময় দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল ও গ্রুপগুলো সরকারের সঙ্গে সে ব্যাপারে সংলাপ অনুষ্ঠানে সম্মতি ব্যক্ত করলেও, ২৫শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ করা কিংবা তাঁদের কাছে কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। ঐ প্রেক্ষাপটে ২৬-২৭শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের এক দু'দিনব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের ঐ সভায় দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি ছাড়াও, ৩০শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনে দলের যোগদান করা না করার প্রশ্ন এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে দলের ইতিপূর্বে ঘোষিত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের ঐ সভার শেষদিন ২৭শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগের ৩০শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের ঐ সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার শত শহীদের রক্তে অর্জিত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আসছে। জাতীয় সংসদকে অকার্যকর এবং বিরোধী দলের সংসদে যাবার পরিবেশ ও পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। সরকার ভোটারদের জীবনের নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকার সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে নিমজ্জিত। বিএনপি সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের বল্গাহীন ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত। হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। অথচ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদকে কার্যকর, ভোটারদের জীবনের নিরাপত্তা দান, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, ভোট ডাকাত সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) শনিবার পূর্বঘোষিত 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীকে সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।"

৪৩৬। ২৯শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখ সোমবারে সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বিএনপি দলীয় সরকার সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংসদে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন বিল আনার ব্যাপারে সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর দাবি প্রত্যাখ্যান করার প্রেক্ষিতে সংসদ অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ঐ দিন সংসদে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পার্টির সংসদীয় দলের সভায়ও সংসদ অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই দিনে, সংসদের অপর বিরোধী গ্রুপ জামাতে ইসলামীর সর্বোচ্চ কমান্ড 'কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার' ঢাকায় উপস্থিত সদস্যদের এক বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবেও বিএনপি দলীয় সরকার সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংসদে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন বিল না আনা পর্যন্ত সংসদের অধিবেশনে দলীয় সাংসদদের অংশ গ্রহণ না করার পূর্বের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩৭। ৩০শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখ বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশন শুরু হয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য বিরোধী দল ও গ্রুপের সাংসদদের অব্যাহত সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে। বিএনপি সরকার সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন বিল সংসদে উপস্থাপন না করা পর্যন্ত সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সংসদ অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশন শুরু হয় কেবল সরকারী দল বিএনপির মাত্র ৬২ জন সাংসদের উপস্থিতিতে। উল্লেখ্য যে, সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের শেষের দিক থেকে শুরু করে সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদের পর পর চারটি অধিবেশন বর্জন করেন সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্য সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের সাংসদগণ। তার আগের দুটো সংসদ অধিবেশনের দিনগুলোর মতো সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপের সাংসদদের অনুপস্থিতিতেই ষষ্ঠদশ অধিবেশনের ঐ দিনের বৈঠক সংসদে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন সংশোধন বিল উপস্থাপন এবং জামাতে ইসলামীর কতিপয় সাংসদ কর্তৃক ইতিপূর্বে সংসদ সচিবালয়ে জমা দেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারী দলের কয়েকজন সাংসদের প্রস্তাব উত্থাপন ও সেসবের ওপর আলোচনার হাস্যকর ঘটনার মধ্য দিয়ে মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

৪৩৮। ৩১শে আগস্ট (১৯৯৪) তারিখে সংসদের বৈঠক মুলতবির পর, সংসদ উপনেতা বিএনপির অধ্যাপক এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন যে, ঐদিন সকাল ১১টায় তিনি সংসদের অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদের বাসায় গিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক হয়। অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাংবাদিকদের আরও জানান যে, ঐ বৈঠকে তিনি সংসদের অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বিরোধী দলীয় প্রস্তাব এবং ইতিপূর্বে সংসদে সরকার উপস্থাপিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধি আইনের সংশোধন বিল নিয়ে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেন। ঐদিন রাতে, সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ সে বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, "সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী আমার বাসায় এসেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি যে, আলোচনা করতে আমাদের আপত্তি নেই। সরকারী দলের প্রস্তাব নিয়ে নেত্রী (আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা) এবং সংসদের অন্যান্য বিরোধী দল ও গ্রুপের সাথে আলোচনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত সরকারী দলকে জানাবো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩৯। ১লা থেকে ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে বিএনপির ষষ্ঠদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার 'জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে' আয়োজিত 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিএনপি' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বিএনপির সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বিএনপির মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারসহ বিএনপির বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী ও নেতা সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল ও গ্রুপের জাতীয় সংসদের ভবিষ্যত সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবিকে অযৌক্তিক ও সংবিধানপরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন। তাছাড়াও, তাঁরা আওয়ামী লীগের ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত শাসন আমলের অনেক ঘটনার এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) শনিবার সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে তাঁর অফিস কক্ষে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা এবং সে সময়ে ভারপ্রাপ্ত নেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, "সরকারী দল বিএনপি তাদের ইতিপূর্বে প্রদত্ত সংলাপ প্রস্তাব থেকে পিছটান দিচ্ছে। বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসন নয়, সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংলাপের নামে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিরোধী দল ঘোষিত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।" তারপর, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারী দলের নেতৃবৃন্দের বিগত তিন দিনের বক্তব্য-বিবৃতির উল্লেখ করে আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, "সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী আমাদের সাথে সংলাপ শুরু করার পর সরকারী দলের মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার এক অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির ব্যাপারে বলেছেন, 'আমরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে ছাড় দেবো না', 'আমরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংসদে বিল আনবো না। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এ সম্পর্কে বলেছেন, 'বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানলেও আমি মানবো না।' আর আমাদের সাথে সংলাপকারী স্বয়ং অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের দাবিকে 'আজগুবী ব্যাপার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সরকারী দলের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের এসব বক্তব্য প্রমাণ করে যে, সরকারী দল বিএনপি সংলাপের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ, আমরা বিরোধী দল থেকে সব সময় আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেছি যে কোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে। কিন্তু, বিএনপি সরকার অতীতে কখনও আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। এবারও আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছে না।" পরিশেষে, ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী সফল করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমরা আন্তরিক থাকলেও, বিএনপি সরকার এ ব্যাপারে আন্তরিক নয়। তাই, আমরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলনে আছি। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে কোন মূল্যে এ কর্মসূচীকে সফল করতে হবে।"

৪৪০। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ রোববার বিকেল ৫টা ২০ মিনিট থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ভবনে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের কক্ষে দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারী দল বিএনপির নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সরকারী দল বিএনপির পক্ষ থেকে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, দলের মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী এবং জামাতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা ও জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আবদুস সোবহান, এমপি, শেখ আনসার আলী, এমপি এবং জামাতে ইসলামীর দু'জন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। বৈঠক শেষে, বিএনপির ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, "সংসদের নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি এবং নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে জোরদারকরণ সম্পর্কিত সরকারী প্রস্তাবনা নিয়ে আমরা ভালো পরিবেশে আলোচনা ও মতবিনিময় করেছি।" সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে ১লা থেকে ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে জাতীয় যাদুঘরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী আলোচনা সভার দ্বিতীয় দিনে তাঁর বক্তৃতায় সংসদের ভবিষ্যত সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিকে 'আজব প্রস্তাব' হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর সে মন্তব্যসহ অন্যান্য কতিপয় মন্ত্রীর বক্তব্য 'আলোচনার পরিবেশকে বিনষ্ট করেছে বলে যে অভিযোগ করেছেন', সে সব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি (ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী) বলেন, "আমার সেদিনের বক্তব্য কিছু পত্রিকায় মিসরিপোর্টিং হয়েছে। অন্য রিপোর্টাররা ছিলেন—তাঁরা শুনেছেন আমি সেদিন কি বলেছি।" জামাতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বিএনপির সাথে ঐ বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, "সংসদের নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি এবং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত সরকারী দলের প্রস্তাবনা নিয়ে খোলামেলা মতবিনিময় হয়েছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এই মতবিনিময় হলো।" তারপর, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ বর্জন ও আন্দোলনরত সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের সাথে ঐ বৈঠক সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন কথাবার্তা হয়েছিলো কি-না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমরা কম্বাইন্ড বিরোধী দলের জ্ঞাতসারে বিএনপির সাথে খোলামেলা আলোচনায় বসেছি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের সিমেন্টেড (শিলাদৃঢ়) ঐক্য রয়েছে।"

৪৪১। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ রোববার রাত ৭টা থেকে সোয়া ৯টা পর্যন্ত সংসদ ভবনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সভাকক্ষে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন আহমদ, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রহিম, মোহাম্মদ নাসিম ও বেগম মতিয়া চৌধুরী, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মনিরুল হক চৌধুরী, ডঃ টি.আই.এম. ফজলে রাব্বী ও এডভোকেট ফজলে রাব্বী এবং জামাতে ইসলামীর মাওলানা আবদুস সোবহান, শেখ আনসার আলী ও শাহ রুহুল কুদ্দুস এবং এনডিপির একমাত্র সাংসদ সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ঐ বৈঠক শেষে সেখানে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "দীর্ঘ ছয় মাস ধরে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংসদে সরকারী দলের পক্ষ থেকে বিল আনার দাবিতে সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য গ্রুপ সংসদ বর্জন করে আসছে। এই দাবিতে সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। সরকার সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের প্রশ্নে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলো সব সময় যুক্তিসঙ্গত পথ ও পদ্ধতিতে এর সুষ্ঠু সমাধান চেয়েছে। সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলো মনে করে যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলো এই প্রশ্নে খোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকারী দল বিএনপির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার প্রত্যাশী ছিলো। জাতি যখন আশা করেছিলো যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে সরকার এবং সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে একটি সমঝোতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারসহ সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় দলীয় নেতার অসংলগ্ন ও দায়িত্বহীন বক্তব্য সংলাপের সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।" ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "সরকারের সংলাপের প্রস্তাব ছিলো লোক দেখানো ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।" পরিশেষে, ঐ বৈঠকে সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর গৃহীত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সংসদের বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী যে কোন মূল্যে সফল করা হবে এবং বিএনপি সরকার সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন বিল না আনা পর্যন্ত সংসদ বর্জন ও রাজপথের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

৪৪২। ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সোমবার সংসদ ভবনে জাতীয় পার্টির সংসদীয় গ্রুপের কক্ষে রাত পৌনে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে ক্ষমতাসীন বিএনপির নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার এবং বন ও পরিবেশমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন এবং জাতীয় পার্টির পক্ষে পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, এমপি, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি, মনিরুল হক চৌধুরী, এমপি এবং দলের মহাসচিব খালেদুর রহমান টিটো। বৈঠক শেষে, সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের জানান, "আলোচনা আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের মনোভাব জানতে পেরে আমরা খুশী। তাঁরা জানিয়েছেন যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে 'পার্টি-টু-পার্টি' যে আলোচনা চলছে, তাঁরা এ প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী নন। সংসদের সকল বিরোধী দল ও গ্রুপ সম্মিলিতভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে কথা বলতে চান। এটা আমাদের জানার দরকার ছিলো। সেটা আমরা জেনে গেলাম।" ঐ বৈঠক শেষে আলাদা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে কেবলমাত্র জাতীয় পার্টি ও বিএনপি এ দু'টি দলের মধ্যে আলোচনা করতে চাই না। আমরা আমাদের এ বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দিয়েছি। আমরা বলেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে 'পার্টি-টু-পার্টি' আলোচনার কোন অবকাশ নেই।" ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী সাংবাদিকদের আরও বলেন, "সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর সাথে আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু করার পরও বিএনপি সরকার যে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর নিবর্তনমূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছেন, পার্টির সেক্রেটারী জেনারেলসহ শতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করেছেন, বৈঠককালে বিএনপি নেতাদের সেসব সম্পর্কেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

৪৪৩। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সদস্যদের সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য নিবন্ধীকরণ অভিযান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে তাঁর ভাষণের শুরুতে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গৃহীত দলীয় কৌশল ব্যাখ্যা করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আন্দোলনের পাশাপাশি আলোচনা চলতে পারে। আমরা সংকট নিরসনের জন্য সংলাপ করতে চেয়েছি। এর জন্য আমাদের সংসদীয় দলের উপনেতা সরকারের সংসদীয় দলের উপনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু বিএনপি সরকার আসলে সংকটের সমাধান চায় না। বিএনপি সরকার যদি অর্থবহ সংলাপ চাইতো, তাহলে তারা সমস্যার সমাধানের দিকে এগুতো। তারা সমাধান নয়, বরং সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে চায়। আসলে তারা সংলাপ ও আলোচনা চায় না—সংলাপের নামে 'নাটক' করতে চায়। আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীকে সামনে রেখে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই নাটক।" তারপর, জাতীয় সংসদের পরবর্তী সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার বিরোধী দলের দাবিকে মেনে নেওয়ার জন্য বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জনগণের দাবি। জনগণের দাবি মেনে নেওয়ার মধ্যে কোন গ্লানি নেই। আপনাদের রাজনীতি যদি জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে হয়ে থাকে, এই গণদাবি মেনে নিন।" তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে দলের ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী বানচাল করতে নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ঢাকায় যাতে লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাগম না হয়, সেজন্য সরকার নানা ধরনের কলাকৌশল অবলম্বন করছে। পুলিশ দিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন দাবানোর ষড়যন্ত্র করছে। যদি জনতার ওপর লাঠির আঘাত করা হয়, একটি গুলিও ছোঁড়া হয়, তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে বিএনপি সরকারই দায়ী হবে। জনগণের ওপর অত্যাচার চালানো হলে সেপ্টেম্বর মাসই হবে বিএনপি সরকারের শেষ মাস।"

৪৪৪। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সদস্যদের সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য নিবন্ধীকরণ অভিযান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণের আর এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী সফল করতে যে যে পদক্ষেপ প্রয়োজন তা গ্রহণ করবেন। আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এবং জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে। সংগ্রাম ছাড়া কোন দাবি আদায় হয়নি। তাই সংগ্রাম করেই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি আদায় করতে হবে।" তারপর, জনগণের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও-টিভিসহ প্রচার মাধ্যমের বয়ানে বিভ্রান্ত হবেন না। এ দেশের রাজনীতিতে প্রচার 'মিডিয়া'কে ব্যবহার করে একটা নোংরা খেলা চালানো হচ্ছে। এই খেলার মাধ্যমে আন্দোলনকে নষ্ট করার চেষ্টা চলবে। আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলবে।" ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণের শেষাংশে শেখ হাসিনা বলেন, "সঠিকভাবে দেশ চালাতে যে সমঝোতা ও সিদ্ধান্ত দরকার, বিএনপি সরকার তা দিতে পারছে না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে না। প্রশাসন অচল। বিএনপি সরকার একগুঁয়েমি করে দেশ চালাতে চাচ্ছে। কিন্তু, এভাবে দেশ চলে না। সংসদে যাবার পথও বিএনপি সরকার রুদ্ধ করে দিয়েছে। তাই আন্দোলনের মাধ্যমে দুর্ভোগ থেকে মুক্তি, গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা আনার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি কার্যকর করবো। আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।"

৪৪৫। ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকার 'রমনা পার্কের' বটমূলে আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এক দু'দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের ঐ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তৎকালীন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং সে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী সফল করার জন্য ছাত্র সমাজ তথা জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "ক্ষমতাসীন বিএনপি যাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়, দেশে সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বর্তমান দুর্নীতিবাজ, ভোট ডাকাত, ওয়াদা ভঙ্গকারী বিএনপি সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে।" তারপর বিএনপি সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, "সরকার দমননীতি চালিয়ে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী বানচালের চেষ্টা করলে, তার ফল শুভ হবে না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে জনতার রুদ্ররোষে বিএনপি সরকারের 'তখতেতাউস' ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।"

৪৪৬। সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপ আহূত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের রাজধানী 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী বানচালের উদ্দেশ্যে বিএনপি সরকার নানান অপকৌশল অবলম্বন করে। ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন মুলতবি করে বিএনপি সরকার দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দেয় স্ব স্ব এলাকায় গিয়ে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানোর জন্য। একই উদ্দেশ্য, সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বরত মন্ত্রী বাদে অন্য মন্ত্রীদের স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে, সরকার ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর আহ্বানকারী সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপ, বিশেষ করে, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিশেষ বিশেষ নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। সরকারের সে নির্দেশের প্রেক্ষিতে পুলিশ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির অনেক নেতা ও কর্মীর বাড়িতে বাড়িতে হামলা চালায় এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড কমিশনারদের নানানভাবে হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সরকারী দল বিএনপির সমর্থক কতিপয় শ্রমিক নেতা সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের নিয়ে ঢাকার সায়েদাবাদ, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, মহাখালী ও গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালসহ ঢাকা নগরীর অন্যান্য প্রধান প্রধান বাস টার্মিনালে গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, বাস-ট্রাক ভাংচুর ইত্যাদি সহিংস ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। সরকারী দল বিএনপির সমর্থক সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সেসব সহিংস ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় অনেক বাস-ট্রাক মালিক এবং শ্রমিক আহত হন। সেসব ঘটনার প্রেক্ষিতে বাস-ট্রাক মালিক ও শ্রমিক সমিতিগুলো সব আন্তঃজেলা সড়ক রুটসহ ঢাকা নগরীর অভ্যন্তরীণ অনেক রুটে বাস-ট্রাক চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। তার ফলে, ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখে রাজধানী ঢাকা নগরীর অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং ঢাকার সাথে বাইরের এলাকাসমূহের সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। সরকার একই কৌশলে নদীপথের যাতায়াত ব্যবস্থায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ঐদিন আওয়ামী লীগ, দলের পূর্ব-ঘোষিত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীকে বানচালের উদ্দেশ্যে দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের প্রশাসন ও পুলিশ দিয়ে হয়রানি ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের দিয়ে পরিকল্পিতভাবে ঢাকার সাথে বাইরের এলাকাসমূহের সংযোগকারী পরিবহণ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টির অপ্রয়াসের প্রতিবাদে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনের সাথে ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখেও সারা ঢাকা শহরে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।

৪৪৭। সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য গ্রুপ আহূত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর প্রতিরোধে সরকার ঢাকা মহানগরীতে অন্যূন ১৫ হাজার আর্মড পুলিশ, দাংগা পুলিশ, বিডিআর ও আনসার মোতায়েনের ব্যবস্থা করে। ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের মধ্যরাত থেকে পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর লোকেরা ঢাকা নগরীর ২৬টি স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে অবস্থান নেয়। একই সংগে, সরকার সচিবালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৪৪৮। ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সকাল থেকেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে জনসাধারণ বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবিতে আহূত 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য রাজধানী ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় নেমে পড়েন। ঐ কর্মসূচী পালনকালে ঢাকার দোয়েল চত্বর, কার্জন হল, শিশু পার্ক, স্টার গেট, মৎস্য ভবন, প্রেস ক্লাব, চানখারপুল, নগর ভবন, গোলাপশাহ মাজার, পীর ইয়ামেনী মার্কেট, জিপিও, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, মগবাজার, মালিবাগ, কাকরাইল, কমিশনার ভবন, সেগুন বাগিচা, প্রীতম ভবন, বিজয় নগর, নয়া পল্টন, পুরানা পল্টন, গুলিস্তান, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ি প্রভৃতি এলাকায় পুলিশ জনতার মিছিলে নির্বিচারে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। বিশেষ করে, পুরানা পল্টন, পীর ইয়েমেনী মার্কেট, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, স্টেডিয়াম এলাকাসমূহে পুলিশ বিভিন্ন ভবনের ছাদে অবস্থান নিয়ে জনতার মিছিলে নির্বিচারে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। তাছাড়াও, সেসব এলাকার বিভিন্ন ভবনের কোণায় কোণায় ও দোকানপাটের ভেতরে হামলা ও তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ও দাংগা পুলিশ একে একে দুই শতাধিক লোককে ধরে এনে অবর্ণনীয় ও নির্মমভাবে প্রহার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অনেককে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নেয়। পুলিশ ছাড়াও, সরকারের সশস্ত্র মাস্তান ও সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনেরা পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জনতার মিছিলে গুলি বর্ষণ ও হাতবোমা নিক্ষেপ করে। সেসব ঘটনায়ও বহু লোক আহত হয়। ঐদিন পুলিশের নির্বিচার লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস শেল ও রাবার বুলেটের আঘাতে এবং সরকারের মাস্তান-সন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণে চার শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। তাছাড়াও, সেদিন বিভিন্ন মিছিল ও পথচারীদের মধ্য হতে পুলিশ প্রায় দুই শত জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঐদিন মৎস্য ভবনের কাছে পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটায় মাথায় মারাত্মকভাবে আহত হন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের চীফ হুইপ ও দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম এবং অপর আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক এমপি ফেরদৌস জামান মুকুল। ঐদিন বিজয় নগরে জাতীয় পার্টির মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করলে মাথায় মারাত্মকভাবে আহত হন পার্টির ঢাকা মহানগরীর সভাপতি ও পার্টি প্রেসিডিয়ামের সদস্য কর্নেল (অবঃ) এম. এ. মালেক।

৪৪৯। ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবিতে আহূত ঐদিনের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে দলীয় নেতা-কর্মী ও জনতার ওপর ক্ষমতাসীন বিএনপির মাস্তান-সন্ত্রাসী বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ ও পুলিশের হামলা, অমানবিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সোমবার রাজধানী ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী--এই পাঁচটি বিভাগীয় শহরে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত ৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ মংগলবারে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে আওয়ামী লীগ ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকায় সকাল ৬ টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত ৮ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। প্রেস ক্লাবে আয়োজিত ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, "ক্ষমতাসীন বিএনপির দলীয় সন্ত্রাস ও পুলিশের নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও আমাদের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী সফলভাবে পালিত হয়েছে। 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী সফল করার জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই।" তারপর 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে নগরীর বিভিন্ন স্থানে দলের নেতা-কর্মী ও জনতার ওপর সরকারী পেটুয়া বাহিনীর সহিংসতা ও পুলিশের নানাবিধ নির্যাতন-নিপীড়ন ও ব্যাপক ধরপাকড়কে ন্যক্কারজনক ঘটনা বলে তীব্র নিন্দা করে শেখ হাসিনা বলেন, "আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শনিবারের বিএনপি সরকারের আচরণ স্বৈরাচারের নামান্তর। আমাদের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী ছিল শান্তিপূর্ণ। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। কিন্তু বিএনপি সরকার এই নিয়মান্ত্রিক আন্দোলন মোকাবিলা করতে সহিংসতা করল। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিমকে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিপেটা করেছে। সাবেক এমপি ফেরদৌস জামান মুকুলসহ এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী অন্তত ৪/৫ শত নেতা-কর্মী ও জনসাধারণ আহত হয়েছে। প্রায় ২ শত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তেজগাঁও, টংগী, ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন অবরুদ্ধ জায়গায় জনতার ওপর হামলা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসেও হামলা করা হয়েছে।" ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবির যৌক্তিকতা পুনর্ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যেই আমরা এ দাবি করে আসছি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দিতে পারি না। গণতন্ত্রকে 'এই স্বৈরাচারে'র হাত থেকে আমরা রক্ষা করতে চাই। কেননা, বর্তমান বিএনপি সরকারের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও ভোট-ডাকাতি—স্বৈরাচারের এই বৈশিষ্ট্যগত আচরণেরই প্রতিধ্বনি।" ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের শেষাংশে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা সাংবিধানের সংশোধনী এজন্য আনতে চাচ্ছি, যাতে যারাই ভবিষ্যতে ক্ষমতায় থাকুক তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনে যাবে। এতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। জনগণই যে ক্ষমতার মূল নিয়ামক শক্তি তা নিশ্চিত হবে।" পরিশেষে, ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, "যতোক্ষণ পর্যন্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সংসদের সাধারণ নির্বাচন দেয়ার দাবি পূরণ না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।"

৪৫০। ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালন শেষ হবার পর বিকেলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে আয়োজিত এক জনসমাবেশে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবিতে আওয়ামী লীগ ঘোষিত আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর ঠিক অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তারপর, ঐ সমাবেশে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "সমাবেশ মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, মাস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনী ও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বিএনপি সরকার স্বৈরাচারী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। মূলত, এর মাধ্যমে বিএনপি সরকার রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয় মেনে নিয়েছে। সরকার হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে সংসদের একটি ইস্যুকে রাজপথে নিয়ে আনতে বাধ্য করেছে। সরকারকেই আজ সব দায়দায়িত্ব নিতে হবে।"

৪৫১। ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যায় মগবাজারস্থ জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী ঐ দিনের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে ক্ষমতাসীন সরকারী দলের ও পুলিশের নির্যাতনসহ সকল প্রকার অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ঘোষিত আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর ঠিক অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "আজকের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে পুলিশকে ভাড়াটিয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে এবং দলীয় মাস্তান বাহিনী দিয়ে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। শত নির্যাতন চালিয়েও জনগণের প্রাণের দাবিকে দমন করা যাবে না। সরকারের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে। বিরোধী দলের ঐক্য অটুট থাকবে এবং আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

৪৫২। ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দুটি গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথক আহ্বানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে পুলিশের নজিরবিহীন নির্যাতন, নিপীড়ন ও গ্রেফতার এবং বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সহিংস আক্রমণের প্রতিবাদে সারা ঢাকা শহরে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত ৮ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। নগরীর কয়েকটি স্থানে পুলিশের লাঠিচার্জ, নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস শেল ও রাবার বুলেটের আঘাতে এবং বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনদের সহিংস আক্রমণে ২৫ জন আহত হয়। হরতাল পালনকালে পুলিশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তা এবং শহরের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে হামলা চালিয়ে অনেক লোককে লাঠিপেটা ও ৫৭ জনকে গ্রেফতার করে। হরতাল চলাকালে রাজধানীতে সকল প্রকার দোকানপাট, বিপণীবিতান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা বন্ধ ছিল। সচিবালয়সহ সরকারী অফিস-আদালতে উপস্থিতির হার ছিল অতি নগণ্য। মহানগরীর কোন রুটে কোন ভারী যানবাহন, বাস, ট্রাক, লরি ইত্যাদি চলাচল করেনি। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে দূরপাল্লার কোন লঞ্চ ছেড়ে যায়নি। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কয়েকটি ট্রেন ছেড়ে গেলেও সেসবে যাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তেজগাঁও, পোস্তগোলা, ডেমরা ও শ্যামপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পাঞ্চলগুলোতে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়নি। শ্রমিক-কর্মচারীরা রাজপথে এসে হরতালের কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

৪৫৩। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দু'টি গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথক আহ্বানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে পুলিশের নজিরবিহীন নির্যাতন, নিপীড়ন ও গ্রেফতার এবং বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সহিংস আক্রমণের প্রতিবাদে দেশের রাজধানী ঢাকা ও অপর চারটি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহীতে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত ৮ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকা ও অপর চারটি বিভাগীয় শহরে পুলিশের লাঠিচার্জ, নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস শেল ও রাবার বুলেটের আঘাতে এবং বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সহিংস আক্রমণে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এসব শহরে হরতাল চলাকালে পুলিশ হামলা চালিয়ে শতাধিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও হরতালের সমর্থককে গ্রেফতার করে। হরতালের সময় রাজধানী ঢাকা ও অপর চারটি বিভাগীয় শহরে সকল প্রকার দোকানপাট, বিপণী বিতান, বাণিজ্যিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা বন্ধ ছিল। ব্যাংকে কোন লেনদেন হয়নি। রাস্তায় কোন ভারী যানবাহন, বাস, ট্রাক, লরি ইত্যাদি চলাচল করেনি। এসব শহরের সরকারী অফিস-আদালতে উপস্থিতির হার ছিল অতি নগণ্য।

৪৫৪। ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দু'টি গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথক আহ্বানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে পুলিশের নজিরবিহীন নির্যাতন, নিপীড়ন ও গ্রেফতার এবং বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সহিংস আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালনকালে রাজধানী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, পিরোজপুর, ঘোড়াশাল, জামালপুর, ঝিনাইদহ ও মানিকগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীরা হরতালের সমর্থনে আয়োজিত মিছিলে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করে। সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সহিংস হামলায় অনেক ব্যক্তি আহত হয়। শুধু রাজধানীতেই বিএনপির সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের গুলিতে ১০ জন গুলিবিদ্ধ ও বোমায় ৫০ জন আহত হয়। বিএনপির সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয় আওয়ামী যুবলীগ নেতা বাবু, মতিঝিল থানা ছাত্র লীগ সভাপতি মেহেদি হাসান শওকত এবং দৈনিক 'লাল সবুজ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকার রিপোর্টার কিবরিয়া চৌধুরী। হরতাল ব্যর্থ করার জন্যে ঢাকায় সকালে সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীরা সায়েদাবাদ, গুলিস্তান, পল্টন ও মহাখালী এলাকায় পুলিশের সহায়তায় কয়েকটি বাস চালানোর চেষ্টা করে। জনতার প্রতিরোধের মুখে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পুলিশের পাহারায় সরকার সমর্থক সেসব মাস্তান-সন্ত্রাসীরা বাসের ছাদে বসে খোলাখুলি কাটা রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হরতালে অংশগ্রহণকারী জনতাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। হরতাল চলাকালে রাজধানীর কয়েকটি স্থানে পুলিশ হামলা চালিয়ে প্রায় ৬০ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। হরতালের সময় রাজধানী ঢাকায় সকল প্রকার দোকানপাট, বিপণী বিতান, কলকারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। ব্যাংকে কোন লেনদেন হয়নি। সরকারী অফিস-আদালতে উপস্থিতির হার ছিল অতি নগণ্য। হরতালের সময় তেজগাঁও, টংগী, পোস্তগোলা, ডেমরা, শ্যামপুর ও আদমজীসহ দেশের বিভিন শিল্পাঞ্চলের কলকারখানা ছিল বন্ধ। রাজধানী ঢাকার সদরঘাট টার্মিনাল থেকে কোন লঞ্চ ছাড়েনি। হরতালের সময় ট্রেন ও বিমানের স্বাভাবিক চলাচলেও দারুণ বিঘ্ন ঘটে।

৪৫৫। ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল শেষে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ঢাকার মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের সাংবিধানিক ব্যবস্থার দাবি আদায় করার লক্ষ্যে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণায় ১৮ই থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে গণসংযোগ ও সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান, ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে দেশের সড়ক ও রেলপথ অবরোধ এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনকে আরও বেগবান ও জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য রাখার গোড়ার দিকে শেখ হাসিনা বলেন, "শত বাধা, উস্কানি, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের মুখে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' এবং ১১ই, ১২ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের হরতালের কর্মসূচী সর্বাত্মকভাবে সফল করে দেশবাসী বর্তমান দুর্নীতিবাজ, ভোট ডাকাত, সন্ত্রাসী ও অদক্ষ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে।" তারপর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, "অনাস্থা জ্ঞাপনের পাশাপাশি দুর্নীতিবাজ, ভোট ডাকাত সরকারের সংগে অসহযোগিতা করুন। সর্বাত্মক আন্দোলনের জন্য তৈরি হোন। কুশাসন থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে বর্তমান ফ্যাসিস্ট বিএনপি সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে।" তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, "দেশ ও জাতিকে দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা নির্দলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন দাবি করেছি। এ দাবি আজ গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। বিএনপি সরকার এ গণদাবি মেনে না নিয়ে জনগণকে দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিএনপি সরকারের একগুঁয়েমির ফলে দেশবাসী আজ কষ্ট পাচ্ছে।"

৪৫৬। ঐদিন হরতাল শেষে জাতীয় সংসদ ভবনস্থ সংসদীয় দলের কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "কেয়ার-টেকার সরকার প্রশ্নে বিএনপি সরকারের সাথে সংলাপের নামে কোন খোশগল্পের সুযোগ নেই। একমাত্র সংসদে কেয়ারটেকার সরকার সংক্রান্ত বিল আনার পরই সে সম্পর্কে আলোচনার মডালিটি (ক্রিয়া পদ্ধতি) নিয়ে সমঝোতার জন্য সংলাপে বসতে পারি। তা না হলে আমাদেরকে যেভাবে সংসদ থেকে রাজপথে ঠেলে দেয়া হয়েছে, এখন স্বাভাবিক গতিতেই এই পদ্ধতি রাজপথের পথ ধরে চলবে। সংসদের বিষয় বিএনপি সরকার রাজপথে নিয়েছে। সুতরাং, সে বিষয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজথেই আন্দোলন চলবে।" ঐ সাংবাধিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য শেষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর অনুরূপ কর্মসূচী তাঁর দল জামাতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন।

৪৫৭। ঐদিন রাতে জাতীয় সংসদ ভবনস্থ জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের কার্যালয়ে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর ঠিক অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য রাখার গোড়ার দিকে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "গত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী থেকে শুরু করে ১৩ই সেপ্টেম্বর(১৯৯৪) তারিখে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পর্যন্ত বিরোধী দলের লাগাতার কর্মসূচী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততায় ও সাফল্যের সাথে পালনের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের জনগণ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির পক্ষে রয়েছে।" তাঁর বক্তব্যের আর এক পর্যায়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "বিএনপি সরকারের মন্ত্রীরা বার বার বলছেন যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করার দাবি অসাংবিধানিক। অথচ, ১৯৯১-তে নিজেদের প্রয়োজনের সময় ঠিকই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন যখন করেছিল, তখন সেটা সাংবাধানিক ছিল। দেশের আগামী নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে বিএনপির ভয় আছে। তাই, আজ তাঁরা এ সম্পর্কে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন।" তারপর মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ পরিচালনার জন্য সব কিছুই সাংবিধানে থাকে না। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে, যুগে যুগে জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংবিধান সংশোধন করতে হয়। জনগণের দাবিরই ভিত্তিতে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী সাব্যস্ত হয়।"

৪৫৮। ইতিপূর্বে, ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে বিএনপি সংসদীয় দলের উপনেতা ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরোদ্দোজা চৌধুরী সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে অব্যাহত সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় সকল কমিটির সভা বর্জনসহ সরকারবিরোধী আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আলাপ-আলোচনায় বসার প্রস্তাব করে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ঐ চিঠিটি আব্দুস সামাদ আজাদের হস্তগত হয় ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে। তারপর, সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টির পৃথক পৃথক আহ্বানে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী এবং আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথক আহ্বানে ১১ই তারিখে সারা ঢাকা শহরে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত ৮ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল, ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকা ও দেশের অপর চারটি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহীতে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল ও ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে আহূত সেসব কর্মসূচী সম্পন্ন হওয়ার পর, ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের বিরোধী দলের উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগসহ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এক সভায় সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে লিখিত চিঠির জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারপর, ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে আব্দুস সামাদ আজাদ এক চিঠিতে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে তাঁর ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর মতামত জানিয়ে দেন। সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে ১৬ই সেপ্টেম্বর(১৯৯৪) তারিখে লেখা ঐ চিঠিতে বিএনপি সরকার কর্তৃক সংলাপের যথাপোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা সাপেক্ষে সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে কোন সময়ে এবং যে কোন স্থানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় বসার সম্মতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্ত করা হয়। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সংলাপের সুষ্ঠু ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ঐ চিঠিতে বিএনপি সরকারের প্রতিঃ (১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবিতে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনকালে সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এবং অপর তিনজন সাবেক সংসদ সদস্য ফেরদৌস জামান মুকুল, মির্জা আব্দুল লতিফ ও কর্নেল (অবঃ) আব্দুল মালেকের ওপর পুলিশের নির্যাতনের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান করা; (২) ঐ আন্দোলনের সময় সন্ত্রাস দমন আইনসহ অন্যান্য আইনে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দান করা; (৩) বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ করা; (৪) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিরোধী দলের দাবির বিরোধিতা করে সরকারী দলের নেতৃবৃন্দের বিষোদ্‌গার বন্ধ করা এবং (৫) নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রীর সুস্পষ্ট মতামত বিরোধী দলকে অবহিত করার দাবি জানানো হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বিএনপি সরকারপ্রধান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের সেসব প্রস্তাব ও দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে সারা দেশে সভা, সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির এবং তার পক্ষে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলো ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচী মোকাবিলা করার জন্য তাঁর দলের মন্ত্রী ও নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, প্রধান মন্ত্রী নিজেও সে প্রচার অভিযানে নেমে পড়েন। ফলে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে পড়ে আরও বেশী উত্তপ্ত ও সংঘাতময়। একই সঙ্গে, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনমনে সৃষ্টি হয় দারুণ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা।

৪৫৯। ইতিপূর্বে, ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকু ৫ দিনের সরকারী সফরে বাংলাদেশে আসেন। ১৯৯৫ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের বিষয়াদি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করাই ছিল তাঁর ঐ সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ সময়ে, তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) মুস্তাফিজুর রহমান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে সাক্ষাৎকার ছাড়াও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দু'বার বৈঠক করেন। তাছাড়াও, তিনি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফের সাথেও বৈঠক করেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে বাংলাদেশ সফর শেষে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মেলনে বক্তব্য রাখার এক পর্যায়ে এমেকা আনিয়াউকু সাংবাদিকদের জানান যে, বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের আরও জানান যে, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তিনি সংসদ নেত্রী ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়াও, তিনি বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের নিরসনকল্পে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালীকরণ এবং উপযুক্ত নির্বাচন আচরণ-বিধি প্রণয়ন—এই তিনটি বিষয়কে আলোচনার আলোচ্যসূচী হিসেবে নিয়ে সরকারী দল এবং বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর বৈঠক করার প্রস্তাবও তিনি সরকারী দল ও বিরোধী দলের দুই নেত্রীর কাছে পেশ করেছেন বলে সাংবাদিকদের জানান। সরকারী দল ও বিরোধী দলের দুই নেত্রী চাইলে সে ব্যাপারে বৈঠক অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথ সচিবালয় সহায়তা করতে পারে বলেও তিনি আভাস দেন।

৪৬০। ২১শে সেপ্টেম্বর(১৯৯৪) তারিখে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকু বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের পক্ষে আনুষ্ঠানিক মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৃথক পৃথক ফ্যাক্স বার্তা পাঠান। ঐ ফ্যাক্স বার্তায় সরকারী ও বিরোধী পক্ষ রাজি হলে সে উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি মধ্যস্থতাকারী দলকে বাংলাদেশকে পাঠানোরও প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া ঐ ফ্যাক্সে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সম্ভাব্য সংলাপের আলোচ্যসূচীতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাও উল্লেখ করা হয়।

৪৬১। ২৬শে সেপ্টম্বর (১৯৯৪) তারিখে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকুকে উদ্ধৃত করে কমনওয়েলথ সচিবালয় কর্তৃক জারিকৃত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে দেশে উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট নিরসনে উন্মুক্ত আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ঃ "১৯৯১ সালের সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে কমনওয়েলথ মনিটরিং গ্রুপ গণতন্ত্রের বিজয় বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু, তারপর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমবর্ধমান হারে সংঘাতময় হয়ে ওঠে, যার পরিণতিতে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ এবং বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান মন্ত্রী, তাঁর সরকারের সদস্যবৃন্দ এবং বিরোধীদলের নেত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময়ে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট অভিন্ন বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে অর্থবহ সংলাপ হতে পারে। কমনওয়েলথ ১৯৯১ সালে সামরিক শাসন থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের সময় যেহেতু সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিল, সেজন্য বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংহত করতে রাজনৈতিক দলগুলো কমনওয়েলথের সহায়তা কামনা করতে পারে, এই বিশ্বাস থেকে আমি সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য একটি তিন দফা পরিকল্পনা পেশ করি। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়ের পক্ষ থেকে এখন আমি সেসব প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের সম্মতিসূচক জবাব পেয়েছি। কাজেই, আমি উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি। আমি আশা করছি যে, আর কোন বিলম্ব ছাড়াই তাঁদের মধ্যে আলোচনা শুরু করা এবং সে আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করা সম্ভব হবে।"

৪৬২। বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে যে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয় তার নিরসনে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভনেত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা বৈঠক করতে সম্মত হনঃ "(১) উভয় পক্ষের আলোচনা অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর একজন বিশেষ দূতকে বাংলাদেশে পাঠাবেন। (২) সরকারী দল ও সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে আন্তরিকভাবে ও সরল বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে একটি সংলাপ অনুষ্ঠানে বসতে সম্মত হতে হবে এবং তা অনুষ্ঠিত হবে উন্মুক্ত আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে। সে আলোচনা বৈঠকে উভয় পক্ষের যে কেউ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ, নির্বাচনসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতার পরিবেশের উন্নতি বিধানকল্পে সার্বিক আচরণ-বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত যে কোন বিষয় উত্থাপন করতে পারবে। (৩) এ ধরনের আলোচনাকে গুরুত্ব প্রদানে আস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ হিসেবে উভয় পক্ষকে এই মর্মে সম্মত হতে হবে যে, তাঁদের আলোচনার প্রতিটি অধিবেশন শেষে তাঁরা সংবাদপত্র ও জনগণের জ্ঞাতার্থে শুধু একটি সম্মত যৌথ বিবৃতিই প্রদান করবেন। একই সঙ্গে, আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীরা অন্য কোন প্রকাশ্য মন্তব্য প্রদান বা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন।"

৪৬৩। ২৭শে সেপ্টম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দুটি বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর পৃথক পৃথক আহ্বানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবিতে সারা দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত 'রাজপথ-রেলপথ অবরোধ' কর্মসূচী পালিত হয়। ঐ অবরোধ চলাকালে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে সরকারী দল বিএনপির সশস্ত্র মাস্তান সন্ত্রাসীদের অবরোধ পালনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ এবং পুলিশের লাঠিচার্জ, নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস শেল ও রাবার বুলেটের আঘাতে প্রায় ১০০ জন আহত হয়। 'রাজপথ-রেলপথ অবরোধ' চলাকালে রাজধানী ঢাকার সায়েদাবাদ, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, মহাখালী, গাবতলী প্রভৃতি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালগুলো থেকে দূর-পাল্লার একটি বাসও ছাড়েনি। দূর-পাল্লার কোন বাসও রাজধানীর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল-গুলোতে আসেনি। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত রেলপথে ও রেলস্টেশনসমূহে ট্রেনসমূহ আটকা পড়ে। পথিমধ্যে কোথাও কোথাও বিক্ষুব্ধ জনতা রেল ও সড়কপথে ব্যারিকেড গড়ে তোলে। ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী রাজধানী ঢাকায় ভারী যানবাহন চলাচল ব্যতীত জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকার কথা থাকলেও 'রাজপথ-রেলপথ অবরোধ' চলাকালে রাজধানী ঢাকা অঘোষিত হরতালের রূপ নেয়। রাজধানী ঢাকার অভ্যন্তরীণ রুটগুলোয় রিকসা ছাড়া আর কোন যানবাহন চলেনি। সারা ঢাকা শহরে সকল প্রকার দোকানপাট, বিপণী বিতান, কলকারখানা, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। ব্যাংকসমূহে কোন লেনদেন হয়নি। সরকারী অফিস-আদালতে উপস্থিতির হার ছিল অতি নগণ্য।

৪৬৪। জাতীয় সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখ বিকেলে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এক জনসভার আয়োজন করে। ঐ জনসভায় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভনেত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের জনগণের প্রতি নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানানো হয়ঃ (১) আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের তথা জনসাধারণের ওপর বিএনপি সরকারের হয়রানি, অত্যাচার, নির্যাতন ও গ্রেফতারী তৎপরতা এবং সরকারী দলের সশস্ত্র মাস্তান-সন্ত্রাসীদের গুলি বর্ষণ ও বোমাবাজির মাধ্যমে পরিচালিত সহিংস ও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে দেশের সকল থানা ও জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালন; (২) ৯ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে টংগী থেকে রাজধানী ঢাকার মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠান; (৩) ১৬ই থেকে ১৮ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে গণসংযোগ কর্মসূচী; (৪) ২০শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকায় গণমিছিলের আয়োজন; (৫) ২১শে থেকে ২৩শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে গণসংযোগ কর্মসূচী; (৬) ২৬শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকায় গণমিছিলের আয়োজন; (৭) ১লা নভেম্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকা মহাসমবাবেশ আয়োজন এবং (৮) ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) রাজধানী ঢাকায় প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট পালন।

৪৬৫। ঐ জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, "আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব—জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের আন্দোলন। কিন্তু, আজকের বিএনপি সরকার চায়—আমার ভোট আমি দেব না, আমার ভোট বিএনপির মাস্তান বাহিনী দেবে।" তারপর তিনি বলেন, "মানুষ শান্তি মতো ভোট দিয়ে তার মনমতো প্রার্থী নির্বাচিত করবে, সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত করার জন্যই আমরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছি। গত সাড়ে তিন বছরে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অধীনে জনগণের ভোট এবং ভোটারদের জীবনের নিরাপত্তা নেই।" ঐ জনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকুর দেয়া সংলাপের প্রস্তাব প্রসংগে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা সংলাপের বিরোধী নই। তাই কমনওয়েলথ মহাসচিব প্রস্তাব দেওয়ায় আমি তাঁকে বলেছি যে, সংলাপের এক নম্বর বিষয় হবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন। সেই সাথে নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজাতে হবে। কেননা, বর্তমান নির্বাচন কমিশন জনগণের ভোটের অধিকার ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সংস্কারের পাশাপাশি রাজনীতিবিদদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। কারণ, আমরা দেখেছি কিভাবে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ-সুবিধাদির অপব্যবহার করে মাস্তান দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ভোটারদের অধিকার খর্ব করেন।" তাঁর ভাষণের শেষাংশে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমার কথা স্পষ্ট। যতোক্ষণ পর্যন্ত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার দাবি পূরণ না হবে, আমাদের আন্দোলন ও সংলাপ চলবে। আমার ওপর যদি আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, মনে রাখবেন জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।"

৪৬৬। ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় পার্টি রাজধানী ঢাকার মতিঝিলিস্থ শাপলা চত্বরে এক জনসভার আয়োজন করে। ঐ জনসভায় জাতীয় পার্টি ঐদিনেই আর একটি পৃথক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করে। ঐ জনসভায় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী দেশের রাজনৈতিক প্রশ্নে সরকারী দল ও সংসদে বিরোধী দলের মধ্যে সংলাপ আয়োজনে বিএনপি সরকার কর্তৃক কমনওয়েলথ সচিবালয়ের মহাসচিব এমেকা আনিয়াউকুর মধ্যস্থতা গ্রহণ করার সমালোচনা ও দুঃখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করে বলেন, "এমেকার মধ্যস্থতার আগেই প্রধান মন্ত্রীর উচিত ছিল বিরোধী দলের সাথে বৈঠক করে মতপার্থক্য কমিয়ে আনা।" ঐ জনসভায় জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অর্থবহ সংলাপের প্রয়োজনীয়তার পুনরুল্লেখ করে বলেন, "বিএনপি সরকার সংলাপের কথা বলে সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে। কাজেই, ফলপ্রসূ সংলাপ এ সরকার করবে কি-না, সে ব্যাপারে গভীর সংশয় রয়েছে।" তারপর তিনি বলেন, "বিদেশের মানুষ এসে আমাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে, এর চেয়ে লজ্জার কথা কি করে হতে পারে? প্রধান মন্ত্রী কি করে এতে রাজি হলেন? ভাবতে লজ্জা হয় যে, দেশে একটি সরকার আছে এবং আমরা সে দেশের নাগরিক। আমরা ৬ মাস আগেই সমঝোতা চেয়েছিলাম—পার্লামেন্টের ফ্লোরে।"

৪৬৭। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের অপর বিরোধী গ্রুপ জামাতে ইসলামী রাজধানী ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে এক জনসভার আয়োজন করে। ঐ জনসভায় জামাতে ইসলামী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করে। মহানগর জামাতের আমীর এ.টি.এম. আজাহারুল ইসলামের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ জনসভায় দলের সিনিয়র নায়েবে আমীর আববাস আলী খান বলেন, "বিএনপি সরকার আন্তরিক হলে অনেক আগেই বর্তমান রাজনৈতিক সংকট দূর করা যেত। আজ কমনওয়েলথ সচিবালয়ের মহাসচিবের হস্তক্ষেপে সংলাপের প্রস্তাব এসেছে। এটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপের সামিল। বর্তমান বিএনপি সরকারের রাজনৈতিক অযোগ্যতার কারণেই এটা হয়েছে।" ঐ জনসভায় জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনে যারা ৬৯% ভাগ ভোট পেয়েছে, তারা আজ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবি করছে। এটা এখন জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। এ দাবি মানতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।" তারপর মাওলানা নিজামী বলেন, "অতীতে বিএনপি সরকার দলীয় স্বার্থেও সংবিধান সংশোধন করেছে এমন নজিরও আছে। আর আজ জনগণের দাবিতেও সংবিধান সংশোধন করা যাবে না, এটা কোন যুক্তির কথা হতে পারে না।"

৪৬৮। কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকুর মধ্যস্থতায় সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির প্রশ্নে বিরোধী দলের সংগে সংলাপ অনুষ্ঠানে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সে দাবির প্রশ্নে বিরোধী দলের আন্দোলন ও সে দাবির সমালোচনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখেন। তারই অংশ হিসেবে বিএনপি বন্দর নগরী চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসভার আয়োজন করে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) তারিখে। ঐ জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ঐ জনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবিতে আওয়ামী লীগের অব্যাহত সরকারবিরোধী আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "যারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে স্বৈরাচারের সাথে হাত মিলিয়ে আন্দোলন করছে, তারা গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে চায়। ওদের হাতে কোনদিন গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। তাদের সামনে কোন ইস্যু নেই বলেই তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে।" তারপর সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির তীব্র বিরোধিতা করে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ভিত্তি সংবিধানে নেই। বিশ্বের কোথাও এ ব্যবস্থা নেই।" নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেলের দেয়া প্রস্তাব মোতাবেক সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠানে সম্মতি দানের পর প্রদান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উপরোক্ত জন-সভায় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য জনসভায়ও তাঁর প্রদত্ত ভাষণে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনভিপ্রেত বিষোদ্গার এবং সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস অব্যাহত রাখায় প্রস্তাবিত সংলাপের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে জনমনে ভীষণ সংশয় সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দলের সেসব অনভিপ্রেত তৎপরতার ফলে সংলাপ অনুষ্ঠানের পরিবেশও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪৬৯। ৫ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে কমনওয়েলথ সচিবালয়ে সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকু এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারী দল এবং সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে কমনওয়েলথের পক্ষে সহায়তা করার নিমিত্তে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য কমনওয়েলথ সচিবালয় থেকে দু'জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশে পাঠানোর কথাও ঘোষণা করা হয়। ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকু স্যার নিনিয়ান স্টিফেন সম্পর্কে বলেন, "বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংহত ও সংলাপ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য কমনওয়েলথের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। স্যার নিনিয়ান শুধু তাঁর দেশ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, কমনওয়েলথ ও সারা বিশ্বের প্রতি অসাধারণ অবদান রাখার মধ্য দিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার আলোকে তাঁকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।"

৪৭০। ১০ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে কমসওয়েলথ সচিবালয়ের দু'জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ডক্টর মোজেস আনাফু ও ক্রিস্টোফার চাইল্ড বাংলাদেশে আসেন সরকারী দল এবং সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে সহায়তা প্রদানের জন্য। বাংলাদেশে আগমনের পর তাঁরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাবিত সংলাপ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকুর বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান মার্টিন স্টিফেন তাঁর পত্নী লেডী স্টিফেনকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে আসেন ১৩ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে। তাঁকে ঢাকা বিমান বন্দরে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মুফলেহ আর ওসমানি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। তাছাড়া বিমান বন্দরের ভি.আই.পি. লাউঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান বিএনপির পক্ষে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নজমুল হুদা, আওয়ামী লীগের পক্ষে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস.এ.এম.এস. কিবরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন ও কানাডাসহ কয়েকটি দেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ।

৪৭১। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সকাল ১০টায় বাংলাদেশে পৌঁছার এক ঘন্টার মধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'য় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতিতে স্যার নিনিয়ান বলেন, ''কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়উকুর দূত হিসেবে আমি বাংলাদেশে এসেছি। গত (সেপ্টেম্বর) মাসে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকু বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে যে তিন দফা প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তাঁরা উভয়েই একটি সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় আমি এখানে এসেছি।" স্যার নিনিয়ান ঐ বিবৃতিতে আরও বলেন, "আমার মিশনের এই প্রথম দিনেই আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকট এদেশ মোকাবিলা করছে, তার নিরসন এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে নিজেদের উদ্যোগেই করতে হবে। আমার মিশন হচ্ছে এই যে, এই প্রক্রিয়ায় যখন প্রয়োজন হয় তখন উভয় পক্ষকে সংলাপ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সহায়তা দানের জন্য প্রস্তুত থাকা। আমি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে দুই নেত্রী, তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ এবং বাস্তবিকপক্ষে, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছি।" ঐ বিবৃতি প্রদানের পর স্যার নিনিয়ান সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল প্রস্তাবিত সংলাপ অনুষ্ঠানের উদ্যোগকে বাংলাদেশের কোন কোন মহল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 'কমনওয়েলথের হস্তক্ষেপ' বলে যে অভিযোগ তুলেছে সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য চাওয়া হলে স্যার নিনিয়ান বলেন, "আমার মিশনের কাজ হবে আয়োজকের ভূমিকার, অবশ্যই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার নয়। সহায়তাকারীর ভূমিকা কখনও হস্তক্ষেপ করার পর্যায়ে পড়ে না। হস্তক্ষেপ হচ্ছে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষকে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করছি মাত্র।"

৪৭২। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে ঢাকা পৌঁছার পর স্যার নিনিয়ান স্টিফেন প্রস্তাবিত সংলাপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংসদ উপনেতা বিএনপির অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিরোধী দলীয় সংসদ উপনেতা আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও চীফ হুইপ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন বিকেল ৫টা থেকে ৬টা ২০ মিনিট পর্যন্ত এবং বিরোধী দলের সংসদ উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস.এ.এম.এস. কিবরিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে পৌনে আটটা পর্যন্ত স্যার নিনিয়ানের সাথে বৈঠক করেন। ১৪ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে সকাল ১১টায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থায়ী কমিটির (ক-১) কক্ষে স্যার নিনিয়ান সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দুটি বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সাথে প্রায় দুই ঘন্টা বৈঠক করেন। সংসদে বিরোধী দলের সংসদ উপনেতা আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে ঐ বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ ও বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আব্দুস সোবহান ও শেখ আনসার আলী, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, এনডিপি-এর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা ওবায়দুল হক। ঐ বৈঠক শেষে স্যার নিনিয়ান সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, "বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে আমার ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মনোভাব আমার কাছে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা গোটা সংলাপ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে বলে মনে করি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৭৩। ১৫ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ রাত ৮টায় স্যার নিনিয়ান প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক করেন। প্রধান মন্ত্রীর সাথে স্যার নিনিয়ানের বৈঠকের সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, বাণিজ্যমন্ত্রী এম. শামসুল ইসলাম ও চীফ হুইপ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন। ঐ বৈঠকে স্যার নিনিয়ান বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট প্রশ্নে সরকারী পক্ষের অবস্থান জানতে চাইলে প্রধান মন্ত্রী বলেন, "সরকারী দলের অবস্থান সম্পর্কে আপনি গত কয়েকদিনে বিএনপি নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে শুনেছেন নিশ্চয়ই। সরকারী দলের নেতারা ইতিমধ্যে আপনাকে যা অবহিত করেছেন, সেটাই সরকারী দলের বক্তব্য।" বৈঠকের শেষ পর্যায়ে প্রধান মন্ত্রী স্যার নিনিয়ানকে বলেন, "আমাদের মনে হয় যে, বর্তমান সংকটের একটা সমাধান খুঁজে পাব।"

৪৭৪। ১৬ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত স্যার নিনিয়ান মার্টিন স্টিফেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর ২৯ নম্বর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমান, বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস.এ.এম.এস. কিবরিয়া এবং কমনওয়েলথ সচিবালয়ের দু'জন কর্মকর্তা ডঃ মোজেস আনাফু ও ক্রিস্টোফার চাইল্ডও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে স্যার নিনিয়ান সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, "বিরোধী দলের নেত্রীর সঙ্গে আমার ব্যাপক বিস্তৃত ও কার্যকর আলোচনা হয়েছে।" বৈঠক শেষে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তখন সাংবাদিকদের কাছে ঐ বৈঠক সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করলেও, পরবর্তীতে জানা যায় যে, ঐ বৈঠককালে তিনি বাংলাদেশের মতো নবলব্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদের সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪৭৫। ১৭ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে সরকারী দল বিএনপির পাঁচজন নেতা স্যার নিনিয়ানের সাথে বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজার সঙ্গে ছিলেন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, চীফ হুইপ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন ও সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক। ঐ বৈঠকে সংলাপে বসার ব্যাপারে সরকারী দলের ইতিবাচক মনোভাব স্যার নিনিয়ানকে জানানো হয়। স্যার নিনিয়ান যে তারিখ নির্ধারিত করবেন, সেই তারিখেই সরকারী দল সংলাপে রাজি আছে বলে তাঁকে অবহিত করা হয়। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণে সরকারী দলের প্রস্তাবিত বিলের বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কোন প্রস্তাবনা থাকলে তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে বিএনপির নেতৃবৃন্দ ঐ বৈঠকে স্যার নিনিয়ানকে অবহিত করেন।

৪৭৬। ১৬ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীর অফিসকক্ষে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলীয় সংসদ উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ ও চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম ছাড়াও আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ, সুধাংশু শেখর হালদার ও রহমত আলী, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও শেখ আনসার আলী, এনডিপির একমাত্র সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং গণতন্ত্রী পার্টির একমাত্র সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। বৈঠক শেষে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের বলেন, "সংলাপের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বিরোধী দল অপেক্ষা করছে। সংলাপকে সামনে রেখে সরকার যদি কালক্ষেপণ করতে চায়, তবে তার জন্য সরকারকেই দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংলাপে সহায়তাকারী কমনওয়েলথ প্রতিনিধি স্যার নিনিয়ানকে সংলাপ সম্পর্কিত বিরোধী দলের মনোভাব জানানো হয়েছে। জাতীয় সংসদের কমিটি কক্ষে কিংবা কেবিনেট কক্ষে প্রস্তাবিত সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার বিষয়টিই প্রস্তাবিত সংলাপের মূল এজেন্ডা হতে হবে।"

৪৭৭। ১৮ই অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সকাল ১১টা থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'য় কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দাজা চৌধুরী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে ডাঃ বদরুদ্দোজার সঙ্গে ছিলেন সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে ছিলেন সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া। ঐদিনই রাত সাড়ে ৮টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'য় স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দফা বৈঠকে ডাঃ বদরুদ্দোজার সঙ্গে ছিলেন সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ছাড়াও যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ এবং আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে ছিলেন সংসদে বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া। প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকের এক পর্যায়ে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রধান মন্ত্রীর হেয়ার রোডস্থ সন্ধ্যাকালীন অফিসে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে পরামর্শ করে আসেন। প্রায় একই সময়ে, বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রীর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে গিয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে পরামর্শ করে আসেন। তারপর রাত প্রায় সোয়া ১১টায় স্যার নিনিয়ানের সহকারী কমনওয়েলথ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার চাইল্ড রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'র গেটে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন। স্যার নিনিয়ানের পক্ষে প্রদত্ত ঐ বিবৃতিতে বলা হয়ঃ "সংলাপ প্রক্রিয়ার প্রথম যৌথ সেশন ২০শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সংসদের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সংলাপে সরকারী দলের নেতৃত্ব দেবেন সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেবেন সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ।"

৪৭৮। দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের আয়োজনে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংলাপ ২০শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ রাত ৬টা ৫০ মিনিটে সংসদ ভবনে শুরু হয়। সরকারী দলের ১৪ জন এবং বিরোধী দলের ১৫ জন নেতা সংলাপের ঐ অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে সরকারী দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, হুইপ আশরাফ হোসেন, এল.কে.সিদ্দিকী, উইং কমান্ডার (অবঃ) হামিদুল্লাহ খান, ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান, অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, আমীর খসরু মাহমুদ ও মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম। সংলাপে শ্রমমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার থাকার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। অপরদিকে, সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে বিরোধী দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ, দলের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমান, বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, আবদুর রহিম, শেখ হারুন-উর রশিদ ও দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও শেখ আনসার আলী, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, এনডিপির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা ওবায়দুল হক। সংলাপের ঐ অধিবেশন সংসদ উপনেতা ও সরকারী দলের নেতা ডাঃ বদরুদ্দোজার ৪০ মিনিটের এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা ও বিরোধী দলের নেতা আবদুস সামাদ আজাদের ১ ঘন্টা ২০ মিনিটের বক্তব্য পেশের মধ্য দিয়ে রাত ৮টা ৫৮ মিনিটে সমাপ্ত হয় এবং পরবর্তী অধিবেশন ২২শে অক্টোবর (১৯৯৪) শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একই স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। বৈঠক শেষে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম যৌথভাবে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান, "ভালো পরিবেশে সংলাপ শুরু হয়েছে।" উল্লেখ্য, সংলাপে অংশ গ্রহণকারীদের অন্য কেউই সংলাপ সম্পর্কে সাংবাদিকদের কোন কিছু বলেননি।

৪৭৯। ২২শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সংলাপের দ্বিতীয় অধিবেশন সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে শুরু হয় এবং রাত ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত চলে। সাড়ে ৪ ঘন্টার ঐ বৈঠকে সরকারী দল প্রায় আড়াই ঘন্টা এবং বিরোধী দল ২ ঘন্টা বক্তব্য রাখেন। বৈঠক শেষে সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এক যৌথ বিবৃতিতে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান, "সংলাপের দ্বিতীয় দিনে খোলামেলা পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, তোফায়েল আহমদ ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বক্তব্য রেখেছেন। বৈঠক ২৩শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত মূলতবি করা হয়েছে।"

৪৮০। ২৩শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সংলাপের তৃতীয় অধিবেশন সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় শুরু হয় এবং রাত ১১টা ২০ মিনিটে শেষ হয়। ঐ দিনের মোট ৪ ঘন্টা ৩৫ মিনিটের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সরকারী দলের পক্ষে উইং কমান্ডার (অবঃ) হামিদুল্লাহ খান, অধ্যাপক রেজাউল করিম, মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম ও হুইপ আশরাফ হোসেন এবং বিরোধী দলের পক্ষে মাওলানা ওবায়দুল হক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আবদুল জলিল মিলে মোট ৮ জন সদস্য। গত ২০ শে ও ২২ শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত দু'দিনে সংলাপ-বৈঠকের মতো ২৩ শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংলাপের তৃতীয় অধিবেশনেও উভয় পক্ষের সদস্যরা স্ব স্ব পক্ষের অবস্থানের যৌক্তিকতার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। ২৩শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে এক যৌথ ঘোষণায় আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত এবং সংলাপের পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিবেশন পরদিন ২৪শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একই স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানানো হয়।

৪৮১। ২৪শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সংলাপের চতুর্থ অধিবেশন সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে শুরু হয় এবং রাত সাড়ে ১১টায় সমাপ্ত হয়। প্রায় সাড়ে ৪ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে উভয় পক্ষের ৩ জন করে মোট ৬ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। ঐ দিনের বৈঠকে ইতিপূর্বে প্রধান মন্ত্রী বেগম খলেদা জিয়া এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পৃথক পৃথক জনসভায় প্রদত্ত বক্তব্যকে নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। বৈঠক শেষে, সংসদে সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এক যৌথ বিবৃতিতে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান, "চতুর্থ দিনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় সরকারী দলের পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম ও আমীর খসরু মাহমুদ এবং বিরোধী দলের পক্ষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমান, সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অংশ নিয়েছেন। সংলাপের পরবর্তী বৈঠক মংগলবার (২৫শে অক্টোবর, ১৯৯৪) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অনুষ্ঠিত হবে।

৪৮২। ২৫শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সরকারী দল এবং সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর মধ্যে সংলাপের পঞ্চম অধিবেশন সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে ৬টা ২০ মিনিটে শুরু হয়। ঐ বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সরকারী দলের পক্ষে বিএনপি মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, ও সংসদ চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং বিরোধী দলের পক্ষে আবদুর রহিম, শেখ হারুন-উর রশিদ, মনিরুল হক চৌধুরী ও শেখ আনসার আলী। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে, সরকরী দলের নেতৃবৃন্দ বর্তমান সংবিধান কাঠামোর মধ্যেই অর্থাৎ সংসদ নেত্রী ও প্রধান মন্ত্রীকে বহাল রেখেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। উভয় পক্ষ স্ব স্ব অবস্থানে অনড় ও অটল থাকেন। সংলাপের ঐ অচলাবস্থায় সরকারী দল ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রায় ৬ ঘন্টা অতিবাহিত হয়। ভোর রাত ১টার দিকে সরকারী দলের কতিপয় মন্ত্রী বিরোধী দলের সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করলে, বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ একযোগে আলোচনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তার ফলে, কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান স্টিফেনের সহায়তায় সরকারী দলের সংসদ উপনেতা এবং সংসদে বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলীয় সংসদ উপনেতা পর্যায়ে সরকারী পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে আয়োজিত সংলাপ কোন সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়। ঐ বৈঠক শেষে, ভোর রাত ১টা ৬মিনিটে সংলাপ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেনঃ "গত ৫ দিন ধরে বিরোধী দলীয় সংসদ উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে বিরোধী দল সংলাপে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু, সরকারের একগুঁয়েমি ও অযৌক্তিক মনোভাবের কারণে সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে।" অপরদিকে, ভোর রাত ১টা ১০ মিনিটে সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের জানানঃ "তাঁদের জন্যই সংলাপ ভেঙ্গে গেছে। তাঁদের অনড় মনোভাবই এর জন্য দায়ী। আমাদের প্রস্তাব ছিলো যে, স্বল্প পরিসরে আরও আলোচনা হবে। কিন্তু, তাঁরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেওয়া না হলে সংলাপ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়ে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই সংলাপ ভেঙ্গে গেছে বলে ঘোষণা দেন। আমরা মনে করি যে, এখনও সংবিধান সম্মতভাবে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব।"

৪৮৩। সরকারী পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে উপনেতা পর্যায়ের সংলাপ ৫দিন অনুষ্ঠিত হয়ে ২৬শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ ভোর রাত ১টা ৬ মিনিটে কোনরূপ সমঝোতা ছাড়াই শেষ হওয়ার পরপরই কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান দু'পক্ষকে আবার আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। তার ফলশ্রুতিতে, সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ ২৬ শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় স্যার নিনিয়ানের সাথে বৈঠক করেন। সে সময় আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে ছিলেন সংসদে বিরোধী দলীয় হুইপ আবুল হাসান চৌধুরী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া। স্যার নিনিয়ান প্রায় এক ঘন্টা ধরে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা আবদুস সামাদ আজাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। অপরদিকে, সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ২৬ শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ বেলা সাড়ে ১২টায় রাষ্টীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় স্যার নিনিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সংগে ছিলেন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ ও সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। স্যার নিনিয়ান প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন। স্যার নিনিয়ানের সাথে অনুষ্ঠিত সেসব বৈঠকে দু'পক্ষ স্বল্প পরিসরে উপনেতা পর্যায়ে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। ঐদিন বিকেলে স্যার নিনিয়ানের পক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়ঃ "সংলাপ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে দুই উপনেতা বৃহস্পতিবার (২৭ শে অক্টোবর, ১৯৯৪) বৈঠকে বসবেন। দু'পক্ষের সংগে আলোচনার ভিত্তিতেই এটা ঠিক করা হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৮৪। তারপর, ২৭ শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যা পৌনে ৭টা থেকে ১১টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে ৪ সদস্যের সরকারী পক্ষ এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট বিরোধী পক্ষের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজার নেতৃতে সংলাপে সরকারী দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ ও সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, হুইপ আবুল হাসান চৌধুরী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া। বৈঠক শেষে, স্যার নিনিয়ানের পক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়ঃ "সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে বৈঠক করেছেন। তাঁরা কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল প্রদত্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ এবং রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৈঠক গঠনমূলক হয়েছে এবং আগামী ২৯শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে আবার বসবে।"

৪৮৫। ২৯শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখ বিকেল পৌনে ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে ৪ সদস্যের সরকারী পক্ষ এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট বিরোধী পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকের শুরুতেই সরকারী দল বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তাঁদের পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করে। ঐ প্রস্তাবে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে প্রধান মন্ত্রীকে স্বপদে বহাল রেখে সরকারী দল ও সংসদে বিরোধী দলের স্বল্প সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেট গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাধীনে প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত মিনি কেবিনেটের অন্য সদস্যরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু, প্রধান মন্ত্রী শুধু নির্বাচনে অংশ গ্রহণই নয়, তিনি তাঁর নিজের দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায়ও অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ সরকারী দলের ঐ প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "এটা নতুন কোন প্রস্তাব নয়। বিরোধী দল এটা মানতে পারে না। সরকারী দলের কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন প্রস্তাব থাকলে ওঠাতে পারেন। "তারপর সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার রূপরেখা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। তখন সরকারী দল ও বিরোধী দলের সেসব প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হয়। পরিশেষে, রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে ঐ বৈঠক সমাপ্ত হয় পরবর্তী বৈঠকের কোন ঘোষণা ছাড়াই।

৪৮৬। ৩০শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল আড়াইটা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীতে সংসদ ভবনে তাঁর অফিসকক্ষে সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, সুধাংশু শেখর হালদার ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী এবং এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। উল্লেখ্য, ইত্যবসরে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, গণতন্ত্রী পার্টির একটি অংশকে নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ঐ সভায় ২৭ ও ২৯শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে উপনেতা পর্যায়ে সরকারী পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক দুটোয় আলোচিত বিষয়াদির পর্যালোচনা করা হয়। ঐ সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিএনপি সরকার সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নীতিগতভাবে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত বিরোধী দল সরকারী দলের সাথে আর কোন বৈঠক করবে না।

৪৮৭। সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলো বিএনপি সরকারের জাতীয় সংসদের সময়কালে প্রধান মন্ত্রীকে বহাল রেখে অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেট গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত বিরোধী পক্ষ সরকারী পক্ষের সাথে কোন বৈঠকে না বসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় সংলাপ প্রক্রিয়ায় আবারও সংকট সৃষ্টি হয়। তারই প্রেক্ষিতে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান ৩১শে অক্টোবর (১৯৯৪) রাত ৮টা ৩৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে তাঁর সাথে বৈঠক করেন। ঐ বৈঠককালে স্যার নিনিয়ান সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে সংলাপ প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারবিরোধী আন্দোলনে কোন কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরোধ জানান। অপরদিকে, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্যার নিনিয়ানকে বলেন, "বিরোধী দলের আন্দোলন কোন হঠকারী আন্দোলন নয়। আলোচনার পাশাপাশি আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বিরোধী দল তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী আন্দোলন ও আলোচনা চালিয়ে যাবে। তবে, সরকারকে ইতিবাচক প্রস্তাব নিয়ে আসতে হবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে ইতিবাচক প্রস্তাব ছাড়া শুধু আলোচনায় বসা অর্থহীন।"

৪৮৮। ১লা নভেম্বর (১৯৯৪) বিকেলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের ভবিষ্যৎ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক আওয়ামী লীগ এক 'মহাসমাবেশে'র আয়োজন করে। ঐ মহাসমাবেশটি ছিলো সাম্প্রতিককালে মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত সকল জনসভার মধ্যে বৃহত্তম জনসমাবেশ। মানিক মিয়া এভিনিউর এক কিলোমিটার জায়গায় তিল ধারণের স্থান ছিলো না। স্থান সংকুলান না হওয়ায় হাজার হাজার জনতা জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় গিয়ে অবস্থান নেয়। মানিক মিয়া এভিনিউর দক্ষিণ দিকের বিভিন্ন বাড়িঘর ও দালানগুলোর ছাদে বহু লোককে দাঁড়িয়ে-বসে বক্তব্য শুনতে দেখা যায়। মহাসমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় অত্যন্ত সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। ঐ মহাসমাবেশে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দিয়ে বিএনপি সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করতে চাই।" তারপর, বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "একগুঁয়েমি করে আমাদেরকে সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।" ঐ মহাসমাবেশে দেয়া তাঁর ভাষণের শেষাংশে সরকারী পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠিত সংলাপের প্রসংগে শেখ হাসিনা বলেন, "গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখে কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে বিএনপি নেতৃবৃন্দ স্বীকার করলেন যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। কিন্তু, ২৯শে অক্টোবর (১৯৯৪) তারিখের বৈঠকে দেখা গেলো যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে সরকারী দল অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেটসম্বলিত সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন। আমরা আন্দোলন করেছি নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার প্রশ্ন নিয়ে। সংলাপের এজেন্ডায়ও ছিলো সেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন। বিএনপি সেই এজেন্ডা মেনেই সংলাপে এসেছিলো। কিন্তু, সংলাপে এসে জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেট-সম্বলিত সরকার ব্যবস্থার অর্থাৎ দলীয় সরকার ব্যবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাব দেন। বাংলার মানুষ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া অন্য কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন মেনে নিতে পারে না।"

৪৮৯। ১লা নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ বিকেলে জাতীয় পার্টি পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের ও দলের অন্যান্য দাবিতে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে। ঐ জনসভায় তাঁর বক্তব্যের গোড়ার দিকে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "সরকার যদি অবিলম্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতীয় পার্টির সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যগ করতে বাধ্য হবেন।" তারপর, তিনি সরকার পক্ষ এবং সংসদে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর মধ্যেকার সংলাপ প্রসংগে বলেন, "সরকারের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সংকটের সমাধান নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য সরকারবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।" ঐ জনসভায় জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "সরকারী দল বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদের সকল দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেট গঠনের যে ইংগিত দিচ্ছে, তা জাতীয় পার্টি কখনই মেনে নেবে না। জাতীয় পার্টি নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।"

৪৯০। ১লা নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ বিকেলে জামাতে ইসলামী পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের ও দলের অন্যান্য দাবিতে গৃহীত আন্দোলন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সামনের রাস্তায় এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে। জামাতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী শাখার আমীর এ. টি. এম. আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় জামাতে ইসালামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, "বাংলাশের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এর জন্য দায়ী বর্তমান বিএনপি সরকার। বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছে। অথচ, তারা এখন এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাই শুনতে পারে না। এটা দুঃখজনক। এ সরকার গণতন্ত্র ও জনগণের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল নয়। দেশে এখন চলছে একদলীয় শাসন।" ঐ জনসভায় জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে যে আন্দোলন করছি, তা কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করা কিংবা কাউকে ক্ষমতাসীন করার জন্য নয়। আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এই আন্দোলন করছি। দলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারকে ক্ষমতায় রেখে কোনদিন এদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি।” তাঁর বক্তৃতার আর এক পর্যায়ে তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার একগুঁয়েমী, হঠকারী ও অযৌক্তিক বক্তব্য দিয়ে আমাদের সংসদের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। এখন দাবি না মেনে বিএনপি সরকার আবারও আমাদের সংসদ থেকে পদত্যাগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।” সভাপতির বক্তব্যে ঐ জনসভায় ঢাকা মহানগরী জামাতে ইসলামীর আমীর এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম বলেন, “বর্তমান বিএনপি সরকার প্রধান মন্ত্রীকে বহাল রেখে অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু, আমরাতো ক্ষমতা ভাগাভাগি করার জন্য আন্দোলন করছি না।”

৪৯১। ২রা নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ৫ বছর মেয়াদান্তে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ৪ জন বিচারপতির সমন্বয়ে ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের একটি প্রস্তাব দেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার এক রিপোর্টারের কাছে দেয়া তাঁর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে। তারপর, সে রাতেই ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সে সাক্ষাৎকারে দেয়া তাঁর ঐ বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু, সত্ত্বেও তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ঐ বক্তব্য অন্য কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তাঁর ২রা নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে দেয়া বক্তব্যকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত বলে ব্যাখ্যা প্রদান করলেও তা নিয়ে ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মহলে, আন্দোলনরত সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দ তথা রাজনৈতিক সচেতন সমাজের জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানান জল্পনা-কল্পনা। সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দ তথ্যমন্ত্রীর দেয়া ঐ প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু, তথ্যমন্ত্রীর দেয়া ঐ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সরকারী দল বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। বিএনপির এক অংশ সংসদে বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবিকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পরামর্শ দেন। অন্যদিকে, বিএনপির অপর অংশের নেতারা দলের নীতি নির্ধারকদের সাথে পরামর্শ না করেই একতরফা ও ব্যক্তিগতভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রশ্নে দলীয় অবস্থান পরিপন্থী প্রস্তাব প্রদানের অপরাধে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দলীয় চেয়ারপারসন ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে দাবি জানান। সরকারী দল বিএনপি নেতৃবৃন্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে সে বিতর্ক চলাকালে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন ৫ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে।

৪৯২। ৬ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ দুপুর ১২টায় জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীর অফিসকক্ষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়মী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, সুধাংশু শেখর হালদার, ডঃ মিজানুল হক, খ. ম. জাহাংগীর ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মনিরুল হক চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও শেখ আনসার আলী এবং এনডিপির সংসদের একমাত্র সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী বৈঠক শেষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও এমপি তোফায়েল আহমদ সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে বলেন, "বৈঠকে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা মনে করি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবিকে মেনে না নিয়ে বিএনপি সরকার দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়াও, বৈঠকে সংসদের বিরোধী দল এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলো সংসদ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুপগুলোর সাংসদদের পদত্যাগ এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র।"

৪৯৩। সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও সরকারী দল বিএনপি নেতৃত্ব বিরোধী দলের সাথে সংলাপে বসার কোন নতুন উদ্যোগ নেননি। এমন কি, সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক -ভাবে প্রবর্তনের দাবির প্রশ্নে কোন সমঝোতায় আসার কোনরূপ ইংগিতও দেননি। কেবল পূর্বের মতো প্রধান মন্ত্রীকে নির্বাহী ক্ষমতাসহ স্বপদে বহাল রেখেই সংসদের সাধারণ নির্বাচনের সময়কালের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের আর একটি প্রস্তাব বিএনপির পক্ষ থেকে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের কাছে পাঠানো হয় ৭ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে। সরকারী দল বিএনপির সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিলো নিম্নরূপঃ "জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তফসীল ঘোষণার পর প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ ভেংগে দিয়ে সংসদের নিজের দলের চারজন, প্রধান বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলের চারজন এবং অন্যান্য গ্রুপগুলো থেকে একজন সংসদের সমন্বয়ে মোট দশ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁর কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাসহ তাঁর দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী প্রচারণায় কোনরূপ অংশ নিতে পারবেন না।" ৮ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলো বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া ঐ দ্বিতীয় প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে এই যুক্তিতে যে, সেটাও ছিলো তাঁদের প্রস্তাবিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল চেতনা ও লক্ষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৪৯৪। ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ছিলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথকভাবে প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী। বিরোধী দলগুলোর সে কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে সরকার ৮ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ রাত ১২টা থেকে পরদিন ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী সারা এলাকা ও সকল রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে যেসব এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয় সেসব ছিলঃ বাংলা মোটর ক্রসিং, বাংলা মোটর লিংক রোড ও সোনারগাঁও রোড ক্রসিং, পান্থপথ ও গ্রীন রোড ক্রসিং, মানিক মিয়া এভিনিউ, মিরপুর রোড ক্রসিং, সংসদ ভবন এলাকাস্থ টানেল রোডের পশ্চিম মাথা, করতোয়া রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ক্রসিং, শ্যামলী শিশুমেলা ক্রসিং, আগারগাঁও ক্রসিং, তালতলা পেট্রোল পাম্পের সম্মুখস্থ সড়ক, পুরাতন বিমান বন্দর এলাকা, ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ জাহাংগীর তোরণ, মহাখালী ক্রসিং, নাবিস্কো ক্রসিং, সাত রাস্তার মোড় ও এফডিসির সম্মুখস্থ রেইনবো ক্রসিং এবং সেসব সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল রাস্তা ও গলিপথ। ৮ই নবেম্বর (১৯৯৪) তারিখ মধ্যরাত থেকেই সেসব এলাকার বিভিন্ন স্থানে কয়েক হাজার আনসার, পুলিশ, দাংগা পুলিশ ও বিডিআর অবস্থান নেয়।

৪৯৫। ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীবৃন্দ ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুর সড়কস্থ ধানমণ্ডি সরকারী বয়েজ হাই স্কুলের সম্মুখে সমবেত হতে থাকেন। দুপুর ১২টার দিকে সেখানে বিপুল সংখ্যক জনতার সমাবেশ ঘটে। সে সমাবেশটিকে ছত্রভংগ করার জন্য পুলিশ জনতার ওপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। একই সংগে, সরকারী দল বিএনপির মাস্তানরা সেখানে কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেল দেড়টা পর্যন্ত সোবহান বাগ থেকে আসাদ গেট পর্যন্ত মিরপুর রোডের পুরো এলাকায় পুলিশ ও জনতার মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ ঘটে। সে সময়ে পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেটের আঘাতে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু ও মহানগর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক সালাউদ্দিন বাদলসহ অর্ধ শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সেখানে পৌছান বিকেল ১টা ৪০ মিনিটে। তারপর, জনতা পুলিশের ব্যারিকেড ভেংগে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে দলে দলে প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের অতি নিকটবর্তী বিজয় সরণীতে গিয়ে সমবেত হন। কয়েক হাজার জনতা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সংগে সেখানে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। বিজয় সরণীতে অবস্থান ধর্মঘট পালনে সমবেত দলীয় নেতা-কর্মী এবং জনতার মাঝে ভাষণ দেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সে ভাষণে শেখ হাসিনা বিএনপি সরকার কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত অবস্থান ধর্মঘট এলাকায় শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং অবস্থান ধর্মঘট পালনের স্থানে আসার পথে জনতার ওপর পুলিশের নির্যাতনমূলক তৎপরতার তীব্র নিন্দা করেন। সে সবের প্রতিবাদে তিনি ১২ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী সারা ঢাকা নগরীতে এবং ১৩ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সারাদেশে সকাল ৬টা থোক সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রতিদিন বারো ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের ঐ পরবতী কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "আজকে এ কর্মসূচী ঘোষণা করতে বিএনপি সরকার আমাদের বাধ্য করেছে।" তারপর, তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, "১২ই নবেম্বর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের জন্য সংসদে বিল আনুন। দেশের মানুষকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেবেন না। আওয়ামী লীগের সকল সাংসদ আমার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। পদত্যাগপত্র সংসদ স্পীকারের কাছে পেশ করা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার।"

৪৯৬। ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীবৃন্দ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মহাখালী রেল ক্রসিংয়ের নিকট সমবেত হন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে। দুপুর ১২টায় সেখানে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলাকালে সরকারী দলের মাস্তানরা সেখানে কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ঐ সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী সমাবেশ স্থানে আসার পথে দলীয় নেত-কর্মী এবং জনতার মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপের ঘটনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দা করেন। তারপর, তিনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও দলের অন্যান্য দাবির আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে ১২ই নভেম্বর (১৯৯৪) রাজধানী ঢাকা নগরীতে এবং ১৩ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত প্রতিদিন ১২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালনের কথা ঘোষণা করেন। ঐ সমাবেশে তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, "জাতীয় পার্টির সাংসদরা যে কোন মুহূর্তে সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন।" বিকেল ১টার দিকে পুলিশের ব্যারিকেড ভেংগে প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে, পুলিশ জাতীয় পার্টির ঐ সমাবেশে বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। রাবার বুলেটের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। বিকেল ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মহাখালী রেল ক্রসিং ও তার আশেপাশে জনতার সংঘর্ষ চলে। সেসব ঘটনায় প্রায় অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন।

৪৯৭। ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ের সামনে পূর্ব ঘোষিত অবস্থান ধর্মঘট পালনের উদ্দেশ্যে জামাতে ইসলামী সকাল সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মগবাজার চৌরাস্তার মোড়ে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সংগঠনের ঢাকা মহানগরী শাখার আমীর এ. টি. এম. আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় জামাতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, "অবিলম্বে সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাধায়ক সরকার প্রবর্তনে বিল আনার ঘোষণা দিন। সংঘাত এড়ান, জনতার দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করুন। তাতে কারো সম্মান যাবে না।" সে সমাবেশে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঐদিন মিছিল-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য বিএনপি সরকারের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন, "১৪৪ ধারা দিয়ে কোন সরকার আন্দোলন ঠেকাতে পারেনি। অন্য কেউও পারবে না। এটা কোন গণতান্ত্রিক আচরণ নয়।" তারপর, ইতিপূর্বে বিএনপির দেয়া প্রধান মন্ত্রীকে নির্বাহী ক্ষমতাসহ স্বপদে বহাল রেখে সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে অন্তর্বর্তী-কালীন সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, "আমরা ক্ষমতা ভাগাভাগির জন্য রাজনীতি করছি না। আমরা জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছি।" ঐ সমাবেশ শেষে দুপুর ১২টার পর জামাতে ইসলামীর নেতা-কর্মীবৃন্দ মিছিল করে প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয় অভিমুখে রওনা দেন। সোনারগাঁও লিংক রোডস্থ এফডিসির গেটে এসে মিছিলকারীরা পুলিশ ব্যারিকেডের সম্মুখীন হন। সেখানেই জামাতে ইসলামীর নেতা-কর্মীবৃন্দ বিকেল ২টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। বিকেলে জামাতে ইসলামীর মগবাজার কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও দলের অন্যান্য দাবির আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ১২ই নভেম্বর (১৯৯৪) রাজধানী সারা ঢাকা নগরীতে এবং ১৩ই নভেম্বর (১৯৯৪) সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রতিদিন ১২ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল পালনের কথা ঘোষণা করেন।

৪৯৮। ১২ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্য দুটি বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথকভাবে দেয়া পূব ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবং এসব দলের ৯ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালনকালে বিএনপি সরকারের পুলিশ বাহিনীর নির্যাতন ও সশস্ত্র মস্তানদের সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রতিবাদে সারা ঢাকা নগরীতে পালিত হয় সকাল ৬টা থোক সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল। সেদিন সারা ঢাকা নগরীর কোন রুটে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, মোটরযান ইত্যাদি ভারী যানবাহন চলাচল করেনি। সকল প্রকার দোকানপাট, বিপণীবিতান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী সাধারণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ডেমরা, পোস্তগোলা, তেজগাঁও প্রভৃতি শিল্প-কারখানা ছিলো বন্ধ। ব্যাংক ও বীমা অফিসগুলোয় কোনরূপ লেনদেন হয়নি। সচিবালয়সহ সরকারী অফিসগুলোয় উপস্থিতির হার ছিলো অতি নগণ্য। সায়েদাবাদ, মহাখালী, গাবতলী প্রভৃতি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল থিকে কোনও বাস ছাড়েনি কিংবা বাইরে থেকে সেসব টার্মিনালে কোনও বাস আসেনি। ঐদিনই কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর সংসদের সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারী দল ও সংসদের বিরোধী দল ও গ্রুগুলোর মধ্যে ইতিপূর্বে স্থবির হয়ে যাওয়া সংলাপ প্রক্রিয়াকে পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে ৫০ মিনিট বৈঠক করেন দুপুর ১২টায় এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে গিয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিট থেকে ৮টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত ৭০ মিনিটব্যাপী বৈঠক করেন। পরবর্তীতে জানা যায় যে, স্যার নিনিয়ান দুই নেত্রীর সাথে বৈঠককালে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করেন। সে তিনটি ফর্মুলার প্রথমটি ছিলোঃ প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে স্বপদে বহাল রেখে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সরকারী দলের ৫ জন এমপি এবং বিরোধী দলের ৫ জন এমপি ও ১ জন নির্দলীয় টেকনোক্র্যাটের সমন্বয়ে সংসদের সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনকালে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন। দ্বিতীয় ফর্মুলাটি ছিলো ঃ প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে সরকারী দলের এমপিদের মধ্য হতে অপর এক ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী করে সেই প্রধান মন্ত্রীসহ সরকারী দলের ৫ জন এবং বিরোধী দলের ৫ জন এমপি ও ১ জন নির্দলীয় টেকনোক্র্যাটের সমন্বয়ে সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন। তৃতীয় ফর্মুলাটি ছিলো ঃ সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা হস্তান্তর এবং রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

৪৯৯। ১৩ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দুটি বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথকভাবে দেয়া পূর্ব ঘোষণা অনুসারে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সকল স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, বিপণীবিতান, বেসরকারী সাধারণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-করখানা এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিলো। ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোয় কোনোরূপ লেনদেন হয়নি। সরকারী অফিস-আদালতে উপস্থিতির হার ছিলো অতি নগণ্য। অপরদিকে, হরতাল চলাকালে পুলিশ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর-বন্দরে হরতাল পালনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রবার বুলেট নিক্ষেপে হরতাল বানচালের প্রয়াস চালায়। তাছাড়াও, সরকারী দল বিএনপির সশস্ত্র মাস্তানরা দেশের বিভিন্ন শহর ও থানা সদরে হরতাল পালনকারীদের ওপর শত শত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ফেণীসহ কয়েকটি শহরে হরতালের সমর্থনে মিছিলকারীদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। পুলিশে সেসব হামলা এবং সরকারী দল বিএনপির সশস্ত্র মাস্তানদের সেসব সন্ত্রাসী তৎপরতায় সারাদেশে প্রায় ৮০ জন আহত এবং বিশেষ করে, ফেণীতে ৬ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। ঐদিনেও, কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে রাত ৯টা থেকে ৯টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত বৈঠক করেন। পরবর্তীকালে জানা যায় যে, সংসদের বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির বিপরীতে সরকারী দল বিএনপি'র পক্ষ থেকে তাঁকে লিখিতভাবে যে তৃতীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো স্যার নিনিয়ান ঐ বৈঠক-কালে তা সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন। সরকারী দল বিএনপির সেই তৃতীয় প্রস্তাবটি তাঁদের শেষ ও চূড়ান্ত প্রস্তাব ছিলো বলে স্যার নিনিয়ানকে সরকারী দলের পক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে জানানো হয়েছিলো। সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে উল্লিখিত বৈঠককালে স্যার নিনিয়ান বিরোধী দলীয় নেত্রীকে সে সম্পর্কেও অবহিত করেন।

৫০০। ১৩ই নভেম্বর (১৯৯৪) সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচী পালন শেষে সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনে তাঁর অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সে ঘোষণায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের এবং জনগণের প্রতি ১৭ই নভেম্বর (১৯৯৪) থেকে ২৩শে নভেম্বর (১৯৯৪) পর্যন্ত সারাদেশে সপ্তাহব্যাপী গণসংযোগ, ২৪শে নভেম্বর (১৯৯৪) দেশের প্রতিটি জেলায় পদযাত্রা মিছিল, ২৭শে নভেম্বর (১৯৯৪) রাজধানী ঢাকায় পদযাত্রা মিছিল, ২৯শে নভেম্বর (১৯৯৪) সারাদেশে সড়কপথ ও রেলপথ অবরোধ, ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯৪) গণতন্ত্র মুক্তি দিবস উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় জনসমাবেশ এবং ৭ ও ৮ই নভেম্বর (১৯৯৪) রাজধানী ঢাকাসহ সারা-দেশে একটানা ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানানো হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচীর প্রায় অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐদিন রাতে তাঁর রাজধানী ঢাকার গুলশানস্থ বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচীর প্রায় অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

৫০১। ১৫ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যায় সংসদ ভবনের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের অফিস কক্ষে ও তাঁর সভাপতিত্বে সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের তিন ঘন্টারও অধিক সময়ব্যাপী এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির বিপরীতে সরকারী দল বিএনপির পক্ষ থেকে পেশকৃত যে সর্বশেষ প্রস্তাব কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান ১৩ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে প্রধান মন্ত্রীকে স্বপদে বহাল রেখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সরকারী দলের সে প্রস্তাব সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লিখিত সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তবে, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের উত্তরাঞ্চলের তাঁর রাজনৈতিক সফর শেষে ১৬ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ঢাকায় ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর সরকারী দলের সে প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মিলিত বিরোধী দলের জবাব চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারী দলের সে প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মিলিত বিরোধী দলের চূড়ান্ত জবাব পাঠানোর সঙ্গে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রস্তাবও পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের উল্লিখিত সভায়।

৫০২। সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের দাবির বিপরীতে দেয়া সরকারী দল বিএনপির সর্বশেষ প্রস্তাবটি ছিলো নিম্নরূপঃ

> প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্বপদে বহাল রেখে সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৩০ থেকে ৪৫ দিন পূর্বে তাঁর নেতৃত্বে প্রধান মন্ত্রীসহ সরকারী দলের ৫ জন সাংসদ এবং সংসদের বিরোধী দলের ৫ জন সাংসদের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষুদ্র মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে। প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের কারও সরাসরি অধীনে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকবে না। মন্ত্রণালয়গুলো পরিচালিত হবে মন্ত্রিসভার যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে। তবে মন্ত্রণালয়গুলোর দৈনন্দিন নিয়মিত কাজের ক্ষমতা থাকবে সচিবদের হাতে। তাঁরা নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাবেন। মন্ত্রিপরিষদের সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রধান মন্ত্রী তাঁর 'নির্ধারণী' বা 'কাস্টিং' ভোট দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না। মন্ত্রিপরিষদ প্রয়োজনবোধে যে কোন বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং সে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে কার্যকর করার জন্য পাঠানো হবে। সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণ যৌথ মন্ত্রিপরিষদের কাছে জবাবদিহি থাকবেন, কোন একজন একক মন্ত্রীর কাছে নন। প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা সংসদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রধান মন্ত্রী দেশের সর্বত্র তাঁর দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাতে পারবেন। কিন্তু, মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে কোনও নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নিতে পারবেন না। প্রধান মন্ত্রী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যানবাহনসহ রাষ্ট্রীয় কোনও সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে, প্রধান মন্ত্রী তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

৫০৩। সরকারী দলের সেই শেষ প্রস্তাব আন্দোলনরত সম্মিলিত বিরোধী দল গ্রহণ করবে না সে আশংকায় ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ সরকারী দলের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সম্মিলিত বিরোধী দলের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব প্রদানের পরামর্শ দেন। কিন্তু, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ তাঁদের অবস্থানে অনড় থাকেন। 'তাঁদের পক্ষে আর কোন ছাড় দেওয়া হবে না' এই মন্তব্য করে তাঁরা আন্দোলনরত সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর সাথে আরও আলাপ-আলোচনার সকল পথ রুদ্ধ করে দেন। সেই পরিস্থিতিতে ১৭ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সংসদ ভবনে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অফিস কক্ষে এবং তাঁর সভানেত্রীত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ নাসিম, বেগম মতিয়া চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, খ. ম. জাহাংগীর ও শেখ হারুন-উর-রশিদ, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা ওবায়দুল হক। ঐ বৈঠকে সরকারী দলের সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে প্রধান মন্ত্রীকে স্বপদে বহাল রেখে দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। একই সঙ্গে, সম্মিলিত বিরোধী দল সরকারী দলের সর্বশেষ প্রস্তাবের পাল্টা একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাব ঐ বৈঠকে চূড়ান্ত করে ঐদিন রাত সাড়ে ১০টায় কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের কাছে হস্তান্তর করে। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে স্যার নিনিয়ান সম্মিলিত বিরোধী দলের সে প্রস্তাব সরকারী দলের সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করেন। সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সংক্রান্ত সে প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ

জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৭৫ দিন পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের যে কোন একজন বিচারপতি অথবা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সুপ্রীম কোর্টের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দলীয় কোন ব্যক্তিত্বকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁর নেতৃত্বে প্রধান মন্ত্রীসহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১ সদস্যের এক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে থাকবেন সরকারী দল মনোনীত ৫ জন এবং সংসদে বিরোধী দল মনোনীত ৫ জন নির্দলীয় ব্যক্তি। সে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিপরিষদের প্রধান মন্ত্রীসহ কোন সদস্য সংসদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। সে সরকার নির্বাচন পরিচালনা ছাড়াও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা জাতীয় সংসদের পর পর তিনটি নির্বাচন অর্থাৎ মোট তিনটি টার্মের জন্য বলবৎ থাকবে।

৫০৪। সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব সরকারী দলের সংসদীয় উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করার পর কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান স্টিফেন দু'দিন অপেক্ষা করেন। কিন্তু, সরকারী দল সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রস্তাব বিবেচনা করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানালে, ১৯শে নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে স্যার নিনিয়ান তাঁর কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল অর্পিত মিশনের সমাপ্তি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০শে নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সকাল ১০টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'র সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁর লিখিত বিবৃতি পাঠের মাধ্যমে স্যার নিনিয়ান বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তাঁর সহায়তাকারীর বা অনুঘটকের ভূমিকার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ঐ বিবৃতিতে স্যার নিনিয়ান উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তিনি নিজেও একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তা সরকারী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো বলেও তাঁকে সরকারী দলের পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়েছিলো। ঐ সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতিতে উল্লিখিত স্যার নিনিয়ানের সে বক্তব্য সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্যার নিনিয়ান ঐ উক্তির মাধ্যমে তাঁর দল নিরপেক্ষ ভূমিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন বলে সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়। যাহোক, স্যার নিনিয়ান স্টিফেন ২১শে নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখ সকাল ১০টায় প্রধান মন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ১১টায় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বিকেল সাড়ে ৪টায় সিংগাপুর এয়ারলাইনস যোগে তিনি তাঁর স্বদেশ অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন সরকারী দলের জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহিউদ্দিন আহমদ এবং ঢাকাস্থ কমনওয়েলথভুক্ত তিনটি দেশ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশন প্রধানগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০৫। ২১শে নভেম্বর (১৯৯৪) সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের অফিসকক্ষে এবং তাঁর সভাপতিত্বে সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, সুধাংশু শেখর হালদার, বেগম মতিয়া চৌধুরী, রহমত আলী, শেখ হারুন-উর-রশিদ ও খ. ম. জাহাংগীর, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও এডভোকেট ফজলে রাব্বী, জামাতে ইসলামীর মতিউর রহমান নিজামী এবং এনডিপির সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ঐ বৈঠক শেষে, এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, "দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের নিরসনের লক্ষ্যে ১৭ই নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো তার জবাব সরকারী দল বিএনপি এখনও দেয়নি। অথচ, স্যার নিনিয়ান যেদিন সংবাদ সম্মেলন করলেন তার আগের দিন সন্ধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি সরকারী দল থেকে সে প্রস্তাবের জবাব এনে দেবেন। কিন্তু সে জবাব আজও আসেনি। আমরা সরকারের জবাবের অপেক্ষায় আছি।" তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, "সংলাপ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ায় আন্দোলন ছাড়া এখন বিরোধী দলের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।" ঐ সংবাদ ব্রিফিংয়ে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, "কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল সংলাপের মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ২০শে নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে স্যার নিনিয়ান এমন কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা অবান্তর ও অপ্রত্যাশিত। স্যার নিনিয়ান যদি আন্দোলনকে ভায়োলেন্স হিসেবে দেখে থাকেন, তা হলে বলবো যে, আমাদের জন্ম হয়েছে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। এই ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" তারপর, সরকারের দেয়া সর্বশেষ প্রস্তাবের ত্রুটিগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বিএনপি সরকারের প্রস্তাবটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা জানতেন যে, এটা বিরোধী দল গ্রহণ করতে পারে না।" একই সংবাদ ব্রিফিংয়ে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "২০শে নভেম্বর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে স্যার নিনিয়ান এমন কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা খুবই দুঃখজনক।" তারপর, তিনি আরও বলেন, "সরকারী দল বিএনপি'র সর্বশেষ প্রস্তাবে প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। গোটা মন্ত্রী পরিষদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে প্রধান মন্ত্রীকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সরকারী দল আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না করে হার্ড লাইন নিয়েছে। এই অবস্থায় বিরোধী দলের সামনে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০৬। বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সংসদের বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর একটি দাবিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারী পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বা সংলাপ অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানকে আনতে হলো। তার ফলে, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে বিদেশীর হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটলো। তবুও, সে ব্যাপারে কিছু বলার থাকতো না যদি স্যার নিনিয়ানের সহায়তায় সরকারী পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ সৌহার্দ্যপূর্ণ ও খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে সফল হতেন। কিন্তু, স্যার নিনিয়ানের ৪০ দিন বাংলাদেশে উপস্থিতি সত্ত্বেও সরকারী পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে, সংকট আরও ঘনীভূত হয় এবং দেশের রাজনীতি এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। এটা নিঃসন্দেহে দেশের রাজনীতিবিদদের, বিশেষ করে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

৫০৭। কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের বাংলাদেশে অবস্থানকালে দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে মোটামুটি দু'টি বিকল্প প্রস্তাব বা ফর্মুলা পেশ করা হয়েছিলো। সেসবের মধ্যে একটি ছিলো সরকারী দল বিএনপি কর্তৃক পেশকৃত শেষ প্রস্তাব। সে প্রস্তাব অনুযায়ীঃ (১) সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৩০-৪৫ দিন পূবে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কার্যনির্বাহী ক্ষমতাহীন প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বহাল রেখে তাঁর নেতৃত্বে তিনিসহ সরকারী দলের ৫ জন সাংসদ ও বিরোধী দল মনোনীত ৫ জন সাংসদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র আকারের অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রি পরিষদ গঠন করতে হবে। (২) সে মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রী থাকবেন দফতরবিহীন। সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দল সরকারী দলের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মূলত তিনটি কারণে। এক, সে সরকার হবে দলীয় সরকার যা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সংগে সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। দুই, প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সকল মন্ত্রী দফতরবিহীন হওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্র পরিচালনায় অচলাবস্থা এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতাশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হবে। তিন, প্রধান মন্ত্রী কার্যনির্বাহিকভাবে ক্ষমতাবিহীন হলেও, তিনি সরকারপ্রধান হিসেবে সংসদের নির্বাচনের ফলাফল নিজের দলের অনুকূলে নিতে পরোক্ষভাবে প্রশাসনসহ নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করতে পারেন।

৫০৮। দেশের সংকট নিরসনে দ্বিতীয় প্রস্তাব বা ফর্মুলাটি পেশ করা হয়েছিলো সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলোর পক্ষ থেকে। সে প্রস্তাব অনুযায়ীঃ (১) সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৭৫ দিন পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের যে কোনো বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারপতি অথবা দেশের একজন নির্দলীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে সরকারী দল মনোনীত ৫ জন এবং বিরোধী দল মনোনীত ৫ জন নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১১ সদস্যবিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। (২) সে সরকারের প্রধান মন্ত্রীসহ কোনও মন্ত্রী সংসদের নির্বাচনে কিংবা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। সরকারী দল সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দলের সে প্রস্তাব নাকচ করে দুটি যুক্তির ভিত্তিতে। এক, সে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন হবে। দুই, সে সরকারের সদস্যবৃন্দের কোন নির্বাচিত সত্তা বা বৈশিষ্ট্য থাকবে না। সরকারী দল বিএনপির নেতৃত্ব যেসব যুক্তি দেখিয়ে সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সংক্রান্ত ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করেন তা মোটেই অখণ্ডনীয় নয়। কারণ, মেয়াদান্তে অথবা সাধারণ নির্বাচনের জন্য সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণার পর প্রধান মন্ত্রীসহ পূর্ববর্তী সংসদের সদস্যদের কারও নির্বাচিত সত্তা বা বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে, সংবিধানে সে মর্মে বিধি-বিধান রয়েছে বলেই পূর্ববর্তী সংসদের নেতা প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মন্ত্রী থাকতে পারেন, অন্য কোন বিশেষ কারণে নয়। সরকারী দলের সংবিধান সংশোধনে আপত্তির ব্যাপারে বলা যায় যে, জনস্বার্থ ছাড়াও কেবল ব্যক্তিস্বার্থে অতীতে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে কয়েকবার। রাজনৈতিক সংঘাত এড়াতে, দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি, অবাধ, সুষ্ঠু এবং দল নিরপেক্ষ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংবিধানের আর একটি সংশোধন করতে সরকারী দল বিএনপির আপত্তি বোধগম্য নয়। তবে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন যাতে এ্যাডহক ভিত্তিতে না হয়, সেটা যাতে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্যে বিএনপি নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিলে তাঁরা রাজনৈতিক সংকট নিরসনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে পারতেন। কিন্তু, অতীব পরিতাপের বিষয় যে, সরকারী দল এবং সংসদের সম্মিলিত বিরোধী দল উভয়ের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে, ঐসব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উপরোক্ত ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না রেখে কেবল নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থেকে দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্র দৃষ্টিভংগী ও মন-মানসিকতার পরিচয় দেন।

৫০৯। ইতিপূর্বে, সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দু'টি বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী ঘোষণা দিয়েছিলো যে, বিএনপি সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা করতে সম্মত না হলে, তাঁদের দলের সাংসদরা একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। ৮ই ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক জনসমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী ২৭শে ডিসেম্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৯৪) তারিখ পর্যন্ত বিএনপি সরকারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি মেনে নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, ঐ তারিখের মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবি বিএনপি সরকার মেনে না নিলে, ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখে এই দলগুলো রাজধানী ঢাকায় পৃথক পৃথক জনসভায় তাদের স্ব স্ব দলের সাংসদদের সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে ঐদিনই সংসদ ভবনে গিয়ে সংসদ স্পীকারের কাছে তাঁদের স্ব স্ব দলের সাংসদদের পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করবেন।

৫১০। ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখ বিকেলে রাজধানী ঢাকায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দু'টি গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তিনটি পৃথক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের জনসমাবেশটি মানিক মিয়া এভিনিউয়ে, জাতীয় পার্টির জনসমাবেশটি বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটের সম্মুখে এবং জামাতে ইসলামীর জনসমাবেশটি বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়। মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটের সম্মুখে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সম্মুখে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জাতীয় সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কোন সমঝোতায় না আসার প্রতিবাদে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জনসমাবেশ শেষে ঐদিন সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে গিয়ে সংসদ স্পীকারের কাছে স্ব স্ব দলের সাংসদদের সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। জনসমাবেশ শেষে, ঐদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দলের সাংসদ ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সংগে নিয়ে সংসদ ভবনে যান। তারপর, তিনি তাঁর দলের ৯৩ জন সাংসদের মধ্যে নিজেরসহ ৯১ জন সাংসদের পদত্যাগপত্র সংসদ স্পীকারের কাছে হস্তান্তর করেন রাত ৯টা ১৪মিনিটে। আওয়ামী লীগের একজন সাংসদ হেমায়েত উল্লাহ আওরংগ জেলে থাকায় এবং অপর একজন সাংসদ শরীফ উদ্দিন আহমদ হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাঁদের পদত্যাগপত্র পরবর্তীতে জমা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর দলের ৩৫ জন সাংসদের মধ্যে নিজেরসহ ৩৪ জন সাংসদের পদত্যাগপত্র সংসদ স্পীকারের কাছে হস্তান্তর করেন রাত ৯টা ২২মিনিটে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জেলে থাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র ডিজি প্রিজনের মাধ্যমে পাঠাবেন বলে জানানো হয়। জাতীয় পার্টির অপর একজন সাংসদ মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসানের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া হলেও তা গণ্য করা হয়নি। কারণ, তিনি ঐদিন জাতীয় পার্টি থেকে পদত্যাগ করে সরকারী দল বিএনপিতে যোগদান করেন এবং ইতিপূর্বে সে মর্মে স্পীকারকে লিখিতভাবে অবহিত করেছিলেন। জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিজেরসহ তাঁর দলের ১৯ জন সাংসদের সকলের পদত্যাগপত্র সংসদ স্পীকারের কাছে হস্তান্তর করেন রাত ৯টা ২৫ মিনিটে। সবশেষে, এনডিপির একমাত্র সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তাঁর পদত্যাগপত্র সংসদ স্পীকারের কাছে হস্তান্তর করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় অপর তিনজন সাংসদ যথাক্রমে ওয়ার্কার্স পার্টির একমাত্র সাংসদ রাশেদ খান মেনন, ইসলামী ঐক্যজোটের একমাত্র সাংসদ মাওলানা ওবায়দুল হক এবং গণফোরামের একমাত্র সাংসদ শামসুদ্দোহা ঐদিন সংসদ থেকে পদত্যাগ করেননি। তাঁরা তাঁদের পদত্যাগপত্র পরবর্তীকালে জমা দেবেন বলে জানানো হয়। ২৮শে, ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখে সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অপর দু'টি বিরোধী গ্রুপ জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর মোট ১৪৩ জন সাংসদ একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। তাঁর ফলে, জনমনে সৃষ্টি হয় দারুণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা।

৫১১। ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর পৃথক পৃথক জনসমাবেশ থেকে অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পদত্যাগও দাবি করা হয়। একই সঙ্গে, সেসব জনসমাবেশে ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৯৪) সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল এবং ২রা থেকে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৯৫) পর্যন্ত পর পর তিন দিন রাজধানী সারা ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচীসহ পরবর্তী জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি করে সে সরকারের এক রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৯৪) তারিখে ঘোষিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সে রূপরেখাটি ছিলো নিম্নরূপঃ

> (১) প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে হবে। (২) পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাতিল (অর্থাৎ বিলুপ্ত) করে অবিলম্বে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে। (৩) রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন গ্রহণযোগ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধান মন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন। (৪) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবেন। (৫) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে বর্ণিত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনসহ শুধু জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। (৬) সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে। (৭) আগামী নির্বাচনের পর গঠিত নতুন জাতীয় সংসদ সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মতো একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যবস্থাকে আইনসম্মত করবে এবং একই সাথে ভবিষ্যতে আরও অন্তত তিনটি সংসদের সাধারণ নির্বাচন এরূপভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হবে।

৫১২। সকলের আশা ছিলো যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা হবে; গণতন্ত্র চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য গুণাবলী, যথা: পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সকলের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগীতে জাগ্রত হবে; দেশে সহজলভ্য ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে; রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশ্বাস, ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি সমাজে তথা সমগ্র দেশে শান্তি ও সহ-অবস্থানের নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি হবে; দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে; দেশের মৌলিক সমস্যা, যথা: ব্যাপক দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শহরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুষ্ঠু, সুষম অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজলভ্য সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে; দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সহজলভ্য আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হবে; জনগণের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান করা হবে; দেশের প্রতিটি অঞ্চল-এলাকার সুষম উন্নয়নে সকল অবকাঠামো গঠনসহ সব রকম ব্যবস্থা করা হবে এবং সর্বোপরি, কৃষক-শ্রমিক তথা সকলের ভাগ্যের পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো ও অবদান রাখার যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। আরও, প্রত্যাশা ছিলো যে, দলমত, আদর্শ-বিশ্বাস ও দলীয় নীতির ভিন্নতা ও পার্থক্য সত্ত্বেও দেশের সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারী অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্তত উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ন্যূনতম ঐকমত্য বা সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে অব্যাহত প্রয়াস চালানো হবে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, এসব মৌলিক জাতীয় বিষয়ের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার আন্তরিক ও ঐকান্তিকভাবে কোন প্রয়াস চালিয়েছে বা চালাচ্ছে কি? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সে ব্যাপারে আদৌও কোন উদ্যোগ নেয়নি।

৫১৩। ১৯৯০ সালের নভেম্বরের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ লেঃ জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পতনের পর প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সাড়ে তিন বছরেরও অধিককাল যাবত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে: ১৯৭১-এর মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের চেতনা, মূল্যবোধ, স্বপ্ন, লক্ষ্য ও আশা-আকাংক্ষার কতটুক বাস্তব রূপ লাভ করেছে? দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আজ পর্যন্ত স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা কিংবা সে লক্ষ্যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে কি? বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে স্বাধীন বিচার বিভাগ ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে কি? জাতীয় সংসদের যে কোন নির্বাচনসহ দেশের সকল স্তরের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ সরকার ও তার প্রশাসন প্রভাবমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা বিধানে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি? রেডিও-টেলিভিশন এবং গণপ্রচার মাধ্যমগুলো যাতে সরকার ও তার প্রশাসন প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে কি? এক কথায়, এসব মৌলিক রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর সমাধানে কার্যকর ও ঐকান্তিকভাবে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু, সেখানে স্বৈরাচারী এরশাদের মতো প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলীয় কাজে রাষ্ট্রীয় অফিস ভবন এবং হেলিকপ্টার ও অন্যান্য যানবাহনসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সুবিধাদির অপব্যহার করেছেন দারুণ দ্বিধালেশহীন ও বেপরোয়াভাবে। একই সঙ্গে, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রীয় গণপ্রচার মাধ্যমগুলো, বিশেষ করে, রেডিও এবং টেলিভিশনকে একচেটিয়া ও যথেচ্ছাভাবে অপব্যবহার করেন নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা ও দলীয় প্রচারের কাজে। প্রতিদিন টেলিভিশনে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদেরকে ক্রমানুসারে এতো বেশী সময় ধরে ও ন্যক্কারজনক-ভাবে প্রদর্শন করা হয় যে, দেশের অনেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে বিবি-গোলামের বাক্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ব্যঙ্গোক্তি করেন। তাছাড়াও, সংসদের কয়েকটি উপনির্বাচন এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে পরিলক্ষিত হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি, টাকার ছড়াছড়ি. পেশী ও অস্ত্রবলে ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালট পেপারে সরকারী দলের প্রার্থীর পক্ষে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তিকরণ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, অস্ত্রের ঝনঝনানি, বোমাবাজি, বিরোধী দলের সমর্থক ভোটারদের ভয়ভীতি ও প্রাণ নাশের হুমকি প্রদর্শন ইত্যকার ঘটনা।

৫১৪। দেশের উপরোল্লিখিত মৌলিক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর সরকারের উদাসীনতা ও ব্যর্থতা, প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বৈরাচারী আচার-আচরণ, নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণের দৃষ্টিভংগী ও নীতি অবলম্বন এবং সর্বোপরি, সংসদের ঢাকা-১১ (মিরপুর) ও মাগুরা-২ আসন দুটির উপনির্বাচনে রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সুবিধাদির বেপরোয়া অপব্যবহার, সশস্ত্র মাস্তানদের মাধ্যমে নজিরবিহীন সহিংসতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে ন্যক্কারজনকভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনী ফলাফলকে সরকারী দল বিএনপি প্রার্থীদের অনুকূল নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং একই সংগে জনমনে সৃষ্টি হয় নিদারুণ হতাশা। দেশের সেই পরিবেশে শুধু রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই অবনতি হয়নি, দেশের সর্বস্তরেও তাঁর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং পড়ছে।

৫১৫। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এই পরিবেশের অশুভ প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন দেশের রাজনৈতিকভাবে সচেতন শিক্ষিত সমাজ, দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবর্গ, বিশেষ করে, দেশের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীবৃন্দ। দেশের সর্বস্তরে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হোক; সব রকম সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপ চিরতরে নির্মূল করা হোক; জাতীয় সংসদসহ সকল গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ির অবসান হোক; স্বাধীন বিচার বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হোক; বিদ্যমান ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী সুযোগ সৃষ্টি করা হোক; বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষায়তন থেকে সর্বপ্রকার সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপ ও নৈরাজ্য নির্মূল করে সেখানে সুশিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু ও নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হোক; প্রশাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রী-করণের মাধ্যমে দেশের শিল্প-কারখানাসহ সার্বিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক; প্রত্যেক নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা ও সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানে যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক; মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানে দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক কর্ম সংস্থানের সুব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক; প্রত্যেক মানুষের মনে দেশাত্মবোধ ও দেশ-প্রেমিকতার চেতনা জাগ্রত হোক; ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠুক; দেশের জাতীয় সংসদসহ সকল জন-প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সর্বোপরি, সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব-দরবারে সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের আসন লাভ করুক—দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই-ই ঐকান্তিক কামনা। তাই, দেশের সর্বস্তরের ও সর্বপেশার নেতা-কর্মীদের, বিশেষ করে, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীবৃন্দের জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের স্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রাধান্য ও স্থান দেওয়ার মন-মানসিকতায় দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ হওয়া দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং সর্বোপরি, কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~